চুরিও যাবে না
নষ্টও হবে না

জানালার ও ক্ষেতের বেড়ার জাল
সব রকম আমাদের কাছে পাবেন।
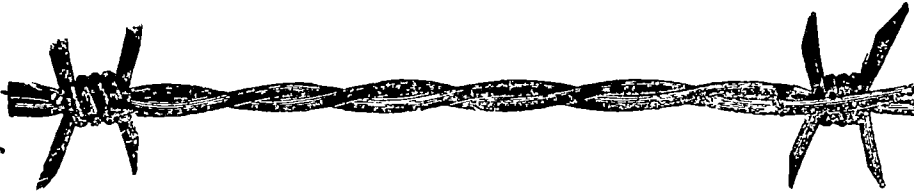
লোহাব কড়ি, ববগা, কবোগেট টিন
আবশ্যক থাকলে আমাদেব লিখ্‌বেন।

মেসার্স গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিমিটেড
৮৬-এ-৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জারমলীন
জ্বরের যম
মূল্য ৷৷০
ডজন ৪৲
একদিনে জ্বর ছাড়ে. ২দিনে দেহের রস শুকায়.
৩ দিনে শোথ কমিয়া যায়।
১ সপ্তাহে প্লীহা ও যকৃৎ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া
দেহে বল সঞ্চার করে,
পথ্যের বিচার নাই-জারমলীন · সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
জারমলীন লিমিটেড,
৪২বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৩৮

পরিচয়

সভ্যতাবৃদ্ধিব অনুপাতে মানুষেব শ্রীবৃদ্ধি হয় কি-না, এ-প্রশ্ন আজিও তর্কাধীন, কিন্তু জটিলতা যে বাড়ে, সে-বিষয়ে পণ্ডিতেবাও একমত। পাণ্ডিত্য বাদ দিয়াও দেখা যায়, এক পবিচয়-প্রথাই সভ্যসমাজে কত বকম ছোট-বড জটিলতাব সৃষ্টি কবে। ছু'বেলাই চোখোচোখি হয়, অথচ একজন সাধাবণ-বন্ধুব অভাবে আলাপ কবাব জো নাই—এমন কে আছেন যাঁহাকে এ-অবস্থায় পডিতে হয় নাই? পবিচয়েব অভাবে এক-গাড়ী লোক পবস্পবেব দৃষ্টি এডাইয়া নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছে—এ দৃশ্য এ দেশেও নিতান্ত বিবল নয়।

কিন্তু সভ্যতাব আদবকাযদাব কডাকডি সত্ত্বেও মানুষেব আদিম পবিচয়স্পৃহাকে ঠেকাইয়া বাখা যায় না। হঠাৎ সিগাবেটেব জন্য দেশলাইয়েব দবকাব হয়, পাশেব লোকেব বিষ্ট্‌ ওয়াচ্‌ দেখিয়া সময জানিবাব ইচ্ছা প্রবল হইযা ওঠে, ট্রেণে কে কোথায় নামিবে এবিষয়ে অদম্য কৌতূহলকে চাপিযা বাখা চলে না—সভ্যতাব বাঁধন কিছু আলগা হয়, আব এই ক্ষণিকেব ফাঁক দিয়া অনেক সময স্থায়ী বন্ধুত্বেব সূত্রপাত হইয়া যায়। সঙ্গলোভী মানুষ অন্যেব সংস্পর্শ পাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণতব বোধ কবে।

এই সঙ্গলোভই মানুষকে দিয়া সমাজ গডায়, শিল্প বচায়, সাহিত্য-সৃষ্টি কবায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষেব স্মৃতি-সভাব অভিভাষণে ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাঁহাব মনে হয়, সাহিত্য কথাটাব মূলে আছে 'সহিত'। যে-মানুষ কাহাবও সহিত বাস কবে না, সাহিত্য-সৃষ্টিব কোনো তাগিদ সে অনুভব কবে কি-না সন্দেহ। সাহিত্যের বাহন যে ভাষা, তাহা সমূহেব সৃষ্টি। একা-মানুষেব ভাষাব প্রয়োজন নাই বলিলেই হয। হয়ত এমন জ্ঞান আছে যাহা একান্ত নির্জ্জন সাধনা-সাপেক্ষ; সে-জ্ঞান হয়ত এমন নিগূঢ় ও মৌলিক যে তাহাকে আয়ত্ত কবিতে পাবিলে অন্য সব প্রকাব জ্ঞানই সুগম হইযা আসে—যং লব্ধ্বা চাপবং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—তখন ভাষা বা সাহিত্যেব কোন প্রয়োজনবোধই থাকেনা। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ সে-জ্ঞানেব সাধক নয়। নিজেকে জানিবাব, নিজেব পবিচয় পাইবাব আকাঙ্ক্ষা তাহাব কম তীব্র নয়; সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তাব মধ্য দিযা, জ্ঞাতসাবে বা অজ্ঞাতসাবে, এই আত্মপবিচয় লাভই তাহাব উদ্দেশ্য; কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষেব এইটাই

অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধি যে, অপব হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া লইয়া স্ব-রূপ জানা যায না, স্ব-কে জানিবার জন্য অপবেব প্রয়োজন; আত্ম ও পব কুঞ্জন্যুঞ্জেব মত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। তাই সে অপবেব সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায। কাবণ, সাহিত্যেব মধ্য দিয়া যে-পবিচয, তাহা চাক্ষুষ পরিচযেব চেয়েও প্রত্যক্ষ। দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানেব সমুদ্রকে উপেক্ষা কবিযা এই সাহিত্যজগতেই সমধর্ম্মী মন পবস্পবেব সহিত কবকম্পন কবে, বিপবীত-মুখী ঝটিকাবর্ত্তেব মধ্যেও তাহারা পবস্পবকে আলিঙ্গন কবিতে পাবে। এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবেব অন্তবেব কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনেব আবির্ভাবকে ত্ববিত কবিতে হইলে আজ মানুষেব প্রধান কাজ—ভাষা-সঙ্কটেব দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতিব যুগযুগসঞ্চিত পবিশীলন-সম্পদেব সহিত পবিচিত হওযা। এই পবিশীলন-পবিচযই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ-চিত্ততাব বক্রগত শনিকে বিতাড়িত কবিতে সমর্থ।

বাংলা দেশে 'পবিচয়' আজ এই ভাবই লইতে চাহে। তাহাব প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গাব ধাবা বাংলা ভাষাব ক্ষেত্রেব ভিতব দিযা বহাইযা দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব বিভিন্ন ভাষাব বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পবিচয' বাঙালী পাঠককে উপহাব দিতে অভিলাষী, কখনো মূলভাষাব অনুসবণে আলোচনা কবিয়া, কখনো বা ভাষান্তবেব সাহায্য লইযা; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কবিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ কবিযা। এই সঙ্গে মাতৃভাষাব সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিব দিকেও 'পবিচয' তাহাব দৃষ্টি সদাজাগ্রত কবিযা বাখিবে। কবিতা, কথা-শিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পবিশীলনেব সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে, এ-বিষয়ে 'পবিচয' সাধ্যমত চেষ্টা কবিবে। 'পরিচয' জানে যে তাব সাধ যত, সাধ্য তাব বহু পশ্চাতে। কিন্তু তাহাব একান্ত বিশ্বাস, তাহাব এই স্বীকৃত অক্ষমতাই দেশেব সুধীবৃন্দেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, ও তাঁহাদেব স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা তাহাব রুক্ষ বিঘ্ন-বন্ধুব পথকে শ্যামশোভন ও সহজ-চাবণ কবিযা তুলিবে। এই বিশ্বাসই তাহাব দুবাবোহিণী আশাব মূলে জলসেচন কবিযা আজ অঙ্কুবিত কবিয়া তুলিয়াছে। এখন ইহাকে লালনেব ভাব পড়িল তাঁহাদেব উপব—বাংলা ভাষাব অতীতকে যাঁহাবা শ্রদ্ধা কবেন, বর্ত্তমানকে দবদ দিযা দেখেন ও ভবিষ্যতেব আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাঁহাদেব বিশ্বাস অকুণ্ঠ।

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ

বৈদিক সাহিত্যের সহিত যাঁহার কিছুমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহার অবিদিত নাই যে, বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের লক্ষ্য অভ্যুদয় (স্বর্গাদির সাধন) এবং জ্ঞানকাণ্ড-বেদের উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স (অপবর্গ বা মুক্তি)। 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ্' লইয়া জ্ঞানকাণ্ড।

সংহিতা প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক, ব্রাহ্মণে যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা। আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ—'কর্ম্মকাণ্ড বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞক্রিয়া'। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রসহকারে যে অনুষ্ঠান বা দ্রব্যত্যাগ, তাহার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের জন্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—উভয়েরই প্রয়োজন। কারণ, সংহিতায় নিবদ্ধ মন্ত্রের জ্ঞানই যজমানের পক্ষে যথেষ্ট নহে—যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণে বিবৃত যজ্ঞের প্রণালী, পদ্ধতি, উপকরণ প্রভৃতির জ্ঞানও আবশ্যক।

দেখা যায়, প্রাচীন যুগে আর্য্য-মানবের জীবন চারিটি নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বে সুবিন্যস্ত ছিল। ইহাদিগের নাম ছিল—'আশ্রম'। প্রথম, ব্রহ্মচর্য্য (studentship), তাহার পর গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ এবং সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস—ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। ব্রহ্মচারী অবস্থায় আর্য্য-বালককে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 'স্বাধ্যায়' করিতে হইত—স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ। স্বাধ্যায় অর্থে সু-আবৃত্তি (memorisation)। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আর্য্যযুবক গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই আশ্রমে দার পরিগ্রহ করিয়া তিনি পত্নীর সহিত বৈদিকমন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। গৃহস্থ কিন্তু চিরদিন সংসারী থাকিতেন না—বল্‌গামুখে মৃত্যু (die in harness) তখনকার প্রথা ছিল না। নিজের শরীরে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ লক্ষ্য করিলে তিনি পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত 'আরণ্যক'—অরণ্যং মনুষ্যে। ইহাই বানপ্রস্থ আশ্রম। আরণ্যক বেদের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিতেন—যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক-ভাবনা ও প্রতীক-উপাসনা করিতেন। যে সকল গ্রন্থে ঐরূপ ভাবনা ও উপাসনার উপদেশ আছে, তাহার নাম 'আরণ্যক'—অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্।

বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। আরণ্যক বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইলে, এই চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত পরিব্রাজক বা ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর আলোচ্য গ্রন্থ—

উপনিষদ্। ইহা আবণ্যক গ্রন্থেব অন্ত্য বা চরম ভাগ—ইহাতেই বেদেব প্রপূর্ত্তি। সেইজন্য ইহাব নাম 'বেদান্ত'—বেদান্তো•নাম উপনিষদ্। চতুর্থাশ্রমী এই উপনিষদ্ হইতে উচ্চতম ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত কবিয়া মোক্ষ-যাত্রাব যাত্রী হইয়া মনুষ্যজীবনেব চবম সার্থকতা লাভ কবিতেন। কারণ, মুক্তিই নিঃশ্রেয়স (sommum bonum)। অতএব প্রাচীন ভারতে মানবজীবন যেমন চারিটি আশ্রমে সুবিন্যস্ত ছিল, বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চাবিটি পর্য্যায়ে সুবিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচাবীব জন্য সংহিতা, গৃহস্থেব জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থেব জন্য আবণ্যক এবং সন্ন্যাসীব জন্য উপনিষদ্।

এই উপনিষদেব সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পবিচয নাই, তাঁহাদেব অনেকে এই ভ্রান্ত ধাবণা পোষণ কবেন যে, ভাবতবর্ষেব সাব সম্পদ যে অদ্বৈতবাদ, ঐ অদ্বৈতবাদ শঙ্কবাচার্য্যেব কপোলকল্পিত একটা আধুনিক মতবাদ। অথচ উপনিষদেব আলোচনা কবিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এ মতবাদ অর্ব্বাচীন নহে—সুপ্রাচীন এবং ইহাব মূল উপনিষদেব মর্ম্মস্থানে সুপ্রোথিত। শুধু মূল কেন? প্রাচীনতম উপনিষদেব সহিত পবিচিত হইলে দেখা যায়, এই বৈদান্তিক মতবাদ সেই অতীতযুগে কেবল অঙ্কুবিত নহে, পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া চিন্তাবাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইযাছে।

শঙ্কবাচার্য্য খৃষ্টীয সপ্তম শতাব্দীব লোক। তাঁহাব মনীষাব বলে ও বচনাব কৌশলে তিনি অদ্বৈতবাদকে এক চমকপ্রদ রূপ দান কবিযাছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার গুরুব গুরু গৌড়পাদাচার্য্যেব মুণ্ডুক্য-কাবিকায (যে কাবিকাব উপব শ্রীশঙ্কবাচার্য্য ভাষ্য বচনা করিযাছেন) আমরা পূর্ব্বেই অদ্বৈতবাদেব পবিণত মূর্ত্তিব সাক্ষাৎ পাই। যোগবাসিষ্ঠে ও সূতসংহিতাযও অদ্বৈতমতেব সুস্পষ্ট বিববণ আছে। এ গ্রন্থদ্বযেব বচনাকাল খৃষ্টেব পূর্ব্ববর্ত্তী বা পববর্ত্তী যাহাই হউক না কেন, ইহাবা যে শঙ্কবেব অগ্রগামী, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি স্বয়ং তাঁহাব শাবীবক ভাষ্যে আত্মমত সমর্থন জন্য 'ভগবান্' উপবর্ষকে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত কবিয়াছেন। উপবর্ষ নাকি পাণিনিব গুরু। ইনি ব্রহ্মসূত্রেব উপব এক বৃত্তি বচনা কবেন—সেই জন্য তাঁহাব নাম 'বৃত্তিকাব'। উপবর্ষও অদ্বৈতবাদী।

ঐ যে ব্রহ্মসূত্র—যাহাব উপব শঙ্কব ভাষ্য প্রণয়ন কবিযাছেন—উহাও অদ্বৈত-প্রতিপাদক গ্রন্থ। ইহাবই নামান্তব বেদান্ত দর্শন। বাদবায়ণ ঐ ব্রহ্মসূত্রেব গ্রন্থকাব। তিনি কতদিনেব লোক?

পাণিনিব ৪।৩।১১০ সূত্রে পাবাশর্য্য-বচিত এক 'ভিক্ষুসূত্রে'ব উল্লেখ আছে। 'পাবাশর্য্য'-অর্থে পবাশর-তনয। অতএব খুব সম্ভব ভিক্ষুসূত্র-প্রণেতা পাবাশর্য্য ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস' বাদবাযণ, অভিন্ন ব্যক্তি। বাচস্পতি মিশ্রেব মতে ভিক্ষুসূত্র ব্রহ্মসূত্রেবই নামান্তব। প্রাচীনকালে

বেদান্ত দর্শন সংসারত্যাগী চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুরই আলোচ্য ছিল। অতএব উহাকে 'ভিক্ষুসূত্র' বলা অসঙ্গত নহে।

এই ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম—উত্তরমীমাংসা। পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্র যেমন কর্ম্মকাণ্ডবেদের বিরোধভঞ্জনে ও সামঞ্জস্য-বিধানে ব্যাপৃত, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্র জ্ঞানকাণ্ডবেদের (উপনিষদের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে নিয়োজিত। অতএব ইহার সার্থক নাম 'উত্তরমীমাংসা'।

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কয়েকজন বেদাচার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমী, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, জৈমিনি, আশ্মরথ্য ও বাদরি। জৈমিনি প্রখ্যাত পূর্ব্বমীমাংসাকার। অপর কয়জনের রচিত কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। তবে ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে তাঁহাদের মত উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, কাশকৃৎস্ন ও কার্ষ্ণাজিনিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রকে 'ঔপনিষদ দর্শন' বলিয়াছেন—কারণ, ব্রহ্মসূত্রের মূল ভিত্তি উপনিষদ্। ব্রহ্মসূত্র কোন্ কোন্ উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তথাপি, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী, কঠ, মুণ্ডক, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ যে ব্রহ্মসূত্রে লক্ষিত হইয়াছে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকখানি যে অর্ব্বাচীন গ্রন্থ, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। পাশ্চাত্যেরা উপনিষৎ-সমূহকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মুখ্য বা major এবং গৌণ বা minor। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দ্বাদশখানি মুখ্য উপনিষদ্—আর সমস্ত minor বা গৌণ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্রহ্মসূত্র যে কয়খানি উপনিষদের উপর স্থাপিত (যাহাদের ইতিপূর্ব্বে নামোল্লেখ করিলাম), ঐ সকল উপনিষদ্‌ই পাশ্চাত্য মতানুযায়ী মুখ্য বা major উপনিষদ্। ইহাদের মধ্যে আবার বৃহদারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক।* এই সকল উপনিষদে—বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে—আমরা যে অদ্বৈতবাদের সাক্ষাৎ পাই তাহা

---

*Of especial weight in our view, is the proof advanced that Brih 1—4 (not the appendix 5—6) together with Satap Br 10, 6 is older than all other texts of importance, especially older than the Chandogya *Upanishad*. **Thus we have to look for the earliest form of the doctrine of the *Upanishads* above all in the Yagnavalkya discourses of the Brihadaranyaka —Deussen's Philosophy of the *Upanishads* p 398

নিপট, নিবিড, নিঃসংশয, নির্ঘাত অদ্বৈতবাদ—তাহাব মধ্যে সন্দেহ, সংস্কোচ, দ্বিধা, দৈন্যেব বিন্দুবিসর্গ নাই। পাশ্চাত্যেবা এই অদ্বৈতবাদেব সাক্ষাতে বিস্মিত হইযা ইহাকে daring, uncompromising, eccentric Idealism বলিযাছেন—কাবণ, ইহার তুলনায পাব্মিনাইদিস্ বা প্লেটোব ছাযাবাদ অথবা ফিক্‌টে বা বাব্‌ক্লিব বিজ্ঞানবাদ অকিঞ্চিৎকব। সেই জন্য অধ্যাপক মাক্‌স্‌মূলব গদ্‌গদ বাক্যে বলিয়াছেন যে, ঐ অদ্বৈতবাদেব তুঙ্গ চূড়ায় আবোহণ কবিলে আমাদেব চিত্তেব গতি কেমন যেন স্তম্ভিত হয়—আমাদেব শবীর যেন 'ছমছম' কবে। অতএব অদ্বৈতবাদেব স্থান যে, ভাবতীয় চিন্তাব ইতিহাসে সুপ্রাচীন—এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। পুনশ্চ যে সকল প্রাচীন ঋষিবা এই অদ্বৈতবাদকে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিব দ্বাবা সজীব, সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল কবিযা ইহাকে সুদৃঢ ভিত্তিব উপব চিবস্থাযী কবিযা গিযাছেন, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগেব মুখ্যতম। এই যাজ্ঞবল্ক্য কে ? বৈদিক সাহিত্যে তাঁহাব স্থান কোথায ?

পুবাণে বেদসঙ্কলনেব যে বিববণ বক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব প্রায় সমকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপাযন তদানীং প্রচলিত ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব মন্ত্রসমূহ সংকলন কবিযা সংহিতাব আকাবে নিবদ্ধ কবেন। সেই হইতে তাঁহাব নাম হয 'বেদব্যাস'। ব্যাস অর্থে সংগ্রহকর্ত্তা—বচয়িতা নহে। ঐ কার্য্যে চাবিজন বেদপাবগ শিষ্য তাঁহাব সহাযতা কবিযাছিলেন।

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তংপ্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুবো বেদপাবগান্॥
—বিষ্ণুপুবাণ, ৩।৪।৭

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজুংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
বাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কাবয়ামাস মৈত্রেয়। ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥
—বিষ্ণুপুবাণ, ৩।৪।১৩-১৪

'পবে ব্যাস ঋক্‌সমূহেব উদ্ধাব কবিযা ঋগ্বেদ সঙ্কলন কবিলেন ; যজুঃসমূহেব উদ্ধাব কবিয়া যজুর্ব্বেদ এবং সামসমূহেব উদ্ধাব কবিয়া সামবেদ সঙ্কলন করিলেন এবং অথর্ব্ববেদ দ্বাবা যথাবিধানে ব্রহ্মত্ব স্থাপন এবং রাজাব সমুদয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন কবাইলেন।'

বেদ-সঙ্কলন কার্য্যে যে শিষ্য-চতুষ্টয ব্যাসদেবেব সহাযতা কবিয়াছিলেন, তাঁহাদেব নাম যথাক্রমে পৈল, বৈশম্পাযন, জৈমিনি ও সুমন্ত।

দিগেব নাম ভাবতীয় সমাজে সাদবে বক্ষিত হইযাছিল।
ত্র ইহাঁদিগেব তর্পণের এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয—সুমন্তু-
ন-পৈল সূত্র ভাষ্য ভাবত ধর্ম্মাচার্য্যা যে চান্যে আচার্য্যাঃ
—৩।৪।

ঋগ্বেবেদেব, বৈশম্পাযন যজুর্ব্বেদেব, জৈমিনি সামবেদেব
থর্ব্ববেদেব সঙ্কলন কার্য্যে গুরুব সহায়তা কবিয়াছিলেন।
ঙ্কলিত যজুর্ব্বেদেব নাম তৈত্তিবীয় সংহিতা বা কৃষ্ণ যজুঃ।
যে, বৈশম্পাযনেব প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুব সহিত বিবোধ
তন যজুর্ব্বেদ গ্রন্থন কবেন—তাহাব নাম বাজসনেয সংহিতা বা
। এ সম্বন্ধে পুবাণেব বিববণ অনেকটা বোমাঞ্চকব। গুরু-
বাদ যখন অতিমাত্রায উঠিল, তখন গুরু শিষ্যকে বলিলেন—
আমাব নিকট লব্ধ যজুঃ প্রত্যর্পণ কব।' যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ
সমস্ত যজুঃ বমন করিলেন আব বৈশম্পায়নেব অন্যান্য শিষ্যেবা
বি পক্ষীব মূর্ত্তি পবিগ্রহ কবিয়া ঐ বান্ত যজুঃ চঞ্চুপুট দ্বাবা উদবস্থ
লে। সেই হইতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেব নাম হইল 'তৈত্তিবীয'-সংহিতা।
ভিমানে যাজ্ঞবল্ক্য গুরুব আশ্রম ত্যাগ কবিযা সূর্য্যেব উপাসনায আত্ম-
য়োগ কবিলেন এবং কালক্রমে সাধনায সিদ্ধ হইয়া সূর্য্যেব প্রসাদে
নবতব ও কল্যাণতব যজুঃ লাভ কবিলেন। ইহাই শুক্ল যজুর্ব্বেদ। যেহেতু
যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যেব নিকট হইতে এই যজুর্ব্বেদ লাভ কবিলেন, অতএব
ইহাব নাম হইল—'বাজসনেয়'-সংহিতা।

এই উপাখ্যানেব মূলে, রূপকাকাবে যে সত্যই নিহিত থাকুক, ইহা নিঃসংশয় যে, শুক্ল যজুর্ব্বেদেব সহিত যাজ্ঞবল্ক্যেব বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বৃহদাবণ্যকেব শেষাংশে লিখিত আছে—আদিত্যানি (অর্থাৎ আদিত্য হইতে প্রাপ্ত) ইমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে। ঐ গ্রন্থেব আবও কযেক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যকে 'বাজসনেয়' যাজ্ঞবল্ক্য বলা হইযাছে।

প্রত্যেক বেদেব নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেব যেমন 'তৈত্তিবীয়' ব্রাহ্মণ, সেইরূপ এই শুক্ল যজুর্ব্বেদেব সহিত সংশ্লিষ্ট 'শতপথ' ব্রাহ্মণ। এই শতপথ ব্রাহ্মণেব শেষ ছয অধ্যাযেব নাম বৃহদাবণ্যক। ইহাই আমাদের উল্লিখিত বৃহদাবণ্যক-উপনিষদ্। ইহাব আবম্ভ-বাক্য (opening sentence)—ওঁ ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিবঃ। শঙ্কবাচার্য্য এই উপনিষদেব যে ভাষ্য বচনা কবিয়াছেন, তাহাব উপোদ্‌ঘাত (introduction) এইরূপ ঃ—

'উষা বা অশ্বস্য' ইত্যেবমাদ্যা বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণোপা
* * সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদ্ আরণ্যক
তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে।

এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের
সমগ্র তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় অধ্যায় নয় খণ্ডে এবং
ছয় খণ্ডে বিভক্ত) যাজ্ঞবল্ক্যের কথাকাহিনীতে ও তাঁহার উপদে
ঐ সকল উপদেশ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের
পাওয়া যায় ?

কিন্তু সে আলোচনার পূর্ব্বে, এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের
জীবনের কি বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা ক

গৃহস্থ যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ।
মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী—বৃহ ৪।৫।১।

দুই পত্নীর মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী আর কাত্য
স্ত্রী-প্রজ্ঞা (স্ত্রী-জনোচিত বুদ্ধিমতী)। গার্হস্থ্য জীবনে যাজ্ঞবল্ক্য
পৌরোহিত্য করিতেন, স্বয়ং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তদানীং প্রচলি
রীতি-অনুসারে ছাত্র বা শিষ্যদিগকে গৃহে স্থান দিয়া বিদ্যাদান করিতেন
ঐরূপ ছাত্রকে 'অন্তেবাসী' বা 'ব্রহ্মচারী' বলিত।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণম্ উবাচ—বৃহ ৩।১।২।

ঐ সময়ে রাজর্ষি জনক বিদেহ (মিথিলার) অধিপতি ছিলেন। বৃহদারণ্যকে তাঁহাকে 'সম্রাট্' বলিয়া সম্বোধন আছে। ইহাতে মনে হয় তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষের অধিরাজ ছিলেন। রাজর্ষি জনক একবার এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে বৃহ ৩।১।১।

ঐ যজ্ঞসভায় কুরুপাঞ্চালের (ফলতঃ উত্তর ভারতের) সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন—তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুঃ। যাজ্ঞবল্ক্যও শিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কে 'অনূচানতম' (বেদবিদ্যায় বরিষ্ঠ)—ইহা জানিবার জন্য জনকের কৌতূহল হইল। (বলা উচিত যে, জনক কেবল যে পার্থিব সম্পদে সম্পন্ন ছিলেন, তাহা নহে—তিনি 'অধীত-বেদ' ও 'উক্তোপনিষৎক' ছিলেন অর্থাৎ বেদবিদ্যায় তাঁহার প্রগাঢ় প্রবেশ ছিল—এবং বৃন্দারক আঢ্যঃসন্ অধীতবেদ উক্তোপনিষৎকঃ (বৃহ, ৪।২।১)। জনক ঐ উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্থলে এক সহস্র গাভী বাঁধিয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেক

দশটি সুবর্ণ পদক গাঁথিয়া দিয়া বলিলেন—'হে আর্য্য
বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্—আপনাদের মধ্যে
এই গোসহস্র লইয়া যান।' কোন ব্রাহ্মণই অগ্রসর
খন যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যকে আদেশ করিলেন 'সৌম্য! এই
যাও।' শিষ্য তাহাই করিল। ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বর সভায়
কন্যা-গ্রহণ করিলে, রাজারা অপমানে অন্ধ হইয়া তাহাকে
ণ করিত, এক্ষেত্রেও সেইরূপই ঘটিল। সমবেত ব্রাহ্মণেরা
লেন—'যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ!—ত্বং নু
জ্ঞবল্ক্য! ব্রহ্মিষ্ঠোসি।' তখন যাজ্ঞবল্ক্যের উপর অজস্র
র্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভজ্যু, উষস্ত প্রভৃতি
প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যথোচিত
প্রত্যেককেই নিরস্ত করিলেন। যজ্ঞসভায় গার্গীনাম্নী একজন
নী উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া
ন—'মহাশয়গণ! আমি ইহাকে দুইটি প্রশ্ন করিতে পারি কি?
ইনি আমার ঐ প্রশ্নদ্বয়ের সদুত্তর দিতে সক্ষম হন তবে জানিবেন কেহই
কে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না—ন বৈ জাতু যুষ্মাকম্
কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতা ইতি।' তখন গার্গী বলিলেন—'যাজ্ঞবল্ক্য!
মন বীরপুত্র ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া অরাতিকে দুইটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ
রে, তেমনি তোমার প্রতি দুইটি প্রশ্নবাণ সন্ধান করিলাম—উত্তর দাও।'
জ্ঞবল্ক্য বলিলেন—পৃচ্ছ গার্গি। তখন উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর
চলিল। অবসানে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন—'হে মান্য ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মবাদে নিশ্চয়ই আপনারা কেহই
ইহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যদি নমস্কার দ্বারা ইহার নিকট
নিষ্কৃতি পান, তাহাই যথেষ্ট মনে করিবেন—তদেব বহুমন্যেধ্বং যদ্ অস্মাৎ
নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ব্রাহ্মণগণ! মৌনী রহিলেন
কেন? যাঁহার যাহা ইচ্ছা, প্রশ্ন করুন—যো বঃ কাময়তে স মা
পৃচ্ছতু, সর্ব্বে বা মা পৃচ্ছত।' কিন্তু কেহই সাহসী হইলেন না—
তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে (প্রথম
হইতে নবম কাণ্ড পর্য্যন্ত) এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঐ
বিবরণে বিবিধ বাদবিতণ্ডার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব কি ভাবে
উজ্জ্বলিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

স হোবাচ এতদ্ বৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—
হে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞগণ সেই অক্ষরের এইরূপ বর্ণন করেন। সেই অক্ষর
বা ব্রহ্মবস্তু কিরূপ? তিনি—

অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্, অলোহিতম্ অ
অনাকাশম্, অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্র
অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অসুখম্ অমাত্রম্ অনন্তবম্ অবাহ্যম্—
অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত ন
ছাযা নহেন, তমঃ নহেন, বাযু নহেন, আকাশ নহেন, তি
শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহে
মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, সুখ নহেন, মাত্র
নহেন, বাহিব নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল অ—অ, ন—ন,
নেতি মাত্র।

এই বৈদেহ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যেব মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল
বেদবিদ্যা বিষযে অনেক সময়েই আলোচনা কবিতেন। অথ হ য
বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ অগ্নিহোত্রে সমূদাতে—'কোন সময বৈদে
ও যাজ্ঞবল্ক্য—উভযেব মধ্যে অগ্নিহোত্র সম্পর্কে আলোচনা হই
এ আলোচনাব বিববণ বক্ষিত হয নাই। তবে বৃহদাবণ্যক হইতে
পাবি, যাজ্ঞবল্ক্য ঐ আলোচনায প্রীত হইয়া জনককে 'কাম-প্রশ্ন
দিয়াছিলেন। তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ববং দদৌ। স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে
হ অস্মৈ দদৌ—৪।৩।১।

'কামপ্রশ্ন'-বব দানেব অর্থ এই—জনক যাহা প্রাণ চায় প্রশ্ন কবিবে
যাজ্ঞবল্ক্য অসঙ্কোচে তাহাব উত্তব দিবেন। তদনুসাবে চতুর্থ অধ্যাযে
তৃতীয ও চতুর্থ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, জনক আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে
যাজ্ঞবল্ক্যকে নিগূঢ় প্রশ্ন কবিতেছেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহাব সংশয়চ্ছেদী
উত্তর দিতেছেন। এখানেও সেই অদ্বৈতবাদ—ন তু তদ্ দ্বিতীযমস্তি
ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—'যদি দ্বৈত কিছু থাকিত, তবে তাহাব
অনুভব হইতে পারিত। কিন্তু দ্বৈত, দ্বিতীয়, বিভক্ত কই?' এই যে
মহান্ অজ আত্মা—যিনি অজব অমর অভয—তিনিই ব্রহ্ম—স বা এষ
মহান্ অজ আত্মা অজবঃ অমৃতঃ অভয়ো ব্রহ্ম—বৃহ ৪।৪।২৫।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদেব আব এক দিনেব বিববণ বৃহদাবণ্যকেব
চতুর্থাধ্যাযেব প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বক্ষিত হইযাছে। বৈদেহ জনক
বাজাসনে সমাসীন আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তথায় উপস্থিত হইলেন—জনকো হ
বৈদেহ আসাং চক্রে অথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। বাজা বলিলেন—
'যাজ্ঞবল্ক্য! কি উদ্দেশ্যে আগমন? পশুলাভেব ইচ্ছায় না সূক্ষ্মতত্ত্বেব
আলোচনাব জন্য?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—উভয়মেব সম্রাট্—'সম্রাট্!
উভয়ই বটে।' তখন উভয়েব মধ্যে সূক্ষ্ম বিষয়েব আলোচনা চলিতে
লাগিল। জনক প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তবে ব্রহ্মতত্ত্বেব

নিগূঢ় বহস্যসমূহ বিবৃত কবিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইযা বলিলেন—'হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামি—আপনাকে হস্তিতুল্য বৃষ সহ সহস্র গাভী দান কবিতেছি।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'আমাব পিতার আদেশ—সম্যক্ উপদেশ না দিযা প্রতিগ্রহ কবিবে না—নাননুশিষ্য হবেত ইতি।' বাজা আসন হইতে উঠিযা শিষ্যভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট আত্মনিবেদন কবিযা বলিলেন—নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য! অনু মা সাধি—'গুরো! আপনাকে নমস্কাব—আমায উপদেশ করুন।' তখন যাজ্ঞবল্ক্য ধাপে ধাপে উঠিযা জনকেব নিকট নিগূঢ়তম চবম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ কবিলেন—'স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্জতে, অসিতো নহি ব্যথতে, ন বিষ্যতি—এই পবমাত্মার একমাত্র পবিচয় নেতি নেতি। ইনি অগ্রাহ্য—ইহাঁকে গ্রহণ কবা যায় না, ইনি অশীর্য্য—শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ—আসক্ত হন না, ইনি অসিত—ব্যথিত হন না, বিষ্ট হন না।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ইহাই চবম—এই আপনি 'অভয' প্রাপ্ত হইলেন—'অভযং বৈ জনক প্রাপ্তোসি।' জনক বলিলেন—'ভগবন্! আপনি আমাকে অভয় প্রাপ্তি কবাইলেন—আপনাবও অভয় প্রাপ্তি হউক। আপনাকে নমস্কাব—অভযং ত্বা গচ্ছতাৎ যাজ্ঞবল্ক্য! যো নো ভগবন্ অভয়ং বেদয়সে—নমস্তে অস্তু—ইমে বিদেহাঃ অয়মহম্ অস্মি—এই বিদেহ বাজ্য ও নিজেকে আপনাকে নিবেদন কবিলাম।' উপনিষদ্ বলেন—দ্বৈতাদ্ বৈ ভযং ভবতি—দ্বৈত হইতেই ভয হয—যিনি অদ্বৈত, সেই ব্রহ্মই অভয়।

অন্যত্রও যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ঐ অভয়েব উপদেশ-অন্তে বলিতেছেন—এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি। 'হে সম্রাট্! ঐ ব্রহ্মলোক, তুমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে।' যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলে জনক বলিলেন, 'ভগবন্! বিদেহ বাজ্য আপনাকে নিবেদন করিলাম। তৎসঙ্গে নিজেকেও নিবেদন কবিলাম।'

এইরূপে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহাধিপতি জনককে অদ্বৈততত্ত্বেব উপদেশ দিয়াছিলেন। পববর্ত্তীকালে বাজর্ষি জনকেব পবিচয স্থলে এ ব্যাপার উল্লিখিত হইত ঃ—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির্যস্মৈ ব্রহ্ম পাবায়ণং জগৌ।

প্রাচীন ভাবতেব প্রথামত, কালক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যের সংসাব-আশ্রম ছাড়িবাব সময আসিল। তিনি পত্নীদ্বয়কে সম্বোধন কবিযা বলিলেন,—'মৈত্রেয়ি! আমি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন কবিবাব জন্য এস্থান ত্যাগ কবিব। আইস, তোমাব ও কাত্যায়নীব মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ কবিযা দিই—মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ (অন্যদ্ বৃত্তম্ উপাকবিষ্যন্) প্রব্রজিষ্য

ৰা অবে অহম্ অস্মাৎ স্থানাদ্ অস্মি ; হন্ত তে অনযা কাত্যায়ন্যা অন্তং কববাণি ইতি।' মৈত্রেযী বলিলেন—'স্বামিন্! এই সমুদয পৃথিবী যদি বিত্তপূর্ণা হয, তদ্দ্বাবা আমি কি অমৃতা হইতে পাবিব ?—সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেন অমৃতা আহো ন ইতি'। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'তাহা কি কখন হয ? অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন—বিত্তদ্বাবা অমৃতত্বেব আশাই নাই।' ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেযী জানিতেন—ন বিত্তেন তর্পণীযো মনুষ্যঃ। তাই তিনি বলিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্—যাহা দ্বাবা অমৃতত্ব লাভ না হয, তাহা লইয়া আমি কি কবিব ? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি—আপনি আমাকে প্রজ্ঞান উপদেশ করুন।' কাবণ, মৈত্রেয়ী জানিতেন—প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ—প্রজ্ঞান দ্বাবাই অমৃতত্ব লাভ হয। তখন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেযীব নিকট অমোঘ অদ্বৈততত্ত্ব উপদেশ কবিলেন। ইতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহাব—উপদেশ-অন্তে যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজিত হইলেন।

ঐ উপদেশেব সাব মর্ম্ম এই :—'আত্মা বা অবে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেযি! আত্মনি খল্ববে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। পবমাত্মাকেই দর্শন কবিতে হইবে, শ্রবণ কবিতে হইবে, মনন কবিতে হইবে, নিদিধ্যাসন কবিতে হইবে। মৈত্রেযি! এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কবিলে এই সমুদাযই বিদিত হয়।' যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতব ইতবং পশ্যতি, তদিতব ইতবং জিঘ্রতি, তদিতব ইতবং বসয়তে, তদিতব ইতবমভিবদতি, তদিতব ইতবং শৃণোতি, তদিতব ইতবং মনুতে, তদিতব ইতবং স্পৃশতি, তদিতব ইতবং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং বসযেৎ তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ? যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। স এষ নেতি নেতি আত্মা * * * বিজ্ঞাতাবম্ অবে কেন বিজানীযাৎ * * এতাবদ্ অবে খলু অমৃতত্বম্—৪।৫।১৫। 'যেখানে (মনে হয) যেন দ্বিতীয বস্তু আছে, সেখানেই একজন অপবকে দর্শন কবে, একজন অপবকে আঘ্রাণ করে, একজন অপবকে আস্বাদন কবে, একজন অপবকে বচন কবে, একজন অপবকে শ্রবণ কবে, একজন অপবকে মনন কবে, একজন অপবকে স্পর্শন কবে, একজন অপবকে বিজ্ঞান কবে। (কিন্তু) যখন কাহাবও নিকট সবই আত্মা হইযা গেল, তখন কিরূপে কে কাহাকে দর্শন কবিবে, কে কাহাকে আঘ্রাণ কবিবে, কে কাহাকে আস্বাদন কবিবে, কে কাহাকে বচন কবিবে, কে কাহাকে শ্রবণ কবিবে, কে কাহাকে মনন কবিবে, কে কাহাকে

স্পর্শন করিবে, কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে? যাহা দ্বারা এই সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' ('ইহা নয়' 'ইহা নয়')। বিজ্ঞাতা কিরূপ বিজ্ঞাত হইবেন? হে মৈত্রেয়ি। ইহাই অমৃতত্ব।' সেই জন্যই উপনিষদ্ অন্যত্র বলিয়াছেন—অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্—যিনি বিষয়ী (Subject), তিনি কখনও বিষয় (বিজ্ঞাত= Object) হইতে পারেন না।

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ—'যে জানেনা সেই জানে, যে জানে সে জানে না।' অদ্বৈততত্ত্ব এমনই প্রহেলিকা—ইহা সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য, সমস্ত দ্বৈতের চিরসমন্বয়—supreme unity of all contradictions।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে। উভয় বিবরণে ভাষাগত—এমন কি অক্ষরগত সৌসাদৃশ্য—তবে চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত। এই দ্বিরুক্ত বিবরণ (double recension) দৃষ্টে মনে হয়, মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ বেশ সুপ্রাচীন।

উপরে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় উপলক্ষে আমরা তাঁহার উপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রতি ঈষৎ লক্ষ্য করিলাম। ইহা ইঙ্গিত মাত্র—তদধিক নহে। আগামী বারে আমরা ঐ অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র নির্দ্ধারণ করিতে ও ঐ সূত্রের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বৌদ্ধধর্ম্মের দান

(১) সাহিত্য

বৌদ্ধধর্ম্ম ইউবোপেব পণ্ডিতদেব দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ কবতে পেবেছে আমাদেব তা' পাবে নি। অথচ এই ধর্ম্ম যে ভাবতীয় সভ্যতাব প্রাণস্বরূপ তা'তে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রেবণা পেয়েই ভাবতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা পূর্ণবিকাশ লাভ কবেছিল; কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যে নূতন বস সঞ্চাব হ'য়েছিল, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিও প্রসাব লাভ কবেছিল। ভাবতবর্ষ থেকে সাইবিবিয়া ও পাবস্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগবেব দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত, সমস্ত দেশেব অধ্যাত্ম-দৃষ্টিব ভিতব যে আজ অবধি একটা ঐক্য দেখা যায় তা' বৌদ্ধধর্ম্মেব অনুপ্রেবণাতেই ঘটেছিল। ভাবতেব বাইবে ভারতীয় সভ্যতাব প্রসাব যদি বেশীব ভাগ বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রভাবেই হ'যে থাকে, তবে তা'ব ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন উপেক্ষা ক'বে নিজেদেব আদর্শকেই যে ক্ষুণ্ণ কবছি, সে কথা জোব ক'বেই বলা চলে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে নূতন ভাবধারা বইয়ে দিযে ভাবতেব প্রাণকে বসময ক'বে তুলেছিল সে ধাবা কোথায কি ভাবে নূতন নূতন উৎসেব সৃষ্টি কবেছিল তা' আমাদেব জান্‌তে হ'বে, নইলে ভাবতেব ইতিহাস অসম্পূর্ণ বয়ে যাবে।

বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রাচীন সাহিত্য নানা ভাষায পাওয়া গেছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কম্বুজে পালি ভাষায, নেপালে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়, ও তুর্কীস্থানেব মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও নানাস্থানীয ভাষায়, এ ছাড়া সমস্ত বৌদ্ধসাহিত্যেব অনুবাদ বয়েছে তিব্বতী, চীনা ও মাঙ্গোলীয় ভাষায়। বৌদ্ধসাহিত্যেব এই সমস্ত দিকটা নিযে প্রথম তুলনামূলক আলোচনা স্বরু কবেন ফবাসী পণ্ডিত ইউজেন বুর্ণুফ (Eugene Burnouf)। ১৮৪৪ সনে তাঁব বই Introduction a l'histoire du Buddhisme Indien প্রথম প্রকাশ হয়। তখন বৌদ্ধ সাহিত্যেব কোন বইই ছাপা হযনি। প্রাচীন পুঁথিব উপব নির্ভব ক'বেই তাঁকে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা কবতে হ'যেছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এই প্রায একশ বছব ধ'বে তাঁব বই বৌদ্ধ-ধর্ম্মেব সব চেযে বড বই হিসাবে পণ্ডিত মহলে সম্মান পেযে আস্‌ছে। বুর্ণুফেব সময থেকে জার্ম্মানী ও বাশিয়াব পণ্ডিতেবা বেশীব ভাগ তাঁব প্রদর্শিত পথ অনুসবণেই বৌদ্ধধর্ম্মেব আলোচনা কবতে লাগ্‌লেন। তাঁবা ক্রমশই বুঝতে পাবলেন যে কোন বিশেষ দেশেব বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে বৌদ্ধধর্ম্মেব যে পবিচয় মিলবে সেটা হ'বে একপেশে। তাই সমস্ত সাহিত্যগুলিব তুলনামূলক বিচাব ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধাব হ'বে না তা' তাঁবা দেখতে পেলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডে রিস ডেভিডস্ (Rhys Davids) প্রমুখ পণ্ডিতেরা একদম উল্টা পথ ধরলেন। তাঁরা সিংহল থেকে পালি পুঁথি সংগ্রহ ক'রে, পালিতে লেখা বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করলেন। তা'র ফল দাঁড়াল বিষময়, তাঁদের আলোচনা হ'ল একপেশে ও তাঁদের লেখা হ'ল যুক্তিহীন। সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিশ্বাসের ভূত ঘাড়ে চেপে বসল—তাই তাঁরা প্রায় ভিক্ষুদের কথাই ইংরাজী ভাষায় বল্‌লেন। তাঁদের মতে ঠিক হ'ল যে, বৌদ্ধসাহিত্য প্রথম পালিভাষায় লেখা হয়, পালিভাষা কোশল ও মগধের প্রাচীন ভাষা। আর সমস্ত পালি বৌদ্ধসাহিত্য বুদ্ধের মৃত্যুর সময় থেকে অশোকের সময় পর্য্যন্ত, (৫০০—২৫০ খৃঃ পূঃ) এই তিনশ বছরের মধ্যেই রচিত। এই সব বিচারহীন কথায় আর কা'রো ক্ষতি হোক্ না হোক্, আমাদের খুবই ক্ষতি হ'য়েছে। কারণ আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা এই সব মতামত নির্ভুল মনে ক'রে ও পালি বৌদ্ধসাহিত্য খুব প্রাচীন ধ'রে নিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন ও করছেন তা'র গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে।

যা হোক্ পালিভাষায় লেখা বৌদ্ধসাহিত্য প্রাচীন না হ'লেও বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রাচীন তা'তে সন্দেহ নেই। এই প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের রূপ সঠিক ধরতে গেলে বৌদ্ধসাহিত্যের সমস্ত দিকটা না দেখলে চলে না। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভারতের সীমান্তদেশ ব্রহ্ম, সিংহল, ও নেপালে তা'র আধিপত্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতের বাইরে শ্যাম, কম্বুজ, আনাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও মঙ্গোলীয়দেশে তা'র প্রভাব এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাই এ সকল দেশের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম্মকে দু'টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন—Northern ও Southern Buddhism. কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মকে এ ভাবে ভাগ করা চলে না। কারণ এরূপ ভাগ শুধু দেশ-বিভাগের উপরই স্থাপিত, কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক মতের উপর স্থাপিত নয়। যে সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্ম এখন সিংহলে চল্‌ছে তা' প্রাচীনকালে উত্তরাপথেও ছিল, আর যে ধর্ম্মমত উত্তরাপথে ছিল তা'র নিদর্শন প্রাচীন সিংহলেও পাওয়া যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য্যেরা তাঁদের ধর্ম্মমতকে যে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেছেন তার নাম হচ্ছে হীনযান ও মহাযান। এ বিভাগ তাঁরা ধর্ম্মের প্রসার হিসাবে করেন নি—বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির পর্য্যায় হিসাবেই করেছেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণের চার-পাঁচশ বৎসর পরে তাঁর ধর্ম্মমত কয়েকজন খ্যাতনামা আচার্য্যদের হাতে এমন সমৃদ্ধ হ'লো যে তাঁরা তা'কে নূতন আখ্যায় অভিহিত করাই

যুক্তিযুক্ত মনে কবলেন। এঁদেব মতে প্রাচীনেবা বুদ্ধেব ধর্ম্মমতেব গূঢ় অর্থ ধবতে না পেবে নিশ্চেষ্টভাবে বৌদ্ধধর্ম্মেব কতকগুলি বাইবেব আচাব মেনে আস্‌ছিলেন। তাই তাঁবা নূতন মতেব "মহাযান" এবং প্রাচীন মতেব "হীনযান" আখ্যা দিলেন। বস্তুতঃ মহাযান যে বৌদ্ধদর্শনেব ক্রমোন্নতিব একটা নূতন পর্য্যায় নির্দ্দেশ কবে—তা'তে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলে মহাযানেব উৎপত্তিব সঙ্গেই যে হীনযান লুপ্ত হ'য়েছিল তা' বলা চলে না। বৌদ্ধসঙ্ঘেব একাংশ ববাববই প্রাচীন মত অবলম্বন ক'বে ছিলেন, তাই সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কম্বুজে এখনও হীনযান প্রবল বযেছে। জাপানী বৌদ্ধেবা মহাযান অনুসবণ কবলেও হীনযান গ্রন্থ অধ্যয়ন ক'বে থাকেন। তা' ছাড়া যে যে দেশে মহাযান প্রবল ছিল বা এখনও আছে সেখানে ভিক্ষুব বাইবেব আচাব-ব্যবহাব সম্বন্ধে হীনযান বা প্রাচীন পন্থা অবলম্বন কবা হ'যে থাকে। শুধু অধ্যাত্মদৃষ্টিকে উদাব কববাব জন্যই মহাযান পন্থাব আবশ্যক। তাই দেখা যায যে, হীনযান ও মহাযান উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ; লৌকিক ব্যবহাব হিসাবেই শুধু কতকগুলি বিভাগ নির্দ্দেশ কবা চলে।

যাঁবা হীনযান বা প্রাচীন পন্থা অবলম্বন কবতেন তাঁদের দৃষ্টি কিছু সঙ্কীর্ণ ছিল। তাঁদেব মধ্যে একদল বুদ্ধ-প্রদর্শিত আচার-ব্যবহাব পালন ক'বে, ধর্ম্মপথে থেকে, পুণ্য অর্জ্জন ক'বতে তৎপব হ'তেন—কিন্তু বুদ্ধত্বলাভ কববাব দুবাশা পোষণ কবতেন না। তাঁদেব পথকে বিশেষভাবে শ্রাবক-যান বলা হ'ত। আব একদল বুদ্ধত্বলাভ কববাব আশা বাখতেন বটে—কিন্তু সে শুধু নিজেব জন্যই। জগতেব মঙ্গলেব জন্য আত্মোৎসর্গ কবতে তাঁবা চাইতেন না। সেই জন্য তাঁদেব পথকে বিশেষভাবে প্রত্যেক-বুদ্ধযান বলা হ'ত। সুতবাং হীনযানেব এই দুই পর্য্যাযভাগ আধ্যাত্মিক উন্নতিব স্তব হিসাবে কবা হ'যেছিল। কিন্তু ভিক্ষুব বাইবেব আচাব-ব্যবহাবেব খুঁটিনাটি নিয়ে খুব প্রাচীনকালেই বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিতব গোলমাল বেধেছিল। তাই প্রাচীন সঙ্ঘেব ভিতর অশোকেব পূর্ব্বেই প্রায আঠারোটী শাখাব সৃষ্টি হ'যেছিল? এই শাখাগুলিব মধ্যে দশটী শাখা কালক্রমে প্রভাব-সম্পন্ন হ'যে ওঠে ও নিজেদেব এক-একটা বিপুল সাহিত্য গড়ে তোলে। এই দশটী শাখাব নাম হচ্ছে—স্থবিববাদ (পালিতে থেববাদ), হৈমবত, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্ব্বাস্তিবাদ, মূলসর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিক ও সম্মিতীয। এ দশটীকে আবাব দু'দলে ভাগ কবা চলে। প্রথম আটটীব মধ্যে পবস্পব সম্বন্ধ খুব নিকট। মহাসাংঘিক ও তা'ব উপশাখা সম্মিতীয খুব প্রাচীনকালেই প্রথম আটটী থেকে বেশ দূবে সবে এসেছিল। এই দুই সম্প্রদায়েব দর্শনদৃষ্টিব সঙ্গে মহাযানেব এত

গূঢ় সম্বন্ধ যে, মহাযান এদের থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে একথা মনে করা অসঙ্গত হ'বে না।

যাঁরা মহাযান অবলম্বন করলেন তাঁদের আদর্শ হ'ল উদার। নিজের জন্য বুদ্ধত্বলাভ করবার চেষ্টা করা বা বুদ্ধত্বলাভ করা তাঁদের কাছে তুচ্ছ মনে হ'ল। ভগবান্ বুদ্ধ যেমন সারা জগতের মঙ্গলের জন্য জন্মে জন্মে নিজেকে বলি দিয়েছিলেন, এঁরাও তাই করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠ্‌লেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে শাক্যমুনি-গৌতম বুদ্ধত্বলাভ করবার বহু পূর্ব্ব থেকে, জন্ম জন্মান্তর ধ'রে পরোপকারে আত্মোৎসর্গ ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর সেই অবস্থাগুলিকে বোধিসত্ত্ব অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় বা বোধিমার্গে একবার আরূঢ় হ'তে পারলেই ভিক্ষু ধীরে বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। তাই মহাযান পন্থা যাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের কাছে এই বোধিসত্ত্ব অবস্থাটাই কাম্য হ'ল—অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করতে পারে সেই অবস্থাটাই তাঁদের আদর্শ হ'ল। এই অবস্থাটা স্থায়ী করা দু'ভাবে সম্ভব হ'ত। মহাযানের প্রথম আচার্য্যেরা মনে করতেন যে, কতকগুলি বিশেষ "পারমিতা" বা করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি বিশেষ গুণচর্য্যা ক'রেই এ অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। দর্শনদৃষ্টির তারতম্য-অনুসারে এঁরা দুই শাখায় বিভক্ত হ'ন—মাধ্যমিক ও যোগাচার। পরবর্ত্তী কোন কোন আচার্য্যেরা মনে করলেন যে, মন্ত্রশক্তির নিয়োগেও এই কাম্য অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। তাঁরাও দর্শনদৃষ্টির বিভিন্নতা হিসাবে মোটামুটি তিনটী শাখায় বিভক্ত হ'লেন। এই তিনটী শাখার নাম হচ্ছে—বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। তিনটীকে সাধারণভাবে মন্ত্রযান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এইবার বৌদ্ধদের এই নানা শাখার ভিতর যে বিপুল শাস্ত্রের সৃষ্টি হ'য়েছিল তা'র কিছু পরিচয় দেব। বৌদ্ধশাস্ত্র সাধারণতঃ তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগকে তিন পিটক বা ত্রিপিটক বলা হয়। এই তিন পিটক হচ্ছে—সূত্র-পিটক, বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম্ম-পিটক। সূত্র-পিটকে বুদ্ধ কথাচ্ছলে নানা ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন। বিনয়-পিটকে তিনি শিষ্যদের বিনয় বা ধর্ম্মাচার শিখাচ্ছেন। আর অভিধর্ম্মে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শনের কথা আছে। এই হ'ল হীনযানের প্রধান শাস্ত্র। এ ছাড়া তিন পিটকের বাইরেও নানা বই আছে, সেগুলি বেশীর ভাগ টীকা টিপ্পনী। হীনযানের যে দশটী শাখার নাম করেছি তাদের প্রত্যেকেরই এই ত্রিপিটক ছিল। পালি ভাষায় যে ত্রিপিটক লেখা হ'য়েছিল সে হচ্ছে থেরবাদ বা স্থবিরবাদের শাস্ত্র। এগুলিকে একত্র ছাপ্‌লে প্রায় চার-পাঁচ হাজার অকটেভো পাতা ভরে যায়। এ'তে বহু বিভিন্ন সূত্র

সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। হৈমবত, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক ও কাশ্যপীয়দেব ত্রিপিটক মূলতঃ কোন্ ভাষায় লেখা হ'য়েছিল তা' বলা যায় না। কাবণ তাদেব ত্রিপিটক শুধু চীনা অনুবাদেই পাওয়া গেছে। তবে আন্দাজ কবা যায় যে, ধর্ম্মগুপ্তদেব ত্রিপিটক উত্তব-পশ্চিম ভাবতে প্রচলিত প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় লেখা হ'য়েছিল। কাবণ মধ্য এসিয়াব এই প্রাকৃতে লেখা ধর্ম্মপদেব যে সংস্কবণ পাওয়া গেছে—তা' তা'দেবই মনে হয। সর্ব্বাস্তিবাদ ও মূল সর্ব্বাস্তিবাদেব ত্রিপিটক যে সংস্কৃত ভাষায লেখা হ'যেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। কাবণ এই দুই শাখাব প্রাচীন শাস্ত্রেব যে যে অংশ নেপালে পাওয়া গেছে তা' সংস্কৃতেই লেখা। তবে এদেব সম্পূর্ণ শাস্ত্র চীনা, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় অনুবাদেই পাওয়া যায়। মহাসাংঘিক ও সম্মিতীযদেব শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে চীনা অনুবাদে বযেছে, শুধু তা'ব খণ্ডিত অংশ নেপালে পাওয়া গেছে। এঁবা যে ভাষায লিখ্‌তেন সেটা হ'ল প্রাকৃত-বহুল সংস্কৃত ভাষা বা মিশ্র সংস্কৃত। সুতবাং হীনযানেব এই দশটা সম্প্রদাযেব মধ্যে থেববাদেব ধর্ম্মশাস্ত্র পালিতে আব বাকী ন'টী সম্প্রদায়েব শাস্ত্র আংশিকভাবে খণ্ডিত সংস্কৃত বা প্রাকৃত পুঁথিতে, আংশিকভাবে তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় অনুবাদে এবং সম্পূর্ণভাবে চীনা অনুবাদে পাওযা যায়। চীনা অনুবাদে প্রায় পাঁচ হাজাব বই বযেছে।

এইবাব এই বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্রেব গোড়াব কথা কিছু বলা দবকাব। শাস্ত্রীয় প্রবাদ যাই বলুক না কেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁদেব মতাবলম্বী ইউবোপীয পণ্ডিতেবা যাই বিশ্বাস করুন না কেন, এমন কথা বলা চলে না যে এই বিপুল শাস্ত্র বুদ্ধেব জীবদ্দশায় বা তাঁব মৃত্যুব কযেকশ বৎসবেব মধ্যেই বচিত হ'যেছিল। বহু শতাব্দী ধ'বে এ'র বচনা চলেছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রেব নানাদিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা কবলে বোঝা যায় যে, অশোকেব পূর্ব্বে বা খৃঃ পূর্ব্ব তিন শতকেব পূর্ব্বে যে বৌদ্ধশাস্ত্র বচিত হ'যেছিল তা'ব সংখ্যা খুব বেশী নয। ত্রিপিটক ত দূবেব কথা, একটা পিটকও বচিত হয় নি। অশোকেব একশ বছব পবেও 'ত্রিপিটকে'ব কোন উল্লেখ পাওয়া যায না—পাওযা যায শুধু 'পিটক' কথাটা। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতেবা অধ্যয়নেব সুবিধাব জন্য ছোট ছোট শাস্ত্রেব একত্র সন্নিবেশ কবতে সুরু কবেছেন, এইমাত্র বোঝা যায়। অশোক তাঁব অনুশাসনে ভিক্ষু সঙ্ঘকে শাস্ত্র অধ্যযন কবতে বলেছেন। তাঁব সময যদি 'ত্রিপিটক' থাক্‌ত তাহ'লে তাবই নাম কবতেন, কিন্তু তা' না কবে মাত্র সাতটী সূত্রেব নামোল্লেখ কবেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠ্‌বে, অশোকেব পূর্ব্বে বৌদ্ধশাস্ত্রেব কি রূপ ছিল, কোন ভাষায় বা তা' লেখা হ'ত। বুদ্ধ নিজে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন

কোশল ও মগধ দেশে। তাঁর মৃত্যুর পর দু'-তিনশ বছর ধ'রে—এমন কি অশোকের সময় পর্য্যন্ত—বুদ্ধের ধর্ম্ম এই দেশের বাইরে যে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল তা' মনে করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধ নিজে ও তাঁর পরবর্ত্তীকালে, এমন কি অশোকের সময় পর্য্যন্ত, সঙ্ঘনায়কেরা কোশল-মগধের ভাষায় ধর্ম্মের আলোচনা করতেন। শাস্ত্র প্রথমতঃ সেই দেশের ভাষায় রচিত হ'ত। কোশল-মগধের ভাষা ছিল মাগধী প্রাকৃত। জৈনরাও এই প্রাকৃতেই তাঁদের শাস্ত্র লিখেছিলেন। এই ভাষার সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল "র" আর "স"-এর প্রয়োগ। সংস্কৃতে বা অন্য প্রাকৃতে যেখানে "র" ছিল, মাগধীতে সেখানে হ'ত "ল"। আর পালিতে যেখানে "স" ছিল, মাগধীতে হ'ত "শ"। অশোক তাঁর অনুশাসনে যে সাতখানি ধর্ম্মগ্রন্থের নাম করেছেন সে নামগুলি যে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লেখা তা'তে সন্দেহ নেই। এই দু'টী বিশেষত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য নিয়ম-কানুনের সাহায্যে বিচার ক'রে দেখা গেছে যে, পালি ভাষা কোশল-মগধের প্রাকৃত নয়। এ ভাষা ছিল পশ্চিম ভারতের বা খুব সম্ভবতঃ অবন্তীর কথিত ভাষার মার্জ্জিত রূপ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে এ'র যে রূপ পাওয়া যায় সে রূপ যে অশোকের পূর্ব্বের নয় বরং পরের, এই কথা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা জোর ক'রেই বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পালি ভাষার ভিতরও অনেক মাগধী শব্দ রয়েছে। সেরূপ শব্দ হীনযানের অন্যান্য শাখার সংস্কৃতে লেখা শাস্ত্রেও পাওয়া গেছে। হীনযানের নানা শাখার ত্রিপিটক তুলনা করলেও কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এ'তেই মনে হয় যে, অশোকের পূর্ব্বেই বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা সুরু হয়। সে রচনা হ'ত মাগধীতে বা তার মার্জ্জিত প্রতিরূপ অর্দ্ধ-মাগধীতে। আর নানা সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক তুলনা করলে যে সব সাধারণ বিষয়গুলির সন্ধান পাওয়া যায়—সেইগুলিও এই ভাষায় লেখা হ'ত—সেইগুলি ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন শাস্ত্র, তা'র আকার খুব বড় ছিল না, আর তাকে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম প্রভৃতি পিটক-ভাগে সাজাবার দরকার হয় নি। এই প্রাচীন শাস্ত্রের এক প্রধান বই হচ্ছে ধর্ম্মপদ। ধর্ম্মপদ পালি, সংস্কৃত ও ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাচীন প্রাকৃতে পাওয়া গেছে। এবং বিভিন্ন সংস্করণগুলি তুলনা করলেই এ'র প্রাচীন অর্দ্ধ-মাগধীরূপ ধরা পড়ে।

অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের নানাস্থানে প্রসার লাভ করল। তার তখন প্রধান কেন্দ্র হ'ল, মথুরা, উজ্জয়িনী ও কাশ্মীর। পরে কাঞ্চী উজ্জয়িনীর স্থান নিয়েছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন অর্দ্ধমাগধী শাস্ত্র

মথুবা ও কাশ্মীরে সংস্কৃত ও উজ্জয়িনীতে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় অনূদিত বা রূপান্তবিত হ'ল। সেই কাবণেই এ সব অনুবাদেব ভিতব এখনও অর্দ্ধমাগধী শব্দেব সন্ধান মেলে। সঙ্ঘনায়কেবা শুধু প্রাচীন শাস্ত্র অনুবাদ কবেই ক্ষান্ত হ'লেন না—প্রাচীন শাস্ত্রেব কাঠামো ও নিজেদেব সাম্প্রদায়িক মত নিয়ে শাস্ত্রেব কলেবব বৃদ্ধি ক'বে চল্‌লেন। তাই বৌদ্ধশাস্ত্র ক্রমশঃ বিপুল আকাব নিল। তা'কে পিটকভাগে সাজাবাব দবকাব হ'ল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে আবন্ত ক'রে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত ভাবতীয় বৌদ্ধ আচার্য্যেবা দলে দলে চীন দেশে গিয়ে চীনা পণ্ডিতদেব সহায়তায় নানা সম্প্রদায়েব শাস্ত্রকে ক্রমশঃ চীনাভাষায় অনুবাদ কবেন। এই সব ভাবতীয় পণ্ডিতদেব সাহায্যেই সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকেব মধ্যে এবং দ্বাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকেব মধ্যে তিব্বতী ও মাঙ্গোলীয় ভাষায়ও অনূদিত হ'ল। তাই হীনযান বৌদ্ধশাস্ত্রেব সম্পূর্ণ পবিচয় পেতে হ'লে এই সব দিক্‌টা না দেখ্‌লে চলে না। তা'ব প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কিছু বল্‌তে গেলে তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া গতি নেই।

হীনযান শাস্ত্র ত্রিপিটকে বিভক্ত হ'লেও মহাযান শাস্ত্রেব তা' হ'বাব কথা নয়। কাবণ পূর্ব্বেই ব'লেছি যে মহাযান যাঁবা অবলম্বন কবলেন তাঁরা হীনযানেব বিনয়-পিটকই মেনে নিলেন। কিন্তু তা' হ'লেও বোধিসত্বচর্য্যাব জন্য যে সব আচাব-ব্যবহাব শাস্ত্রীয় বলে ধবা হ'ল তা' সাধাবণ ভিক্ষুব পালনীয় আচাবেব থেকে কিছু অন্যরূপ। বোধিসত্বমার্গ যাঁবা অবলম্বন কবলেন তাঁদেব বাইবেব আচাবেব কতকগুলি খুঁটিনাটি না মানলেও চল্‌ত—কাবণ তাঁদেব কাছে অন্তর্দৃষ্টিবই ছিল বেশী মূল্য। এ-সব কাবণেই কালক্রমে মহাযান শাস্ত্রেও এক নূতন বিনয় পিটকেব সৃষ্টি হ'ল। মহাযানেব প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কতকগুলি সূত্র নিযে গঠিত। তা'ব ভিতর সব চেয়ে প্রধান হ'ল প্রজ্ঞাপাবমিতা সূত্র। প্রজ্ঞা হ'ল মৈত্রী, করুণা প্রভৃতিব মতই এক পাবমিতা। বোধিসত্বমার্গে উন্নীত হ'তে হ'লে 'প্রজ্ঞা'ব চর্চ্চা ছিল খুব দবকাবী—কাবণ, তা' বাদ দিলে বোধিজ্ঞান লাভ কবা অসম্ভব। প্রজ্ঞাপাবমিতাসূত্র লেখা হ'য়েছিল সংস্কৃতে—তাব পব নানাভাষায় তাব অনুবাদও কবা হ'য়েছিল। প্রজ্ঞাপাবমিতা রচনাব কাল এখনও সঠিক নির্দ্দেশ কবা যায়নি। তবে মনে হয যে, কনিষ্কেব সময় বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকেব পূর্ব্বেই এই সূত্র বচিত হ'য়েছিল। অবশ্য পবে এব কলেবব বেড়ে উঠেছিল। এই প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র অবলম্বন ক'রেই পাবমিতাযান সৃষ্টি হলো ও খৃষ্টীয় প্রথম শতক কিংবা তা'ব কিছু পূর্ব্বে নাগার্জ্জুন তাঁর মাধ্যমিক এবং এব কিছু পবেই মৈত্রেয়নাথ, অসঙ্গ ও বসুবন্ধু যোগাচাব দর্শনেব ভিত্তি স্থাপন কবলেন। এই সব আচার্য্যদেব

লেখা কিন্তু পিটকে স্থান পেল না। প্রজ্ঞাপাবমিতাকে বুদ্ধেব মুখ দিয়ে শোনান হ'য়েছে—কিন্তু নাগার্জ্জুন প্রমুখ আচার্য্যদেব লেখা শাস্ত্র ত' আব বুদ্ধির বাণী নয়। তাই তাদেব লেখাগুলিকে "শাস্ত্র" সংজ্ঞা দিয়ে পৃথক ক'বে বাখা হ'ল,—যদিও সূত্রগ্রন্থেব চেয়ে সে সব শাস্ত্র আদব কিছু কম পেল না। এই শাস্ত্রগুলিই হ'ল মহাযানেব অভিধর্ম্ম। মহাযানেব প্রথম সূত্রপাত হয খুব সম্ভব অমবাবতীতে। নাগার্জ্জুন তাঁব শাস্ত্র অমবাবতী কিম্বা তাব অদূবে ধান্যকটকেব মহাবিহাবে বসে লেখেন। কিন্তু কনিষ্কেব সময গান্ধাবও মহাযানেব একটা বড় কেন্দ্র হ'যে ওঠে। শোনা যায মহাযানেব সব চেয়ে বড় কবি অশ্বঘোষ তাঁব অনেক বই গান্ধাবে বসেই লিখেছিলেন। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুও গান্ধাবেব লোক। নাগার্জ্জুনেব সব চেযে বড বই হ'ল প্রজ্ঞাপাবমিতাসূত্রেব টীকা। এই টীকাব ভিতব দিয়েই তিনি তাঁব নূতন দর্শনেব প্রতিষ্ঠা ক'বে যান। আব যোগাচাবেব উপব অসদি ও বসুবন্ধুব সব চেয়ে বড বই হ'ল—সূত্রালঙ্কাব এবং মহাযান বিংশতিকা ও ত্রিংশতিকা। নাগার্জ্জুনেব বইযেব মূল পাওয়া যায় নি—তা' চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে পড়া ছাড়া উপায নেই। কিন্তু অসঙ্গ ও বসুবন্ধুব বইগুলিব সংস্কৃত মূল নেপালে পাওযা গেছে। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু তাঁদেব বই খৃষ্টীয চতুর্থ শতকে লিখেছিলেন মনে হয়।

এই দুই দর্শনেব পুঁথিপত্র ছাডা মহাযান শাস্ত্রেব মধ্যে কতকগুলি সবস কাব্যেব সন্ধান পাওযা যায়—সেগুলি হচ্ছে ললিতবিস্তব এবং অশ্বঘোষেব বুদ্ধচবিত। এ ছাড়া অশ্বঘোষেব কতকগুলি ছোট ছোট বইযেবও সন্ধান মেলে। শান্তিদেবেব বোধিচর্য্যাবতাবকে কাব্যের হিসাবেই ধবা যেতে পাবে। ললিতবিস্তব কা'ব লেখা তা' বলা যায় না কিন্তু সে বই যে কাব্য তা'তে সন্দেহ নেই। সে কাব্য আবও ফুটে উঠেছে অশ্বঘোষেব "বুদ্ধচবিতে"। অশ্বঘোষ নিজে বুদ্ধচবিতকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছেন—সেটা যে মহাকাব্য তা' সে বই যাঁবা পড়েছেন তাঁবা অস্বীকাব কবেন না। মহাকবি কালিদাসেব কাব্যেব উপব যে তাব ছায়াপাত হয়েছে তা' পণ্ডিতেবা জোব গলায় বলেছেন। 'বুদ্ধচবিতে'ব ভাষা সবস, ছন্দেব ভিতব প্রাণ আছে, উপমাব ভিতব বৈচিত্র্য আছে। আব সংস্কৃত অলঙ্কাব-শাস্ত্রে মহাকাব্যেব যে যে গুণ নির্দ্দেশ কবেছেন তা' সবই বুদ্ধচরিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষ কবিগুরু বাল্মীকিব নাম কবেছেন। সুতবাং বামাযণেব সঙ্গে তাঁব পবিচয় ছিল ও তা'ব থেকেই তিনি প্রেবণা পেযেছিলেন, তা' মনে করা অসঙ্গত হ'বে না। অশ্বঘোষেব লেখা শাবিপুত্র প্রকবণ হচ্ছে নাটক। এ নাটকেব কতকগুলি খণ্ডিত অংশমাত্র জর্ম্মাণ পণ্ডিতেবা মধ্য এসিযায কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁদেব যত্নেই এই নাটকেব কিছু পবিচয পাওযা

গেছে। এ নাটক বুদ্ধদেবেব জীবনী নিয়েই বচিত হ'য়েছিল। ভাসেব নাটকেব কথা বাদ দিলে এব চেযে প্রাচীন নাটক আব পাওয়া যায নি। এ ছাড়া কতকগুলি বৌদ্ধস্তোত্র, যেমন সর্ব্বজ্ঞমিত্রেব স্রগ্ধবাস্তোত্র, বজ্রদত্তেব লোকেশ্ববশতক, বা বাজা হর্ষদেবেব সুপ্রভাতস্তোত্র—তাদেব ভিতবও যে কাব্য বয়েছে তা' নেহাৎ খেলো নয়। স্রগ্ধবাস্তোত্র থেকে একটা নমুনা দিলেই এ-সব স্তোত্রেব ভিতব যে কাব্যবস বযেছে তা'ব পবিচয় পাওযা যাবে। যে-সব দেবকন্যাবা মহাযানেব দেবতাকে ববণ কবতে ছুটেছিলেন কবি তাঁদেবই ছবি আঁকছেন—

> হাবাক্রান্তস্তনান্তাঃ শ্রবণকুবলয়স্পর্দ্ধমানাযতাক্ষ্যো
> মন্দাবোদাববেণী তরুণ পবিমলামোদমাদ্যদ্ দ্বিবেফাঃ।
> কাঞ্চী নাদানুবন্ধোদ্ধততব চবণোদাবমঞ্জীব তূর্য্যা—
> স্বন্নাথান্ প্রার্থযন্তে স্মবমদমুদিতাঃ সাদবা দেবকন্যাঃ।

"দেবকন্যাবা তোমাকে স্বামীরূপে সাদবে আকাঙ্ক্ষা কবছেন। মন্মথেব পীড়াজনিত হর্ষে তাঁবা চঞ্চল হ'যে উঠেছেন। গলাব হাব এসে বক্ষেব উপবে পড়েছে; তাঁদেব আযতলোচন শ্রবণকুবলয়কে হা'ব মানিয়েছে। তাঁদেব বেণীতে যে মন্দাব ফুল রযেছে তা'ব গন্ধে ভ্রমব আকুল হ'যে উঠেছে। আব তা'দেব পায়েব নূপুবধ্বনি দোদুল্যমান কাঞ্চিব শব্দকে ডুবিযে দিয়েছে।"

এই কাব্যবসই আবাব অন্য দিকে ভাস্কব ও চিত্রকবেব হাতে মূর্ত্ত হ'যে উঠেছে। খৃষ্টীয পঞ্চম-ষষ্ঠ-শতকেব বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য দেখুন—অজন্তাব চিত্রকলা দেখুন—এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবকন্যাদেব খোঁজ সহজেই মিলবে। কিন্তু অজন্তাব চিত্রকব কোথা থেকে তা'ব প্রেবণা পেযেছিল তা' স্পষ্ট বুঝ্‌তে গেলে পড়তে হ'বে শান্তিদেবেব বোধিচর্য্যাবতাব। শান্তিদেব ছিলেন বলভীব লোক—আব তিনি তাঁব বই লিখেছিলেন ষষ্ঠ শতকে। সুতবাং অজন্তাব চিত্রকবেবা তাঁব কাব্য থেকে অনুপ্রেবণা পেয়েছিল তা' মনে কবা অসঙ্গত হ'বে না।

এইবাব মহাযানেব শেষযুগেব শাস্ত্র-সম্বন্ধে দু'-এক কথা ব'লেই বৌদ্ধ সাহিত্যেব পবিচয শেষ কবব। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এই যুগেব একদল বৌদ্ধ আচার্য্যেবা বল্‌তে সুরু কবলেন যে বোধিচর্য্যা মন্ত্রবলেই হ'তে পাবে। এঁবা সপ্তম অষ্টম শতকেই বেশ প্রভাবসম্পন্ন হ'য়ে উঠ্‌লেন ও নূতন নূতন শাস্ত্র বচনা কবতে লাগ্‌লেন। অবশ্য এঁদেব দর্শনেব মূল যে যোগাচাবেব মধ্যেই বযেছে তা'তে সন্দেহ নেই। এঁবা যে-সব সম্প্রদায়েব সৃষ্টি কবলেন তা'দেব শাস্ত্র নিযে বেশী আলোচনা হযনি। তা' রযেছে বেশীব ভাগ নেপালী পুঁথিতে আব তিব্বতী অনুবাদে। বজ্রযান

ও কালচক্রযানেব শাস্ত্র সংস্কৃতে আব সহজযানের শাস্ত্র অপভ্রংশে লেখা হ'ল। এই অপভ্রংশ শাস্ত্রেব বচয়িতাবা হ'লেন সিদ্ধপুরুষ। তাঁদেব ভিতব সবহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নুপাদ ও তিল্লোপাদেব লেখা বেশী পাওয়া গেছে। এঁদেব ভাষা ও প্রাচীন বাংলা ভাষাব ভিতব বড় পার্থক্য নেই—তা'ই এদেব লেখা বইগুলি বাংলা ভাষাব আলোচনাব জন্য খুব মূল্যবান। প্রাচীন ছন্দে এঁবা যে সব নূতন সুব সংযোগ কবলেন তা'বই প্রভাবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠ্‌ল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কবীব প্রভৃতিব ভিতব এই প্রাচীন সহজসিদ্ধদের লেখাব ভাব ও রূপ আর-ও পবিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল।

তিল্লোপাদ যখন সমাধিস্থ হ'বাব জন্য নিজেব মনকে আদেশ কবছেন—

জহি ইচ্ছই তহি জাউ মণ এথ্‌ু ণ কিজ্জই ভত্তি।
অধ উন্মাড়িয় আলোঅণে জ্‌ঝানে হোইবে থিত্তি॥

["মন, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। তোমাব আব এখানে স্থান নেই। আমি অধ্যাত্মকে উদ্ঘাটন কবে, এখন ধ্যানে স্থিত হ'ব ও ধ্যানদৃষ্টি লাভ কবব।"]

অথবা সবহপাদ যখন সহজ সিদ্ধিব প্রাধান্য প্রতিপন্ন কববাব জন্য বল্‌ছেন—

এথ্‌ুসে সুবসবি জমুণা এথ্‌ুসে গঙ্গাসাঅরু
এথ্‌ু পআগ বণাবসি এথ্‌ুসে চন্দ দিবাঅরু।

[এই সে সুবসরিৎ মন্দাকিনী, এই সে যমুনা, আর এই সে গঙ্গাসাগব। প্রয়াগ বাবাণসী, বা চন্দ্র দিবাকব ও এই।]

তখন তাঁদেব ভাবেব ভিতব যে ঐশ্বর্য্যেব ও ভাষা আব ছন্দেব ভিতব যে শক্তিব খোঁজ পাই তা' ভাবতেব মধ্যযুগেব সাহিত্যে বিবল। অশ্বঘোষ বুদ্ধেব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন—

প্রজ্ঞাম্বুবেগাং স্থিবশীলবপ্রাং সমাধিশীতাং ব্রতচক্রবাকাং।
অস্যোত্তমাং ধর্ম্মনদীং প্রবৃত্তাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ।

[তৃষিত জীবলোক এই উত্তমা ধর্ম্মনদীর জল পান ক'রে তৃষ্ণা নিবাবণ কববে। প্রজ্ঞাস্রোতে এ নদী বেগবতী, স্থিব বিনয়ব্যবহাবই এ নদীব তটকে দৃঢ় ও সমাধি এ'ব জলকে শীতল কবেছে, আব এই উত্তমা নদীব জলে ব্রতচাবী চক্রবাকেবা ক্রীড়া কবছে।]

বৌদ্ধধর্ম্মেব দর্শন, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা বহুকাল ধ'বে যে আমাদেব তৃষ্ণা মেটাবে তা'তে আব সন্দেহ কি? সে বত্নকে শুধু উপযুক্ত আদবে ঘবে তুলে নিতে জানা চাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

কাব্যের মুক্তি

কাব্য অনাদি। অনাদি-শব্দটা যদি আমাদেব বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে পীড়া দেয়, তাহ'লে বলা যেতে পাবে যে আদিম মানুষ যবে বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিকে বিভিন্ন বস্তু ও আবেগেব সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধতে পাবলে, সেই দিনই কাব্যেব জন্মদিন। সে আজ অনেক হাজাব বছব আগেব কথা। তাব পবে মানুষেব ভাষা ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগলো, এবং মানুষ দেখলে যে, সেই বাক্যগুলোই অনায়াসে মনে থাকে, যেগুলোব মধ্যে যতির ব্যতিক্রম ঘটে না। এই সূচনা থেকে কাব্যেব পববর্ত্তী বিকাশ কল্পনা ক'বে নেওয়া সহজ। আস্তে আস্তে এখানে ওখানে দু-একজন এমন লোক নিশ্চযই দেখা দিতে লাগলো, যাদেব উদ্ভাবনাশক্তি অন্যদেব তুলনায ক্ষিপ্র, যাঁদেব স্মৃতি সাধাবণেব চেয়ে সবল, যাবা সমবেত সঙ্ঘেব নীবব অনুমোদনে ও বিবল সহযোগে শুভদিনে স্মবণীয় ঘটনাগুলো আবৃত্তি কবতে সক্ষম। অল্পে অল্পে যখন সঙ্ঘ জাতিতে পবিণত হলো, এবং দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলোকে মানুষ বৃত্তিতে ভাগ ক'বে নিলে, তখন এই গাথাপবিচালকেব অনির্দ্দিষ্ট স্থান এলো চাবণেব দখলে। আধুনিক কবি সেই চাবণেব উত্তবাধিকাবী।

কাব্যেব জন্মবৃত্তান্তে আমাদেব প্রয়োজন নেই। এ-সন্ধান নৃতত্ত্ব-বিদেব। আমবা শুধু এইটুকু জানলেই সন্তুষ্ট যে কাব্য কবিব পূর্ব্বপুরুষ, কবি কাব্যেব জন্মদাতা নয। প্রথম কবিতাব আবির্ভাব হযেছিলো কোনো ব্যক্তি-বিশেষেব মনে নয়, একটা মানবসমষ্টিব মনে; প্রথম কবিতাব প্রস্রাব শুধু একটি মানুষেব উপবে নয়, সমগ্র জীবনেব উপবে, প্রাথমিক কবিতাব উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ নয়, সঙ্কলন। সেই দিন থেকে আবম্ভ ক'বে আজ পর্য্যন্ত কাব্যেব সেই বিশ্বস্তব-মূর্ত্তি কেবল ক্ষযে গেছে। তাব সেই নীহাবিকাব মতো আযতন সৃষ্টিব বীতিতে আজকে কবিরূপ উল্কাখণ্ডেব মধ্যে আবদ্ধ। ফলে অনেকে জিজ্ঞাসা কবতে সুরু কবেছেন, কাব্যেব বিকাশধাবার কি তবে এইখানেই শেষ। আমাব তাই বিশ্বাস। আমি মনে কবি, এই ধবণেব একটা পর্য্যাযে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে; এব পবেও আবাব যদি কাব্যেব মধ্যে একটা তীব্র জ্যোতি দেখা যায, তবে বুঝতে হবে সে-জ্যোতি পথচ্যুত উল্কাব চিতাগ্নি মাত্র।

উপবে যা বললুম, তাব থেকে কেউ যেন না-ভাবেন যে এই অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনেব জন্যে আমি আধুনিক কবিকে দোষী কবি। সে তো দূবেব কথা, আমাব মনে হয়, সাহিত্যেব ইতিহাসে কবি আব কখনো এত পূজার্হরূপে দেখা দেয়নি। এতদিন ধবে স্থানে-অস্থানে সে তীক্ষ্ণ স্ববে যে-অতিমানবতাব ঘোষণা ক'বে এসেছে, এইবাবে হয়তো তাব প্রথম

প্রমাণ মিললো। চিরকালের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলোকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে, সভ্যতার ষ্টীমরোলার আজকে যে-জয়যাত্রায় বেরিয়েছে, তার সাংঘাতিক সংঘাতকে উপেক্ষা ক'রে একা কবি আছে সৌন্দর্য্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই, সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত, সে জানে সে একা, সে জানে যাদের জন্যে তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্দ্ধা পাগলামিরই নামান্তর মাত্র। সে বুঝেছে যে তার পরিচিত বিশ্বকে এক দৈব ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না, কিন্তু তবু তার চেষ্টায় ক্রটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে-গান হয়তো আনন্দের গান নয়, তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ক্ষোভে কর্কশ, কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের কোলাহলকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পেরেছে একা তারি বাণী; তাই সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হ'লেও সে আমাদের নমস্য।

অনেকে বলবেন, আমি একটু বাড়াবাড়ি করছি। কাব্য যদি আসলে আর্ট হয়, তাহ'লে বেষ্টনীর বৈরিতায় সে ক্ষুণ্ণ হবে না। এ-মতকে একেবারে উপেক্ষা করা অসম্ভব, কেননা মানুষের এবং তার পরিবেষ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারে বলেই জীবনে আর্ট অত অবর্জ্জনীয়। অতএব, যদিও সামাজিক অবস্থা অনুকূল না-হ'লে আর্টের আরম্ভ হয় না, তবু পরিণামে প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে উঠতে না-পারলে আর্ট ব্যর্থ হ'য়ে যায়। কথাগুলো যে নিতান্ত বাজে নয় তার প্রমাণ-স্বরূপ আধুনিক চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত মনে আসে। ললিত-কলার অন্যান্য বিভাগে যা-ই ঘটে থাকুক, আজকের চিত্রে এবং আজকের সঙ্গীতে বর্ত্তমান সভ্যতার বিকট বিভীষিকাগুলোও যে রূপের আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হয়নি, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই।

এইখানে একটা কথা স্পষ্ট করতে চাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে 'art for art's sake'-নামে যে-মতবাদ নিয়ে দিন-কতক খুব সোরগোল উঠেছিলো, তার সঙ্গে উপরের অভিমতটির কোনোই সংস্রব নেই; ওটি বরং Wilde ও তার বিদগ্ধ বন্ধুদের অমূলক দম্ভের প্রতিবাদ। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের আর যা-ই লোকসান হ'য়ে থাকুক, অভিজ্ঞতার মূলধন সুদে বেড়েছে। অজস্র সঙ্ঘর্ষের ফলে আমরা আজ শিখেছি যে, সত্য স্বাতন্ত্র্য সংসারে মেলা তো দূরের কথা, ব্রহ্মাণ্ডের নিভৃততম কোণে সুদ্ধ তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। এবং যেহেতু আর্ট সৃষ্টিছাড়া নয়, সৃষ্টির অঙ্গ মাত্র, তাই আর্টিষ্টের উৎকর্ষ মাপবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সাময়িক জীবনের কষ্টিপাথরে তার যোগ্যতা কষে দেখা। এ-কথা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, কবি মাত্রেই কালের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে, এর থেকে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, জগতের আকর্ষণকে যে-

কবিতা এডিয়ে চলেছে তাতে শিকডেব অভাব ; সে-কবিতা মামিব মতো পিবামিডেব আওতায হযতো বা মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পাবে, কিন্তু তা দিয়ে মানুষেব কৌতূহলই কেবল মেটে, আত্মাব অব্যক্ত জিজ্ঞাসা তাব কাছে কোনো সদুত্তব পায় না।

এই মাপকাটি দিয়ে পরখ কবলে সাহিত্যেব অনেক সমস্যা সরল হ'যে আসে। মহাকবিব সমস্ত গুণ সমন্বয় ক'বেও Tennyson কেন মহাকাব্য রচনায ব্যর্থকাম হযেছিলেন, তাব ব্যাখ্যা হযতো এইখানে। কবিব কাজ হচ্ছে তাব প্রতিদিনেব বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাগুলোকে একটা পরম উপলব্ধিতে গ্রথিত ক'বে নেওয়া, কবিব কাজ হচ্ছে তার চাবপাশেব খণ্ড খণ্ড জীবনগুলোকে একত্র ক'বে আবহমান জীবনেব সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, কবিব কাজ হচ্ছে তাব যুগেব স্বকীয় চৈতন্যকে শুদ্ধ-চৈতন্যেব অন্তর্গত কবা। বৈবাগ্যসাধনেব দ্বাবায এই মহাব্রতে সিদ্ধি মিলে না, কাব্যেব মুক্তি পবিগ্রহণে। কবিকে যদি মহাকালেব পদ নিতে হয, তাহ'লে তাকে শুচিবায়ু ছাড়তে হবে, তাহ'লে তাকে ভিক্ষাব পাত্রখানি হাতে নিয়ে, ধনী-দবিদ্র নির্ব্বিচাবে, দুয়াবে দুযাবে ফিবতে হবে উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট আহবণ ক'বে। কাব্যেব পথে উল্লঙ্ঘন চলে না, তাব প্রত্যেক খানাটি পাব হ'তে হয হেঁটে, তাব প্রত্যেক ধূলি-কণাকে চলতে হয মাডিয়ে, তাব প্রত্যেক কাঁটাব পিপাসা নিবাবণ কবতে হয বক্ত দিয়ে। এখানে পলায়নেব উপায় নেই, বিবতি চাওয়া মানেই মৃত্যুকে ডেকে আনা, এখানে বিমুখ হ'লে অনুগামীব পদাঘাত অনিবার্য্য। এ-কথা মানতে যাঁবা কুণ্ঠিত হবেন, তাঁবা যেন উনবিংশ শতকেব শেষে কাব্যেব দুর্দ্দশাব ইতিহাস স্মবণ ক'বে দেখেন। Cezanne যখন চূণকাম-কবা খানিকটা সাদা প্রাচীবেব মধ্যে সনাতন সৌন্দর্য্যকে প্রত্যক্ষ কবছিলেন, তখন কুঞ্জে কুঞ্জে বাষ্পাকুল চোখে Swinburne ফিরছিলেন বনলক্ষ্মীদেব সন্ধানে, অতিমর্ত্ত্য বা আধিজৈবিক আর্টেব অন্তম বিক্ততাব অকাট্য সাক্ষ্য এইখানেই।

Tennyson ও Swinburne-এব বিবাট কাববাবেব দবজায় হঠাৎ লালবাতি জ্বলাব ফলেই বোধ হয় সেদিনকাব কবিমহলে হিসেব দেখাব অত ধুম পড়ে গিযেছিলো। তখন তাদেব বুঝতে বেশী কষ্ট লাগেনি যে বনেদি চাল বজায বাখাব ব্যর্থ চেষ্টাতেই অভিমানী কাব্য দেউলে হযেছে। হিসেবনবিশেবা অনায়াসেই প্রমাণ কবেছিলো যে, সাবা উনবিংশ শতাব্দীতে এক গোডাব দিকেব তিন-চাবজনকে বাদ দিলে, সকলে কেবল খবচই কবে গেছে, মুহূর্ত্তেব জন্যেও জমার কথা ভাবেনি ; কাব্রু খেয়াল হযনি যে, বিষয় যত বডই হোক, বংশবৃদ্ধি ও কালক্ষযেব সঙ্গে সঙ্গে জমিদাবী বাড়ানোব ব্যবস্থা না-করলে, সোনাব খনিও অবশেষে গজভুক্ত কপিত্থেব

দশা পাবে। সেই জন্যেই বিংশ শতকের সুরুতেই দেখা গেলো যে পূর্ব্ব-পুরুষের অনন্ত শোষণের ফলে, কাব্যের কলেবর থেকে অর্থের ও আবেগের মজ্জাটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে, পড়ে আছে শুধু কঙ্কাল, প্রতিধ্বনিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে পড়ে আছে শুধু দীর্ণ জীর্ণ বৈশিষ্ট্যবিহীন কঙ্কাল।

What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief
And the dry stone no sound of water
Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From door of mudcracked houses
If there were water
And no rock
If there were rock
And also water
And water
A spring
A pool among the rock
If there were the sound of water only
Not the cicada
And dry grass singing
But sound of water over a rock
Where the hermit thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water

(T S Eliot)

উপরের পঙ্‌ক্তি কটা ঊনবিংশ শতাব্দীর যথাযথ বর্ণনা, এ-কথা অনেকেই মানতে চাইবেন না। Browning-এর নাম নিয়ে, জানি, তাঁরা বলবেন—অন্তত এই কবি উদ্ধৃত বিবরণের মধ্যে খাপ খায় না। গত শতাব্দীর কাব্যমরুতে Browning শুধু রোমন্থন করেননি, সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, তা সহস্রবার স্বীকার্য্য। Wordsworth এবং Coleridge ছাড়া একমাত্র Browning-ই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কাব্যকে বাঁচতে হ'লে, ধ্বংসাবশিষ্ট পৈতৃক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্তুরের স্বপ্ন দেখা তার চলবে না, তাকে বেরিয়ে আসতে হবে; পোকায়-খাওয়া শিরোপা, মরচে-পড়া সাঁজোয়া, বজ্রসার জয়মাল্য ফেলে দিয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, যেখানে পাপপুণ্য, ভালো-

মন্দ, দেবদানব জীবনকে সম্ভব কবে তুলেছে। তাঁব সমসাময়িকদেব মধ্যে শুধু Browning-ই অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, নটবাজেব নৃত্যেব তাল সব সময়ে শ্রবণসুভগ নয়, সৃষ্টিব সুবে আসন্ন-প্রসবাব আর্ত্তনাদও মাঝে মাঝে স্থান পায়; শুধু তিনিই বুঝেছিলেন যে, সিদ্ধ-সমৃদ্ধদেব অসহযোগে জীবনেব মিছিলে হয়তো আডম্ববেব অভাব ঘটে, কিন্তু নিঃস্ব-লাঞ্ছিতদেব অপাঙ্‌ক্তেয় কবলে সে-শোভাযাত্রা পবিণত হয় শবযাত্রায়।

সেইজন্যেই Browning সর্ব্ব প্রথমে কাব্যকে যুগৰূপেব ছাঁচে গডতে চেষ্টা কবেছিলেন, কিন্তু কেবল চেষ্টাই করেছিলেন, সফল হননি। যদি এই মহৎ বৈফল্যেব কাবণ খোঁজা যায়, তাহ'লে Browning-এব কাব্যেব দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হবে, প্রথমত দুটো-একটা বিবল দৃষ্টান্ত ছাডা Browning-এব সকল নায়ক-নায়িকাকেই জগতে আসাব জন্যে বৈতবণীতে খেঁয়া দিতে হয়েছিলো; দ্বিতীয়ত তিনি যত পতিতেব তবফে ওকালতি কবেছেন, তাদেব সকলেবই পদস্খলন ঘটেছিলো অনিচ্ছায়, দৈবদুর্ব্বিপাকে। এব প্রথমটা পবিগ্রহণ নয়, পলায়ন, এবং দ্বিতীয়টা অন্তর্দৃষ্টি নয়, অভিনয়, সেই ধবণেব অহঙ্কৃত অভিনয়, যাব সাহায্যে ধর্ম্মধ্বজ উকিল অপবাধীব পক্ষ নিয়ে কাজির উপবে ভোজবাজি প্রয়োগ কবে। কথাগুলো যদি রূঢ় লাগে, তবে বলা যেতে পাবে যে Browning খ্রীষ্টান, খ্রাইষ্ট নন, কাজেই তিনি প্রতিপন্ন কবতে চেয়েছিলেন যে, ভ্রষ্টেব দল ইহলোকে ধার্ম্মিকেব পাশে না বসতে পাবলেও, পবলোকে করুণাময়েব কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত হবে না; জীবনেব ভগ্ন বৃত্ত পবিপূর্ণ হবে মবণে, এবং ইতিমধ্যে অভ্যস্ত জগতেব অনন্ত তীর্থযাত্রা কোথাও বাধা পাবে না, ববং তাব নিরুদ্বিগ্ন পুবঃসবণে ব্রহ্মাণ্ডেব সর্ব্বাঙ্গীন কুশল স্পষ্ট হ'যে অবিশ্বাসীব অলস প্রশ্ন-গুলোকে দেবে নীবব ক'বে। এই দুর্দ্দান্ত শুভবাদেব পায়ে যাঁরা মাথা নোয়াতে পাবেন তাঁদেব কাছে আমাব শুধু এইটুকু নিবেদন যে, এই মঙ্গলময় জগতে রুচিবিকাব না থাকলে আমাবো স্থান হতো না। এই ধবণেব অত্যন্তীন মনোভাবেব চেয়ে এমন-কি ইন্দ্রিয়পবাযণ Yellow Book-এব অসুস্থ কলুষপ্রীতিও আমাব চোখে বেশী স্বাভাবিক।

এই শূন্যগর্ভ অতিবাদেব মাঝখানে বিংশ শতাব্দীর উন্মেষ হলো। ফলে প্রত্যেক সাত্বিক কবিই অনুভব কবলেন যে, এ-ফাঁকিব মধ্যে সত্যের শৃঙ্খলা আনতে হ'লে, ভদ্রাসনেব মাযা কবা চলবে না, সেই অন্তঃসাবশূন্য বস্তু-মাত্রাব আমূল উচ্ছেদ চাই। শুধু ইমাবৎ গডায় কোনোই সার্থকতা নেই, সে ইমাবৎকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী কবতে হবে; আকাশেব আলো তাব ভিজে দেওয়ালে বাধা পাবে না, বিশ্বের বাতাস ফিবে যাবে না কেবল তার অর্গলিত দ্বাবেব শিকল নেড়ে। এব জন্যে একটা নগণ্য বাহ্য

সৌন্দর্য্যের দিকে নজর রেখে ইটের পর ইট সাজিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, এর ভিতরে যারা বাস করবে তাদের ভুললে চলবে না, ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্তে-মাংসে-গড়া দুঃখ-আনন্দের দাস, পরিবর্ত্তনশীল, বর্দ্ধিষ্ণু। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্যকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে তাই স্বীকার, তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় আখ্যা-গুলো কুড়ুতে হয়, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, দ্বিতীয় দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, তৃতীয় দফায় দরকার অকৃত্রিমতা, শেষের দফায় দরকার অকৃত্রিমতা। বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্রই হচ্ছে অকৃত্রিমতা—integrity।

অকৃত্রিম-বিশেষণটাকে আজ আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখি। তার কারণ, ওই মহাবাক্যের আড়াল থেকে এ-জগতে যত প্রবঞ্চনার আমদানি হয়েছে, অন্য কোথাও থেকে তার সিকির সিকিও হয়নি। কিন্তু তাহ'লেও আজকের দিনে ও-শব্দটি একেবারেই অপরিহার্য্য। সাহিত্যে অকৃত্রিমতার মানে, প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার পরিণয়। এই কথাটাকেই আরো সহজ ক'রে বলা যেতে পারে যে, কবি যখন কোনো দৃষ্ট বস্তু বা অনুভূত ভাবের বর্ণনা করবে, তখন তার কবিতা শুধু সেই বস্তু বা সেই মনোভাবের আধারেই আবদ্ধ থাকবে, লোকাচার হিসেবে তাদের দাম জানতে চাইবে না।

এইখানে অনেকে, হয়তো, আপত্তি তুলবেন যে, কবি যদি লোকা-চারকেই বাদ দিলে, তবে জগৎকে কোলে নেওয়ার গর্ব্ব সে রাখে কি করে? তার উত্তরে আমি বলবো, লোকাচার আর জগৎ সমার্থক নয়। ভারতের দণ্ডবিধিকে অস্বীকার ক'রেও যদি ভারতকে আপন বলে ভাবা চলে, তাহ'লে লোকাচারকে উপেক্ষা করলেই জগৎকে অবজ্ঞা করা হয় না। ভারতশাসক যেমন ভারতবর্ষের আসল সত্তার প্রতিনিধি নয়, তেমনি একটা সামান্য জনসংখ্যার ব্যবহারিক পক্ষপাতগুলো মহামানবের প্রতিকৃতি হ'তে পারে না। কবি যদি বলে, আমি মৃত্যুকে মানবো না, তবে জগতে তার স্থান নেই; কিন্তু নারীর সতীত্বে যদি তার আস্থা না থাকে, তাহ'লে জীবনকে তো সে প্রত্যাখ্যান করলেই না, বরং জীবনের অন্তরতম লোকে প্রবেশের পথ সহজ ক'রে দিলে। কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে মৃত্যুকে অবহেলা ক'রে সে জীবনের মূলতত্ত্বকে অপমান করছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সমাজে নিঃসার মানবদেহের অসঙ্গত গুরুত্বকে অস্বীকার ক'রে, সে দেখাচ্ছে, মানুষের অনুপাতে জীবন কত বিরাট।

কাব্যে অকপটতার এই ব্যাখ্যা যাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক বলে বোধ হবে, তাঁরা যেন ভুলে না-যান যে একটা আধ্যাত্মিক পটভূমিকা না-পেলে,

কবি তো কবি, খুব স্থূল অনুভূতিব মানুষেব পক্ষেও বাঁচা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। ব্রহ্মাণ্ডেব মূলে যদি আসলে কোনো মাঙ্গলিক নিয়ম না-ই থাকে তবুও কবিকে একটা এমন কাল্পনিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাব সঙ্গে মিলিযে দেখলে আমাদেব নিত্তনৈমিত্তিক নিবর্থ অভিজ্ঞতাগুলো ন্যাযেব সূত্রে গ্রথিত হ'যে উঠতে পাবে। চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, এবং নির্ণয, পাণ্ডিত্যশূন্য নির্ণয, এইদুটি দুর্লভ গুণেব সাহায্য-ব্যতিবেকে আমাদেব পাবিপার্শ্বিক নাস্তিব মধ্যে কোনো বকমেব শৃঙ্খলা আনা অসম্ভব। কিন্তু এ-কথা ভাবলে খুবই অন্যায হবে যে, ওই দুটি ধ্রুবতাবায কেবল কবিবই দবকাব, কেবল কবিবই দাবি চলে। অন্ধকাব যেখানে ঘনিযে ওঠে, সেখানেই ওই আলোকস্তম্ভেব প্রযোজন হয, নিরুদ্দিষ্ট চক্রচবণে যাব রুচি নেই, গন্তব্যে পৌঁছনোই যাব ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, সে-ই এই নিযামকদের স্মরণ কবে। তবে কবিব সম্মান এইটুকু, তাব সার্থকতা এইখানে যে, মানুষেব এই অনন্ত সন্ধিৎসা তাব কণ্ঠে ভাষা পায়। এবং এইখানেই তাব বৈশিষ্ট্যেব শেষ। সে যদি তাব স্বসম্বেদ্য অন্বেষণে আব এই সার্ব্বিক অন্বেষণে সমীকবণ কবতে না পাবে, তাহ'লে তার কাব্য শুধু গ্রন্থাগাবেব উচ্চতম শেলফেব স্বর্গেই অমবত্ব লাভ কববে। এই অর্থেই বোধ হয় Forster সকল মহৎ আর্টকে অনাত্ম বলেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব কোনোই মূল্য থাকেনা, সে-অভিজ্ঞতা যদি সময়রূপ চতুর্থ আয়তনেব সাহায্যে শাশ্বত অভিজ্ঞতাব সঙ্গে মিলতে না-পাবে। এব থেকে বোঝা যাবে, কবিব পক্ষে প্রত্যাখ্যান কেন অসম্ভব, কালসংজ্ঞা কেন অত্যাবশ্যক। কথাগুলো বোধ হয একটা উপমাব দ্বাবায় সুবোধ্য হবে।

কবি ঘটকেব মতো, পাত্র এবং পাত্রীব মিলন ঘটলেই তাব প্রযোজনীযতাব শেষ হয ; তাব পবে তাব নাম কাবো স্মবণে রইলো বা না-বইলো, সে একটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকব ব্যাপাব। কিন্তু এ-মিলনকে সিদ্ধ কবাব জন্যে অসাধাবণ বুদ্ধি-বিবেচনা চাই, এমন-কি খানিকটা স্বজ্ঞাও হয়তো ফেলা যায় না। শুধু জগতেব প্রত্যেক পাত্রপাত্রীব নাম মনে বাখাই তাব পক্ষে যথেষ্ট নয, সকলেব সঙ্গেই তাব একটা অনুকম্পন থাকা চাই, যাব ফলে সে দেখা-মাত্রই বলতে পাবে, কে কাব যোগ্য। এই কাজে তাব নিজেব জীবনেব সুখ-দুঃখেব স্থান নেই। এমন-কি কোনো বকমেব পক্ষপাত পোষণ কবাব অধিকাবেও সে বঞ্চিত। রুচিব মর্জ্জি মানতে গিয়ে, সে যদি কোনো কুরূপাকে পাব কবাব সুযোগটি হেলায় হাবায, তাহ'লে বুঝতে হবে ব্যবসা থেকে অবসব নেবাব দিন তাব ঘনিযে এসেছে। অপব পক্ষে ঘটকজীবনেব অভিজ্ঞতাগুলোকে গার্হস্থ্য-জীবনে চালানোব চেষ্টাও নিষ্ফল হ'তে বাধ্য ; তাকে নিজেকে নিবপেক্ষ

নিরালম্ব থাকতে হবে, অথচ তার পরিচালনায় যে পরিণয়গুলো ঘটবে সেগুলো যদি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না-হয়, তাহ'লে বিবাহ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের ধারণা বিকৃত হ'য়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এই রকমের কোনো-একটা আদর্শ সামনে রেখেই Eliot কবিকে catalytic agent-উপাধি দিয়েছেন।

আর্টে ব্যক্তিবাদ চলে না, এ-কথা শুনে হয়তো অনেকেই আঁৎকে উঠবেন। মুখে কিছু না বললেও, তাঁদের মন হাহতোস্মি ক'রে বলবে,—আজকের দিনে সভ্যতার যাঁতাকলে মানুষমাত্রেই ধূলো হ'যে পথে পথে উড়ে বেড়াচ্ছে; এক কবি ছিলো একটু পৃথক, এক কবি ছিলো মানুষের অন্তর্হিত বৈচিত্র্যের স্মৃতি জাগিয়ে দিতে। এবারে এসেছে তার পালা; মানুষ বনস্পতিকে ছাঁটাই-কলে ফেলে দিয়াশলাই করার একমাত্র অন্তরায় এইবারে বিলুপ্ত হলো। আসলে কিন্তু ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। মানুষ যখন বিশ্বমানবের মধ্যে নিজেকে বিলীন ক'রে দিতে পারে, তখনই তার পিঞ্জরিত ব্যক্তিস্বরূপ মুক্তি পায়, এ-সত্য আমরা ইতিহাসে বারবার দেখেছি। এখনো, এই ঐতিহ্যবিপ্লবের যুগেও বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, সেণ্ট ফ্রান্‌সিস্ অফ্ এসিসাই কেবল নাম মাত্র নন, শুধু নিরর্থ, নিষ্ক্রিয় নাম মাত্র নন। কেউ যেন না-ভাবেন যে, আমি কবির সামনে ধর্ম্মের আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে চাই। যে তিনজনকে উপরে স্মরণ করেছি, তাঁদের ধার্ম্মিক ব'লে স্মরণ করিনি, স্মরণ করেছি মহাপ্রাণ ব'লে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, মহাপ্রাণতা যেমন খণ্ড-প্রাণকে বিসর্জ্জন না-দিলে পাওয়া যায় না, তেমনি মহৎ কাব্যের আরম্ভ সেইখানে, যেখানে ব্যক্তিগত দুঃখসুখের শেষ। কিন্তু এ-কথার মানে নয় যে, কবিতে কবিতে প্রভেদ থাকবে না। মহাপ্রাণ হ'লেও বুদ্ধ আর ক্রাইষ্ট এক নন, মহাকবি হ'য়েও শেক্সপীয়র ও গয়টে বিভিন্ন। এই বাহ্য অসঙ্গতির মধ্যে একটা উপমার সাহায্যে হয়তো সামঞ্জস্য আনা যাবে।

কাব্য সমুদ্রের মতো এবং কবি নদী মাত্র। সে যদি ইচ্ছা করে, তাহ'লে পথের মাঝে মরুভূমিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে; কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে আত্মনিমজ্জন করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তবে একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত হ'তে সে বাধ্য। তার সঙ্গে অন্য নদীর সাদৃশ্য এই দিক্ নির্দ্ধারণে; কিন্তু গভীরতায়, বেগে, রাসায়নিক উপকরণে স্বকীয় সত্তাকে স্বতন্ত্র রাখবার সুযোগ ও অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। অপর পক্ষে, কাব্যসমুদ্রের কথা যদি ভেবে দেখা যায়, তাহ'লে বোঝা যাবে যে সেখানেও বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। তার কোনো উপকূল পর্ব্বতবহুল, কোনো স্থান বা পঙ্কিল; তার কোনো অংশ হয়তো তরঙ্গায়িত, কোথাও বা মসৃণতা

বিরাজমান। এমন কি তার আকারও চিরকালের জন্যে নির্দ্দিষ্ট নয়। তার তলে তলে মানবচৈতন্য নিত্যকাল ধরে বহ্ন্যুৎগার ক'রে চলেছে, ফলে তার সীমা কখনো যাচ্ছে বেড়ে আবার কখনো আসছে কমে। শুধু তাই নয়, তার আস্বাদনে সুদ্ধ অল্পবিস্তর তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা নির্ব্বিকার গুণ তার সর্ব্বত্রই পাওয়া চাই। যতদিন পর্য্যন্ত কাব্যের এই সনাতন লক্ষণটার নামকরণ না-হয়, ততদিন একে লাবণ্য বললে বোধ হয় ক্ষতি হবে না। কিন্তু এই লাবণ্য একা সমুদ্রেরই সম্পত্তি নয়, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই এটাকে বিবিধ মাত্রায় মিলে। কাব্যের সঙ্গে বিশ্বের যোগ এইখানে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উগ্র ব্যক্তিবাদের উত্তর রাগে যাঁদের মন এখনো মুগ্ধ, তাঁরা হয়তো আধুনিক কাব্যের অবচ্ছিন্নতাকে সহজে হজম করতে পারবেন না। কাব্যকে এই রকম স্বায়ত্তশাসনে অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি সম্ভবত এই আকার ধরবে যে তাহ'লে সাহিত্যে আর স্বরগ্রাম থাকবে না, শোনা যাবে শুধু একটা বীভৎস চীৎকার। এই তর্কের সাহায্যে আধুনিক কাব্যের তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই যদি তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তবে আমার জবাব দেওয়ার কিছুই নেই। এটা হলো রুচির খেয়াল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে আর যাই থাকুক, ব্যক্তিত্বের ছড়াছড়ি ছিলো না, এই সত্যটার সাক্ষিস্বরূপ বাল্যজীবনের অধ্যাপকীয় অনুশাসনগুলো স্মরণ করাই যথেষ্ট। পরবর্ত্তী কবিদের উপরে Wordsworth-এর প্রভাব প্রমাণ করার জন্যে পরীক্ষার্থীদের এখনো "উপযোগী পঙক্তি" উদ্ধৃত করে দিতে হয় কিনা জানি না, তবে আমাদের সময়ে হতো; এবং সেই দুর্লভ স্মরণ-শক্তির কণামাত্রও আজ অবশিষ্ট থাকলে সহজেই নমুনার সাহায্যে দেখাতে পারতুম, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিতা কতদূর বৈশিষ্ট্যবিহীন হ'য়ে পড়েছিলো। তখনকার কাব্যের দরজা কখনো বন্ধ হতো না, এবং দ্বারীরূপ কবির উপরে গৃহস্বামীরূপ পাঠকের শুধু এইটুকু আজ্ঞা ছিলো যে, প্রবেশপ্রার্থীর বসনে-ভূষণে যেন শ্লীলতার ব্যতিক্রম না-ঘটে। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে যে, অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতালক্ষ্মী প্রাকৃত পুষ্পাভরণ ছেড়ে, কতকগুলো মজবুৎ সোনার গহনার আমদানী করেছিলেন, যার নির্ব্বিশেষ আড়ম্বরের আড়ালে আপনার আসন্ন বার্দ্ধক্যকে না-ঢেকে, তিনি কোনো কবির অভিসারেই বেরুতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাব্যের ভাষাকে আর চলতি ভাষাকে এক ব'লে Wordsworth এই মণ্ডিত সর্ব্ববল্লভার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্র ধরেন। সেই জন্যেই তিনি আমাদের পূজ্য, সেই জন্যেই সাহিত্যের স্মৃতিস্তম্ভে তাঁর নাম অত গভীর অক্ষরে খোদা রয়েছে।

গদ্য-পদ্যকে এক করবার চেষ্টায় Wordsworth কৃতকার্য্য হননি; কারণ কথ্য ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন। এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত। গদ্যের কারবার বিজ্ঞানকে নিয়ে, কাব্যের অন্বেষণ প্রজ্ঞানকে। তাই গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে, কিন্তু কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে; গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি, কিন্তু কাব্য দাবি করে আমাদের নিষ্ঠা; রেখার পরে রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে-ছবিকে গড়ে তোলে, গোটাকয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের জাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে দেয় আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রত সিদ্ধ হয় প্রতীকের সাহায্যে। শব্দ-মাত্রেরই দুটো দিক্ আছে, একটা তার অর্থের দিক্, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক্। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিক্‌টার খাতিরে, গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণটার লোভে, কাব্যের শব্দ আবেগবাহী। এর থেকে বোঝা যাবে, কাব্য অভিজাত সহানুভূতিকে ছেড়ে, অন্ত্যজ দরদকে কেন কোল দিয়েছে; এর থেকে বোঝা যাবে অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত না হ'য়েও নীচের নমুনাগুলি কাব্যহিসেবে কেন স্মরণীয়, এতই স্মরণীয় যে আমার মতো অলসমনা লোকের পক্ষেও এগুলোকে মনে রাখা অসম্ভব হয়নি :

Immemorial elms
And murmur of innumerable bees
(TENNYSON)

পথে হলো দেরি, ঝরে গেলো চেরি,
দিন গেলো বৃথা, প্রিয়া;
তবুও তোমার ক্ষমাহাসি রহি
দেখা দিলো আজেলিয়া ॥
(রবীন্দ্রনাথ)

As cool as the wet leaves of the lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn
(EZRA POUND)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল। কৈ গো কৈ মেঘ উদয় হও;
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও, অঙ্গে হর্ষের উঠুক ধুম ॥
(সত্যেন্দ্রনাথ)

Among twenty snowy mountains
The only moving thing
Was the eye of the blackbird
(WALLACE STEVENS.)

একটু বিচাব কবলেই দেখা যাবে যে, এই পঙক্তিগুলোব ভাবানুষঙ্গ অভিধানেব সাহায্যে ব্যাখ্যা কবা দুষ্কব। এদেব অনির্ব্বচনীয়তাব মূলে শুধু শব্দার্থ নেই, আছে শব্দেব অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং ছন্দেব শোভনতা। এই গুণসমষ্টিব নাম রূপ। রূপেব প্রত্যেক অঙ্গটি অপবিহার্য্য। রূপ আব প্রসঙ্গেব পবিপূর্ণ সঙ্গমেই কাব্যেব জন্ম, তাই কাব্যকে ভাষান্তবিত কবা চলে না, তাই কাব্যেব ভাষা আব কথ্য ভাষা পৃথক হ'তে বাধ্য, তাই আধুনিক কাব্যে রূপেব এত প্রাধান্য। Wordsworth বলেছিলেন, কাব্যকে অকৃত্রিম করতে হ'লে, কবিকে বাগ্‌ডম্বব ছাড়তে হবে। কিন্তু আমবা দেখেছি যে, ভাষা রূপের উপকবণ মাত্র, তাই আজকেব কবি Wordsworth-এব পবামর্শে আব তুষ্ট থাকতে পাবে না, বলে, কাব্যকে নিষ্কলুষ কবতে হ'লে রূপেব রূপজীবী হওয়া চলবে না, রূপেব সঙ্গে প্রসঙ্গেব সম্বন্ধটা বৈধ হওয়া চাই।

আসলে ভাষাব সঙ্গত শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কাব্যেব পক্ষে অসম্ভব। যে-শব্দ কোনো ভাষাব অন্তর্গত নয়, যে-শব্দ কেবল নিবর্থ ধ্বনিব সাহায্যে আবেগ উদ্দীপন কবে, তার প্রযোগ কাব্যেব চেয়ে মন্ত্রেই প্রশস্ত। লেখক ও পাঠকেব মধ্যে অনুকম্পাব সেতু নির্ম্মাণ কবাই যদি কাব্যেব উদ্দেশ্য হয়, তবে কাব্যেব শব্দকে অভিধানেব কোনো-না-কোনো কোণে আশ্রয নিতেই হবে। এ-যুক্তিব দ্বাবা আমি কবিকে নতুন শব্দ তৈবি কবাব সনাতন অধিকাবে বঞ্চিত কবতে চাইছি না, শুধু এইটুকু বলছি যে, দুগ্ধপোষ্য শব্দেব অপেক্ষা প্রাপ্তবযস্ক শব্দই বেশী কর্ম্মঠ। তাই 'কেমিষ্ট্রী'ব তুলনায 'এলকেমী'ব ভাবানুষঙ্গ গভীবতব। কিন্তু মানুষেব কার্য্যকাবিতাব যেমন একটা সীমা আছে, তেমনি শব্দেব সক্রিয়তাও অমিত নয়। শব্দেব স্বভাব টাকাব মতো; ব্যবহাবে তাব ক্ষয হয, হস্তান্তবে তাতে কলঙ্ক জমে, বযস তাকে অচল ক'বে দেয এবং কালে সে স্থান পায জাদুঘবেব গ্লাসকেসে। কিন্তু মিউজিযমভুক্ত হওয়া বিলুপ্তিব নামান্তব নয়, অপ্রচলিত শব্দও অবস্থা-বিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রাব ব্যবহাবিক মূল্য যখন কমে আসে, তখন তাব আলঙ্কাবিক মর্য্যাদা বাড়ে। তেমনি রূপদক্ষেব হাতে প'ড়ে পুবানো শব্দও কাব্যের ভূষণ হ'য়ে দেখা দেয়। Doughty-ব লেখায Anglo-Saxon বাক্যগুলোই আমাব কথাব সাক্ষী। সম্ভ্রান্ত শব্দসম্বন্ধে যে-কথা খাটে, অপভাষাব পক্ষেও তা মিথ্যা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গেব খাতিবে, আধুনিক কবি সাধু অসাধু, নবীন প্রবীণ, দেশী বিদেশী সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষাব বিষয়ে তাব একমাত্র মানদণ্ড হলো প্রাসঙ্গিকতা, কেননা ভাষা রূপেবি উপাদান। সেই জন্যেই ভাষাসম্বন্ধে Wordsworth-এব বিপ্লববাদকে উপেক্ষা করা

ছাড়া তার গত্যন্তব নেই। তবু সে-যুগেব চবমপন্থী Wordsworth আত্মজ্ঞ অকৃত্রিমভাব গবজে যেখানে লিখেছিলেন :

And now the same strong voice more near
Said cordially, "My friend, what cheer?
Rough doing these! as God's my judge,
The sky owes somebody a grudge!
We have had in half an hour or less
A twelve months' terror and distress!

সেইখানেই এ-যুগেব বক্ষণশীল Rupert Brooke স্বসিদ্ধ ভাষায় লিখতে পেবেছেন :

The damned ship lurched and slithered Quiet and quick
My cold gorge rose, the long sea rolled, I knew
I must think hard of something, or be sick
And could think hard of only one thing—you!
Do I forget you? Retching twist and tie me,
Old meat, good meals, brown gobbets up I throw
Do I remember? Acrid return and slimy,
The sobs and slobber of a last year's woe

ভাষা, ভাব আব ছন্দ, এই তিনেব সন্নিপাতে কাব্য গ'ড়ে ওঠে। ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কোনো বকমেব পূর্ব্ব-সংস্কাব পোষণ কবা চলে না, তা' আমবা দেখেছি। আমবা দেখেছি যে, আধুনিক তরুণদেব মতো এবাও মিলনব্যাপাবে কর্ত্তৃপক্ষেব হিতোপদেশ মানতে চায না, বলে, অবেগ-সৃষ্টিই যদি আমাদেব ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে স্বয়ম্বব-প্রথাব পুনর্প্রচলন অত্যাবশ্যক। ন্যায হোক, অন্যায হোক, আমাদেব কপটতাব ভয় দেখিযে তাবা তাদেব অভীষ্ট সিদ্ধ কবেছে। এবাবে এসেছে ছন্দেব পালা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কৃত্রিমতাব আশঙ্কায একেও কি স্বায়ত্তশাসনে অধিকাব দিতে হবে? তা-ই যদি দিতে হয়, তবে কাব্যেব আব থাকবে কি? এ সমস্যাটা সমাধান হওযাব পূর্ব্বে ছন্দেব স্বভাবকে ভালো ক'বে বোঝা উচিত। ছন্দ আব মিল এক জিনিষ নয। মিল কাব্যেব অপেক্ষাকৃত নতুন অলঙ্কাব, কিন্তু ছন্দ অনাদি। কাব্যের জন্মবৃত্তান্তেব তদন্ত কবতে গিযে দেখা গেছে যে, আবেগেব সঙ্গে ছন্দেব সংমিশ্রণেই কাব্যেব উৎপত্তি হয়েছিল। এ বিববণেব ভিতবে ভুলচুক থাকা অসম্ভব নয়। এতে কবে ছন্দকেই জ্যেষ্ঠেব আসন দেওযা হয়েছিলো, কিন্তু আসলে সে-সম্মানে তাব দাবি না-ও থাকতে পাবে। ছন্দ আব আবেগ হয়তো যমজ ভাই, তাদেব টান হয়তো নাড়ীব টান। এখানে একটা বিষয় অবশ্য দ্রষ্টব্য — আবেগ আব বেগ এক কথা নয়, আবেগেব মধ্যে বেগেব চেয়ে বিবামই বেশী; অর্থাৎ আবেগ যখন মুখব হ'যে ওঠে তখন তাব ভাষা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়য় না, চলে বিবতিবহুল গতিতে। এই ধ্বনি ও যতিব সুব্যবস্থিত নক্সাই বোধ হয়

ছন্দ। ছন্দের এই বর্ণনা যদি ঠিক হয়, তবে গদ্য-পদ্যের সীমাসন্ধি একটু অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু তাতে আপত্তি করলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা'র নীচের অংশটা পড়ার পরে অস্বীকার করা যায় না যে, আবেগ-প্রবণ গদ্য আর কাব্য অভেদাত্মা :

> "এখানে নামলো সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে
> কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'লো ?
> অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা,
> বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ;
> কোন্‌খানে ফুটলো ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ?
> জাগ্‌লো কে ? নিবিয়ে দিলো সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ
> ফেলে দিলো রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।
> এখানে একে একে দরজায় আগল পড়্‌লো, সেখানে জানলা গেলো খুলে।
> এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে, সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।"

যদি কুসংস্কার বর্জ্জন করে শোনা যায়, তাহ'লে আমাদের কান ওই লাইন-ক'টার মধ্যে একটা অন্তর্ভৌম ছন্দের ঝঙ্কার পাবে। এই গূঢ় শৃঙ্খলার মূলে কোনো রকমের তান্ত্রিক চাতুরী নেই; কেবল উপমা আর ভাবের বৈকল্পিক বিন্যাসেই এই প্রতিসাম্য এসেছে। নিক্তির একদিকে সন্ধ্যার ভার যেই রজনীগন্ধার সহযোগে এলিয়ে পড়তে চায়, তখুনি কনকচাঁপা সূর্য্যের সমর্থনে ছুটে এসে তাদের নির্ভর হ'য়ে দাঁড়ায়; 'জাগলো কে'—প্রশ্নটা যেমন উতল হ'য়ে ওঠে, দীপের আরতি আর ফুলের অর্ঘ্য অমনি তাকে শান্ত ক'রে দেয় ; হাওয়ায় ভরা পালের চালনে অর্গলিত ঘরের স্থবির নিদ্রা কোথায় উধাও হযে যায়, কে জানে ?

এই লেখাটিকে কাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা যদি অসঙ্গত না-হয়, তাহ'লে আমরা মানতে বাধ্য যে, আলঙ্কারিকের ছন্দকে পরিহার ক'রেও কাব্যরচনা অসম্ভব নয়। বস্তুত আলঙ্কারিক যাকে ছন্দ বলে সে একটা যান্ত্রিক কৌশল মাত্র ; সেই নাগরদোলার ঘূর্ণি লেগে আমাদের মন অনেক সময়েই কবিতা-বিশেষের মধ্যে ভাব আর আবেগের অভাব দেখতে পায় না। সংস্কৃত কবিরা এই যন্ত্রবিদ্যাটাকে খুব ভালো ক'রে আয়ত্ত করেছিলো ; সংস্কৃত কাব্যের প্রকাণ্ড ফাঁকি সেই জন্যেই অদ্যাবধি ধরা পড়েনি। সেই জন্যেই অজবিলাপের এই বিখ্যাত শ্লোকটা শোকের সঙ্গে কোনো সংস্রব না-রেখেও, আমার মনে আজো একটা দারুণ বিষাদের মুগ্ধ মূর্ত্তি ফুটিয়ে রেখেছে :

> স্রগিয়ম্ যদি জীবিতাপহা
> হৃদয়ে কিম্ নিহিতা ন হন্তি মাম্।
> বিষমপ্যমৃতম্ ক্বচিদ্ভবেৎ
> অমৃতম্ বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া॥

কিন্তু যখনি মোহ কাটে, তখনি বুঝি কালিদাস সেদিন সুন্দরীর শরণ নিয়েছিলেন, তাঁর স্বরহিত আবেগের ধারা শীর্ণ হয়ে পড়েছিলো বলেই।

আধুনিক কবি আমার এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন না করলেও, সে জানে যে কাব্য যখন মহত্ত্বের কোঠায় পৌঁছয় তখন তার সঙ্গে আর সংখ্যার কোনো সম্পর্ক থাকে না, তখন তার ভিতরে পাওয়া যায় শুধু একটা বিরাট সহজতা। কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দও তেমনি অকৃত্রিমতার পদধ্বনি। অনেকে বলবেন, এটা নতুন সত্য নয়, প্রত্যেক মহাকবিই এ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন, জীবন্ত কবিতার ছন্দ সর্ব্বত্রই অহংজ্ঞানশূন্য, সর্ব্বত্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত। বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাত্ত্বিক আধুনিক কবি নবীনতার বড়াই করে না; সে জানে, সাহিত্যকে নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চিরদিনই উপহাস্য; তাই সে শুধু আবিষ্করণে মন দিয়েছে। প্রথার অন্ধকূপ থেকে কণ্ঠাগত-প্রাণ ঐতিহ্যকে মুক্ত করাই তার উদ্দেশ্য; তার ব্রত, কাব্যকে আদিম স্বাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। কাব্যের মৌল সত্তা তার কাছে নিরতিশয় বাস্তব বলেই শেক্সপীয়রের ছন্দ বোঝবার জন্যে তার পণ্ডিতী ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। সে জানে নিম্নোক্ত উদাহরণটা লিয়রের উচ্চণ্ড আবেগের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি, সেই জন্যেই গলদ্‌ঘর্ম্ম টীকাকারের সামান্য মানদণ্ডের সাহায্যে এ-বিশ্বরূপের কিনারা পাওয়া শক্ত:

Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks!
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt-courriers of oak-cleaving thunderbolts,
Singe my white head! And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o' the world!
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ungrateful man!

যে অতীন্দ্রিয় শ্রুতির কল্যাণে আমরা এই অসম্বদ্ধ প্রলাপেও অব্যক্ত সাম্যস্থিতির খবর পাই, তারি আশীর্ব্বাদে D H. Lawrence-এর উদ্ধৃত কবিতার আপাত-বিষমতা একটা প্রচ্ছন্ন স্বরসঙ্গতির পরিচয় দেয়:

No, now I wish the sunshine would stop
And the white shining houses, and the gay red flowers on the balconies
And the bluish mountains beyond, would be crushed out
Between two valves of darkness ,
The darkness falling, the darkness rising, with muffled sound
Obliterating everything
I wish whatever props up the walls of light
Would fall, and darkness would come hurling heavily down,
And it would be thick black dark for ever
Not sleep, which is grey with dreams,
Nor death, which quivers with birth,

But heavy sealing darkness, silence, all immovable.
What is sleep?
It goes over me, like a shadow over a hill,
But does not alter me, nor help me
And death would ache still, I am sure,
It would be lambent, uneasy
I wish it would be completely dark everywhere,
Inside me, and out, heavily dark,
Utterly

আবেগেব সঙ্গে ছন্দেব এই মিতালি যদি কাল্পনিক না হয, তবে ছন্দ সম্বন্ধে কোনো বকমেব পূর্ব্বসংস্কাব পোষণ কবা ভাষা সম্বন্ধে হঠোক্তিব মতোই অসঙ্গত। আবেগকে আপনাব ছন্দ খুঁজে নিতে দেওযাই প্রশস্ত। এখানেও একমাত্র নিকষ প্রাসঙ্গিকতা। যে-ছন্দ প্রসঙ্গেব বিধান ছাডা অন্য কোনো শাসন মানে না, তাবি নাম মুক্ত ছন্দ। কিন্তু ছন্দেব মুক্তি আব স্বেচ্ছাচাব এক কথা নয়। অঙ্কেব আদেশ না-মানলেও, উপবেব উদাহবণ-গুলিব মতো, সমস্ত মুক্ত ছন্দই একটা স্বযন্তব নিযমেব নিবিড় বন্ধনে নিটোল। কিন্তু এটা কেবল মুক্তিবই লক্ষণ নয, ছন্দ মাত্রেই এই নিয়ম মানতে বাধ্য, অর্থাৎ ছন্দ মাত্রেই আবেগেব পদাঙ্কে চলে। এব থেকে সিদ্ধান্ত কবা অন্যায নয যে আবেগ আধাবেব অন্বেষণে সমযবিশেষে এমন একটা আশ্রযে উপনীত হতে পাবে যাব সঙ্গে আলঙ্কাবিকেব ছন্দেব বিবোধ নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিইঃ

When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smoothes her hair with automatic hand
And puts a record on the gramophone

T. S. Eliot Waste Land-এব স্বয়ন্বশ, নিবাভবণ, প্রাকৃত ছন্দেব মাঝখানে হঠাৎ এই সভ্য ভব্য সাবেকি আমলেব চাবটে লাইনেব সাহায্যে বর্ত্তমান যুগেব একটা অকিঞ্চিৎকব প্রেম-কাহিনীব বর্ণনা কবেছেন। একটু বিবেচনা কবলেই বোঝা যাবে এখানে ওই ছন্দটি কেন অবশ্যম্ভাবী। প্রথম পঙক্তিটা Vicar of Wakefield থেকে নেওযা; ওটাকে Goldsmith প্রযোগ কবেছিলেন তাঁব ভাববিলাসী উপ-ন্যাসেব লঘুমতি নায়িকাব পদস্খলন সম্বন্ধে; উপবন্ত গত দুশ বৎসব ধবে হাতে হাতে ফেবাব ফলে ওটাব প্রাথমিক বসেব সম্বলটুকু উবে গেছে, পডে আছে কেবল একটা বিস্বাদ বসালুতা। অতএব যেই লাইনটা পডি অমনি অন্তত আমাব মন আজকালকাব প্রেমেব ভাবালু পূর্ব্ববাগেব নিঃসাবতায় অভিভূত হযে আসে এবং পবেব তিন লাইনে এই বহ্বাবম্ভেব নিষ্ঠুব নিবর্থ পবিসমাপ্তি আমাকে জর্জ্জবিত কবে দেয। লাইন-ক'টাব বিধিবদ্ধ সঙ্কীর্ণতাব ভিতবে দেখতে পাই, একটা নিরুদ্বিগ্ন, নির্ব্বোধ বমণী ভগ্ন বাসবেব মধ্যে নিষ্কাবণে ঘুবে

বেড়াচ্ছে, এবং মিলের ধাক্কায় জেগে উঠে গ্রামোফোন-শব্দটা অনর্গল স্পর্দ্ধায় আমাকে বলতে থাকে যে এই নগণ্য নাটিকার মুখ্য প্রবর্ত্তনা, তারি চীৎকারের মতো যান্ত্রিক, তারি উল্লাসের মতো নিরর্থক।

স্বয়ম্বহ ছন্দের এই নমুনার পাশে পোপ-অনূদিত হোমারকে অথবা মাইকেল-বর্ণিত মেঘনাদকে বসালেই বোঝা যাবে আধুনিক কবি কাব্যকে কেন প্রথাসিদ্ধ ছাঁচে ঢালতে চায় না। তার বিশ্বাস, কাব্য বিজ্ঞানোক্ত ক্রিষ্টালের মতো, সুযোগ দিলে সে আপনার রূপ আপনি বেছে নিতে পারে, কিন্তু বাহ্য নির্দ্দেশের ফলে তার মধ্যে বিকার এসে জোটে। এই কথার ভিতরে কাব্যের অতিমর্ত্ত্যতার কোনো আভাস নেই। আধুনিক কবি প্রেরণাকে উড়িয়ে দেয় না বটে, কিন্তু প্রেরণা বলতে সে বোঝে পরিশ্রমের পুরস্কারকে। প্রশ্ন হতে পারে, কাব্য যদি স্বয়ম্ভু তাহলে কবির পারিশ্রমিকের প্রস্তাব উঠলো কেমন ক'রে? এর উত্তরে বলা যায় যে কাব্য সেই অর্থে স্বয়ম্ভু, যে-অর্থে স্বয়ম্ভু গাছ। একদিন হয়তো সে আপনার আনন্দে আপনিই উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো, কিন্তু বিশ্বের সেই প্রাক্তন উর্ব্বরতা আর নেই। আজকের দিনে কাব্যের কল্পতরুকে চাইলে, সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে তার বীজ সংগ্রহ করতে হয়, তার ভূমিকা প্রস্তুতির জন্যে মনের এঁটেল মাটিতে দিতে হয় লাঙল। তার পরে যখন তার অঙ্কুর দেখা দেয় তখনো তার বৃদ্ধিকে আয়ত্ত করার উপায় নেই, তখনো তার পিপাসা মিটতে হয় অশ্রু-সেচনে, নষ্টমোহের সার দিয়ে তখনো নিবারণ করতে হয় তার ক্ষুধা। এই কঠোর তপস্যার সিদ্ধিস্বরূপ কবি চায় একটিমাত্র বর, তার অক্ষয় বট শুধু তাকেই তাপন-তাপ থেকে রক্ষা করবে না, আশপাশের আরো পাঁচজনকে একদিন ছায়া দেবে।

স্থান ও সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে, আধুনিক কবির মোহমুক্তির ইতিহাসটাকে আমি হয়তো একটু বেশী সরল করে দেখিয়েছি। প্রকৃত পক্ষে তার প্রগতি ইস্রেলীয়দের মতোই পতনে আর অভ্যুদয়ে বন্ধুর। তার প্রতিশ্রুত নন্দনের পথ বারম্বার মরুর প্রান্তরে দিশাহারা হয়েছে, জনপদের কুহকে গন্তব্য ভুলেছে, দেবতাকে ছেড়ে অনুসরণ করেছে অপদেবতার। Symbolist-দের ধূপের ধোঁয়ায় তার চোখে এমনি ধাঁধা লেগেছে যে সে কেঁচো-মাটি আর পর্ব্বতের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করেনি। এ-নেশা কাটার সঙ্গে সঙ্গেই Imagism-এর অহঙ্কৃত বিজ্ঞাপনে সে হয়েছে আত্মহারা এবং Dowson, Symons ইত্যাদির চিত্রল আতিশয্যের পরে নিম্নোক্ত ধরণের তুচ্ছ স্পষ্টোক্তির ভিতরে শুনেছে প্রাক্তন পবিত্রতার সাড়া:

O wind,
Rend open the heat,
Cut apart the heat,

Rend it to tatters

Fruit cannot drop
Through this thick air—
Fruit cannot fall into heat
That presses up and blunts
The points of pears
And rounds the grapes

Cut the heat—
Plough through it,
Turning it on either side
Of your path (H D)

এই রকমের নিরক্ত পাণ্ডুরতার পরে পরবর্ত্তী কবিতায় Georgianism-র মেটে রঙকে যদি তার স্বাস্থ্য-কর মনে হয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই ঃ

Under the long fell's stony eaves
The ploughman, going up and down,
Ridge after ridge man's tide mark leaves,
And turns the hard grey soil to brown

Striding he measures out the earth
In lines of life, to rain and sun ,
And every year that comes to birth
Sees him still striding on and on

(GORDON BOTTOMLEY)

কিন্তু Georgianism-এর অনিত্য মাদকতা মহাসমরের রুধিরাক্ত তাণ্ডবের তালে ধ্বংস ভ্রংশ হয়ে গেছে এবং অনতিবিলম্বে সে বুঝেছে, চষা মাঠ ছাড়াও জগতে আর-এক রকমের ক্ষেত্র থাকতে পারে যার উপরে লাঙলের পরিবর্ত্তে গোলাগুলি-বোমার সাহায্যে অঙ্কিত হয় মরণের রেখা। ফলে Georgian-দের গোপগাথার নব-বিধানগুলোকে সে আর মনে রাখার অবসর পায়নি, কাব্যের সমস্ত কৃত্রিম রীতিনীতিকে ছারখার ক'রে দিয়ে তার সংরক্ত আবেগ সেদিন আপনার ছন্দে আপনি বেজে উঠেছে ঃ

His wild heart beats with painful sobs,
His strained hands clench an ice-cold rifle,
His aching jaws grip a hot parched tongue
And his wide eyes search unconsciously

He cannot shriek.

Bloody saliva
Dribbles down his shapeless jacket.

I saw him stab
And stab again
A well-killed Boche

This is the happy warrior,
This is he . . . . . .

(HERBERT READ.)

বাঞ্ছিত সহজতাব সুরু এইখানে। কিন্তু আধুনিক কবিব অগ্নিপবীক্ষা সেদিনো শেষ হয়নি, তখনো তাব বুঝতে বাকি ছিলো শান্তি যুদ্ধেব চেয়ে আবো ভয়ঙ্কব, আবো নিবাশ্বাস, আবো নিঃসঙ্গ। আজকে তাব "ভ্রান্তি-বিলাস"-নাটিকাব উপবে যবনিকা পড়েছে, তাব আত্মম্ভব প্রগল্‌ভতাব আব অণুমাত্রও অবশিষ্ট নেই, আজকে তাব আড়ম্ববশূন্য লেখনী অনাযাসেই লিখতে পাবে :

" I will now call on Alberic Morphine to give us a reading "
The rows of young women look up , their eyes glisten , they shiver
With the kind of emotion that's really very misleading,
All have fine eyes, yellow faces, vile clothes and a ' liver '

They smoke a great deal, bathe little, and wear no stays ,
Their artistic garments are made on the Grecian plan ,
They flock in their crowds to the latest poetic plays,
And aspire to a union of souls—with some pimply young man •

(DOUGLAS GOLDRING)

কিন্তু এই কি তাব অন্বিষ্ট নন্দন ?

এতক্ষণ আধুনিক-কবিব সাধনাব কথা বলেছি, এইবাবে তাব সিদ্ধিব পবিমাপ কবা যাক। আমাব দৃঢ় বিশ্বাস যে সে মহৎ কবিতা লিখেছে। সে হযতো শেক্সপীযবেব পাশে স্থান পাবে না, কিন্তু তাব কাবণ উৎকর্ষেব অভাব নয়, তাব কাবণ জাতিব ভিন্নতা। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে বর্ত্তমান কাব্যেব অধিকাংশই সাম্প্রতবিদ্‌, আধুনিক নয। কিন্তু এ-দুর্নাম শুধু আমাদেব যুগেবই প্রাপ্য নয, অতীতেব কাব্যসমষ্টিতেও সূর্য্যেব চেযে বালিব তাপই বেশী। তবে আজকালকাব শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্বন্ধেও একটা দাকণ অভিযোগ আংশিক ভাবে সত্য, ইদানীকাব কবিতা দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু দুরূহতাব দুটো দিক্ আছে, একটা পাঠকেব দিক্, অন্যটা লেখকেব। যে-দুরূহতাব জন্ম পাঠকেব আলস্যে তাব জন্যে কবিকে দোষী কবা যায না। দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতকে বাদ দিলেও কলাব অন্যান্য বিভাগে প্রতিষ্ঠা পাবাব জন্যে যে-আগ্রহ অভিনিবেশ ও অনুশীলন আবশ্যক, কবি যদি তাব নিজেব কলাব পক্ষে সেই পবিমাণেব শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায, তাহ'লে তাব দাবি নিশ্চযই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যে-দুরূহতাব উৎপত্তি অনুকম্পাব অভাবে, যাব মূল কবিব নিজেব দ্বিধা, তাব কতকটাব দায় যুগসন্ধিব স্কন্ধে চাপানো গেলেও, বেশীব ভাগটা বইতে হবে কবিকেই। পূর্ব্বেই বলেছি, আমাব মতে কাব্য কেবল তখনি পবমত্বে উপনীত হয়, যখন তাব সন্ধানে নিত্য প্রলয়েব উল্বণ উতবোলেব মাঝখানেও নিবপেক্ষ স্থিতিব অবিনশ্বব শান্তিকে মিলে। আধুনিক কাব্য এইখানে হাবস্বীকাব কবেছে। তাব এই চেষ্টা কখনো সফল হবে কি-না, তা বলবাব সময এখনো আসেনি। ভবিষ্যদ্বাণী অবিমৃষ্যকাবিতাব নামান্তব ;

তবু আমাব মনে হয়, তাব এ অন্বেষণ কোনোদিনই সার্থক হবে না। জীবনেব সহজ সূত্র আজকে যে জটিল কুটিল আকাব ধবেছে, তার মধ্যে প্রাথমিক ঋজুতা আনা অসম্ভব। আমাদেব বুদ্ধিশীল জ্ঞানই এই আসুবিক প্রচেষ্টাব প্রধান শত্রু। আমাদেব বুদ্ধিব প্রত্নতাত্ত্বিক উল্লেখনী মানুষেব কীর্ত্তিস্তম্ভ-গুলোব যে-আপতিক ভিত্তি আবিষ্কাব কবে ফেলেছে, তা দেখাব পবে শৃঙ্খলাব আশা বিডম্বনা মাত্র। তাই জন্যেই কাব্যেব কল্পতরু আজকে আব বটেব মতো ধবিত্রীব অঙ্কে বদ্ধমূল নয়, সে-গাছ পর্ব্বতজাত বডোডেন-ড্রণেব মতো তনুবাত অন্তবীক্ষে উচ্ছ্বসিত হযে উঠেছে বলেই, তাব দেহ গ্রন্থিল, তাব পবিসব খর্ব্ব, তাব তলায ছাযা নেই, ফল নেই তাব শাখে, আছে শুধু একটা অহৈতুক আন্দোলন, আব আছে ফুল, নিষ্ঠুব, বক্তাক্ত ফুল।

কিন্তু আধুনিক কাব্যেব অবশ্যম্ভাবী সঙ্কীর্ণতাকে স্বীকাব কবলেও, আধুনিক কবিব আত্মত্যাগেব মহত্ত্বকে উপেক্ষা কবাব উপায় নেই। আমবা যেন কোনোদিন না-ভুলি যে, সে যেদিন যাত্রাবম্ভ কবেছিলো, সেদিন তাব পিছনে ছিলো অনুযাত্র বিশ্বেব জযধ্বনি, এবং সম্মুখে ছিলো আগন্তুক সিদ্ধিব ববাভয়। সে-কবতালি ক্রমশঃ ক্ষীণ হযে এসেছে, প্রমাণ হযেছে সে-সিদ্ধি মবীচিকা; তাব সহযাত্রীবা পথপার্শ্বেব পান্থশালাব প্রলোভন জয কবতে না পেবে, তাব সঙ্গ ছেডেছে, তাব মাথাব উপবে নেমেছে ধ্রুব-তাবাহীন অন্ধকাব। তবু সে চলেছে, নিঃশ্বাস ফেলাব অবকাশ নেযনি, উপশন্ন বিপদেব আশঙ্কা বাখেনি, ফিবে দেখেনি তাব প্রত্যাবর্ত্তনেব পথ পদে পদে খসে যাচ্ছে। সে বসেব আশায বসালুতাকে প্রশ্রয় দেযনি, প্রাণেব পবিপূর্ণ লীলা দেখতে পাবে ব'লে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত কবেছে, চবমোৎকর্ষেব প্রতিবন্ধক ভেবে টান মেবে ফেলে দিযেছে উপত্যকাব মমত্বময় শিকডগুলোকে। ইতিমধ্যে মণ্ডলাকাব প্রগতিব পবিক্রমা হযতো তাব শেষ হযেছে, আব অগ্রগমনেব স্থান নেই, এব পবেই হযতো মৃত্যু, তবুও তাব গতিবেগ থামতে চাইছে না, এখনো তাব উদ্যমেব অন্ত নেই, শ্রান্তি নেই তাব চবণে। এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গেব পাবিতোষিক-স্বৰূপ সে যেন কেবল এইটুকুই বুঝতে চায় যে শূন্যগর্ভ মাযাব মধ্যে তাব সৃষ্টি আবো শূন্যময়!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

———

রুষ-বিপ্লবের পটভূমিকা

১

চতুর্দ্দশ বৎসব পূর্ব্বে বাশিয়ায সমাজ ও শাসনতন্ত্রেব যে আমূল পবিবর্ত্তন সাধিত হয, তাহা মানবজাতিব ইতিবৃত্তে ফবাসী-বিপ্লবেব ন্যায়ই প্রসিদ্ধি লাভ কবিবে। ভবিষ্যৎ যুগেব ঐতিহাসিকগণেব নিকট আমাদেব সমসামযিক এই প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীব প্রধান স্মবণীয় বিষয বলিয়া গণ্য হইতে পাবে। ইতিহাস আলোচনা কবিলে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওযা যায় যে, সংস্কাব, পবিবর্ত্তন, বিপ্লব কিছুই একদিনে সংঘটিত হয না,—সকল নূতন ব্যাপাবেবই সুদীর্ঘ প্রস্তুতি আবশ্যক। সুতবাং কোন্ ঘটনা-পবম্পবায় বাশিযাতে প্রবল পবাক্রান্ত জাবেব প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইযা বল্‌সেভিক্‌দিগেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সম্বন্ধে আমাদেব ধাবণা স্পষ্ট কবিযা লইবাব প্রয়োজন আছে।

ইউবোপেব বিখ্যাত প্রাচীন বাজবংশগুলি সম্প্রতি একে একে লোকচক্ষুব অন্তবালে অপসাবিত হইতেছে। আধুনিক ইউবোপেব বাজ-পবিবাবদিগেব মধ্যে সর্ব্ব প্রধান তিনটি—বাশিয়াব বোমানভ্, অষ্ট্রিযাব হাব্‌স্বার্গ্ ও প্রাশিয়াব হোহেন্‌জলার্ণ্ বংশ—গত মহাযুদ্ধেব ফলে সিংহাসন-চ্যুত হইযাছে। বুর্ব্বন্-কুলেব শেষ প্রতিনিধিও আজ আপন বাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। ইহাদেব মধ্যে বোমানভ্‌দেব পতন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয, কেননা পূর্ব্বে তাহাদেব প্রতাপে কোন বাধা বা সীমা ছিল না। জাবদিগেব ক্ষমতা, স্বৈবাচাব ও অত্যাচাব প্রবাদে পবিণত হইযাছিল। কযেকদিনেব মধ্যে এই বিবাট্ বাজশক্তি অকস্মাৎ সমূলে উৎপাটিত হইবে, ইহা কাহাবও সম্ভব মনে হইত না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাশিয়াব অবস্থা-সম্বন্ধে চিন্তা কবিলে কিন্তু বুঝিতে পাবা যায যে, বিপ্লবেব প্রায় শতবর্ষকাল পূর্ব্ব হইতে বোমানভ্‌দিগেব মুষ্টিতে বাজদণ্ড শিথিল হইয়া আসিতেছিল। প্রথম নিকোলাসেব বাজত্ব-কালে (১৮২৫-১৮৫৫) বোমানভ-বাজকুল শক্তিব উচ্চতম শিখবে আবোহণ কবে এবং সেই সময হইতেই জাবতন্ত্রেব ক্ষমতাহ্রাসেব সূত্রপাত লক্ষিত হয়।

২

পিটাব দি গ্রেট্ হইতে আবম্ভ কবিযা প্রথম নিকোলাসেব সময় পর্য্যন্ত বাশিযাব বহির্মুখীন বাষ্ট্রশক্তি প্রবল হইতে প্রবলতব হইতেছিল। এমন কি দিগ্বিজয়ী নেপোলিযান্ পর্য্যন্ত বাশিয়াকে তাঁহাব পদানত কবিতে

পারেন নাই। টিল্‌সিটের সন্ধির সময় (১৮০৭) নেপোলিয়ান্‌ সম্রাট্‌ প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারকে তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের পতনের অন্যতম কারণ রাশিয়ার বিপুল শক্তি—সেইজন্য আলেক্‌জাণ্ডার নিজেকে "বিশ্বজয়ীজিৎ" বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রাশিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধির পথে বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-১৮৫৬) রাশিয়ান্‌দিগের নিকট অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই নূতন সত্যের আভাস আনিয়া দিল। তুরস্কসমরে (১৮৭৬-১৮৭৮) রাশিয়াই বিজয়ী হইল কিন্তু সন্ধির সময়ে লাভ করিল প্রধানতঃ অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ড। তুরস্কের করগত কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে জাতির যে-পন্থা ক্যাথারিণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপে বাধা ঘটিল। এই সময়ে অন্য একদিকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিতেছিল বটে—১৮৫৯ সালে ককেসাস্‌ অঞ্চল, ১৮৫১ হইতে ১৮৬০ সালের মধ্যে আমুর্‌ উপত্যকা ও চীনের সীমান্ত প্রদেশ এবং ১৮৬৫ হইতে ১৮৯১ সনের ভিতরে মধ্য এসিয়া সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার করায়ত্তে আসিয়াছিল। কিন্তু একদিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংঘাতে ও অন্যদিকে ১৯০৪-১৯০৫ সালে জাপানের হস্তে পরাজয়ের ফলে এসিয়া মহাদেশেও অবশেষে রাশিয়ার গতিরোধ হইল। মহাযুদ্ধের সময়ও রাশিয়া পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিল। ক্রিমিয়া-সমর, রুষ-জাপান সংগ্রাম ও মহাযুদ্ধ এই তিনবার পরাজয়ের ফলে সর্ব্বসাধারণের নিকট জারতন্ত্রের অপটুত্ব ও দুর্ব্বলতা যে ভালো করিয়াই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছিলো তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য প্রত্যেক পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই আমরা রাশিয়াতে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান দেখিতে পাই। ১৯১৪ সালে সার্ব্বিয়ার সংবাদপত্রগুলি অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যকে কীটভুক্ত বলিয়া উপহাস করিত। রোমানভ্‌-দিগের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৩

রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম নিকোলাসের যুগ হইতেই সম্রাট্‌দিগের শাসনপ্রণালী-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বিদ্রোহাচরণের আরম্ভ। পিটার ও ক্যাথারিন্‌ দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সূচনা করেন বটে (তাঁহাদের পূর্ব্বে এসিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া রাশিয়ার একটা অখ্যাতি ছিল) কিন্তু সে চেষ্টা রাজশক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট

থাকায় তাহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারের সময় পশ্চিমের সহিত বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষদের ভিতর দিয়া ইউরোপের স্বাধীন চিন্তার ধারা বন্যার মতন রাশিয়াতে প্রবেশ করিতে লাগিল। ফলে রাশিয়ায় এই সময়ে আধুনিক পোলিটিক্যাল প্রচেষ্টার আরম্ভ। আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন্ ভ্রাতা সম্রাট্ হইবেন, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে স্থির ব্যবস্থা ছিল না। এই সুযোগে ১৮২৫ সালে, প্রথম নিকোলাস সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র পাশ্চাত্য চিন্তায় অনুপ্রাণিত সৈনিকদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রোহী হয় ও দেশে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে। নিকোলাস সহজেই নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করেন কিন্তু দেশের মনরাজ্যে পাশ্চাত্য চিন্তা যে জাগরণ আনিতেছিল তাহা প্রতিরোধ করা তাঁহার প্রভূত শক্তিতেও কুলায় নাই। যে সময় পুষ্‌কিন্ ও লার্মণ্টভ্ রুষ সাহিত্যে স্বর্ণযুগের সূচনা করিতেছিলেন; তখন অন্য অনেকে ইতিহাস ও দর্শন-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে বেলিন্‌স্কির নাম স্মরণীয়, কেননা তিনিই এই নবীন চিন্তাশীল দলের কেন্দ্রস্থানীয় ছিলেন। রাশিয়ায় এই যুগের স্বাধীন চিন্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় এক তুমুল তর্কের মধ্যে। ১৮৩৬ সাল হইতে রাশিয়ার ভাবরাজ্যে দুইটি বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। একদল নিজেদের Slavophil বলিতেন—রাশিয়ার শ্লাভজাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারা জগতে একটা mission লইয়া আসিয়াছে, অতএব বিদেশের ব্যর্থ অনুকরণ না করিয়া পুরাতন স্বদেশী পরিশীলনের পুনর্গঠন আবশ্যক—ইহাই ছিল ইঁহাদের অভিমত। অপরপক্ষে Westerners বা পাশ্চাত্যপন্থীরা পশ্চিমের বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার আলোক পশ্চিম হইতেই আসিতেছে। শেষোক্তদলের প্রভাবই শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়াতে প্রবলতর হয়। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালে স্বাধীন চিন্তাস্রোত রোধ করিবার জন্য অত্যাচারের ত্রুটি হয় নাই। অনেকের ভাগ্যেই কারাগার বা নির্ব্বাসনদণ্ড জুটিয়াছিল কিন্তু এই সময় হইতে শিক্ষিত রাশিয়ান্‌দের মনের জড়ত্ব কাটিবার লক্ষণ দেখা যায়। তাহারা নিজেদের অবস্থা-সম্বন্ধে ভাবিতে ও প্রশ্ন করিতে শিখিল।

৪

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসানে, প্রথম নিকোলাসের পুত্র দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডারের সময় (১৮৫৪-১৮৮১) শিক্ষিত সমাজের মতামত সর্ব্বপ্রথম শাসকদিগের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। যুদ্ধে পরাজয়ের পর সম্রাট্ ও তাঁহার মন্ত্রণাদাতাগণ, রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তি সুদৃঢ় করিয়া লইবার

জন্য কোন কোন দিকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশে এক নূতন যুগ দেখা দিল—সংস্কারের যুগ। রাশিয়ার অধিকাংশ লোক তখন পর্য্যন্ত serf ছিল—আইনতঃ তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের মত, রাজা বা জমিদারের সম্পূর্ণ পদানত হইয়া তাহারা জীবন যাপন করিত। ১৮৬১ সালে আলেক্‌জাণ্ডার তাহাদের মুক্তি দিলেন। ১৮৬৪ সালে রাশিয়ার বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশগুলিতে প্রজাসাধারণদ্বারা নির্ব্বাচিত সমিতির (Zemstvo) সৃষ্টি হইল। সেই বৎসরেই বিচারে 'জুরী' প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। ছয় বৎসর পরে নগরগুলিতেও স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত হইল। কিন্তু মুক্তিদাতা (The Liberator) সম্রাটের সংস্কার-সমূহে দেশে শান্তি আসিল না। নূতন ব্যবস্থাগুলি বহুপূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল—এখনও তাহাদের মধ্যে উদারতার একান্ত অভাব দেখা গেল। প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারের সময়েই সার্ফ্‌দিগের মুক্তির প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল ; তাঁহার মন্ত্রী স্পেরান্‌স্কি ১৮১১ সালে যে শাসন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাহা জেম্‌ষ্ট্‌ভোগুলির অপেক্ষা অনেক উদার সন্দেহ নাই। দেশের অর্দ্ধেক জমি কৃষকেরা এখন পাইল বটে কিন্তু তাহার জন্য ইহাদিগকে বহুবর্ষ ধরিয়া পূর্ব্বতন প্রভুদের ক্ষতি-পূরণের অর্থ জোগাইতে হয়। প্রাদেশিক সমিতিগুলি শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি যথেষ্ট করিয়াছিল—অনেক সভ্য শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সমগ্র দেশে স্বায়ত্তশাসনের সম্বন্ধে আশা করিতে শিখিল। কিন্তু প্রথম হইতেই সমিতিগুলিকে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় নাই এবং রাজ্যশাসনে জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে কোনরূপ ক্ষমতা দেওয়া সম্রাট্‌ ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ বাতুলতা বলিয়া গণ্য করিতেন।

৫

মুক্তির প্রথম আনন্দে সংস্কারকেরা অনেকে যখন দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডারকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন, তখনই চরমপন্থীগণের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গেল। এই সময়ে নিহিলিষ্ট্‌ মতবাদের প্রথম প্রচার হয়—প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস ও সকল প্রথার বিরুদ্ধে অনেক যুবক বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে terrorism-এর আবির্ভাব হইল—১৮৬৬ সাল হইতে এমন কি সম্রাট্‌কে পর্য্যন্ত হত্যা করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াতে যুবক ও ছাত্র-সমাজে আন্দোলন আরম্ভ হয়। নির্ব্বাসনে থাকিয়া হার্‌জেন্‌ তাঁহার বিখ্যাত 'কলোকোল্‌' (ঘণ্টা) পত্রিকায় শিক্ষিত রুষ যুবকদের এক নূতন মন্ত্র দিলেন—to the people—'দেশের জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া চল'।

রাশিয়ার পলিটিক্স-ক্ষেত্রে এই যুগে যাহারা প্রাধান্য লাভ করে, তাহাদের নারোদ্‌নিকি-নামে অভিহিত করা হয়। এই শব্দের অর্থ প্রজাসাধারণের আপনার লোক—men of the people। ইহাদের মধ্যে লাভ্‌রভ্‌-প্রমুখ একদল নিজেদের শুধু প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গ্রামে গিয়া সাধারণ লোকের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদের মনে রাষ্ট্রচিন্তার উদ্রেকের চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্য একদল শান্ত সহিষ্ণুভাবে কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। বিখ্যাত বাকুনিনের অগ্নিময়ী বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা বিপ্লবের পথে পদার্পণ করিল। তাহাদের স্বপক্ষে এক প্রবল যুক্তি ছিল এই, যে সব নারোদ্‌নিকি অহিংসভাবে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারাও রাজরোষ এড়াইতে পারে নাই। নারোদ্‌নিক্‌দের প্রতিপত্তির সময়টি রাশিয়ার ইতিহাসে ভাবোচ্ছ্বাসের যুগ। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য্য আশানুযায়ী ফললাভ করিয়াছিল বলা যায় না। কৃষকেরা জমি ও ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ে চিরকালই উদাসীন, তাহার উপর সকল শ্রেণীর নারোদ্‌নিকির উপর শাসকদিগের কৃপাদৃষ্টি নির্ব্বিচারে পড়িতেছিল। অত্যাচারের ফলে প্রচারের স্রোত কমিয়া আসাতে বিপ্লবীদের পথ পরিষ্কার হইতে লাগিল। গুপ্ত সমিতিগুলি শাসকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে terrorism পূর্ণমাত্রায় আবির্ভূত হইল। ১৮৮১ সালে সার্ফদিগের উদ্ধারকর্ত্তা সম্রাট্‌ দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডার নিহত হইলেন। তাহার কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত বিপ্লবীদের দ্বারা এইরূপ নানা হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা চলিয়াছিল। এই শ্রেণীর কোন ষড়যন্ত্রের জন্য লেনিনের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণদণ্ড হয় (১৮৮৭)।

৬

Terrorism-এর ফলে ১৮৮১ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অত্যাচার অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। তৃতীয় আলেক্‌-জাণ্ডারের (১৮৮১-১৮৯৪) মধ্যে দমননীতি মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিল বলা চলে। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস্‌ (১৮৯৪-১৯১৭) দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার পিতার শাসন-প্রণালীতে কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। এই কয় বৎসরে রাশিয়ায় অত্যাচার নানা দিকে দেখা যায়। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যে সকল সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহাদের স্বাধীনতাকে নানা ভাবে খর্ব্ব করা হইল। যে সকল বিভিন্ন জাতি রাশিয়ার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের স্বকীয় ভাষা, প্রথা, আচার ইত্যাদির ব্যবহারে বাধা দেওয়া হইল।

বিশেষভাবে য়িহুদীদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র রহিল না—বিচার-পদ্ধতির কঠোরতা ও সংবাদপত্র এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্রদিগকে ও সকল প্রকার পোলিটিকাল দলকে বিধিমত দমন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কিন্তু এই দেশব্যাপী অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক দিক হইতে জারতন্ত্রের পতনের পথ পরিষ্কার হইতেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে Industrial Revolution-এর বন্যা রাশিয়াতে আসিয়া পড়িল। দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী, অর্থাগমের সহিত, রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ায় উদার-নৈতিক মতের প্রাদুর্ভাবের ইহাই কারণ। অন্যদিকে রেল্‌লাইন, কারখানা ও বিদেশী মূলধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদিগের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল। তাহাদের জীবনযাত্রার ভার লাঘব করিবার কোন ব্যবস্থাও হইল না। এইরূপে রাশিয়াতে সোসিয়া-লিজ্‌মের প্রতিষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল।

৭

সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, রাশিয়ায় প্রধান সোসিয়ালিষ্ট্ দল ছিল সোসিয়ালিষ্ট্-রেভলিউসনারীগণ—যাহারা সংক্ষেপে এসার (S R.) দল বলিয়া খ্যাত। তাহাদের সহিত নারোদ্‌নিক্‌দের মতামতের অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এসারের রাষ্ট্রচিন্তা কৃষকদিগের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিল। তাহারা terrorism-এর পক্ষপাতী ছিল; স্বদেশপ্রেম তাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দলে কার্য্য করিতে তাহারা ভালবাসিত—Individualism তাহাদের মজ্জাগত ছিল। দেশের জনসাধারণ বলিতে তাহাদের মনে যে মায়া ঘনাইয়া আসিত তাহার ভিতরে প্রচলিত সোসিয়ালিজ্‌মের শ্রেণী-সজ্ঘর্ষের (class war) ভাব খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

সোসিয়ালিষ্ট্-ডিমোক্রাট্‌ নামে পরিচিত দ্বিতীয় একদল সম্পূর্ণ পৃথক্ আদর্শে গঠিত হইতেছিল। তাহাদের প্রধান নেতা ছিলেন প্লেকানভ্। তাহারা মার্ক্‌সের মতবাদ সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রমিকদিগের স্বার্থের জন্যই দেশে বিপ্লব আনিতে চাহিতেছিল। মার্ক্‌সের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ—Das Capital ১৮৭২ সালে রুষভাষায় অনূদিত হয়—ইহাই বোধহয় এই পুস্তকের প্রথম ভাষান্তর। কিন্তু রাশিয়াতে মার্ক্‌সীয় দল ১৮৮৯-এর পূর্ব্বে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের প্রথম সার্ব্বভৌমিক সভা

(First International) ১৮৯৭ সালে সম্মিলিত হইবাব পূর্ব্বেই নেতৃবৃন্দ কাবাগাবে বা নির্ব্বাসনে প্রেবিত হইলেন।

প্রথম হইতেই এই দলেব মধ্যে লেনিনেব প্রতিপত্তি বিস্তীর্ণ হইযা পড়ে। নাবোদনিক্ ও এসাব মতবাদেব তীব্র সমালোচনা কবিয়া তিনি খ্যাতিলাভ কবেন। ওই ছুটি দল শ্রমিকদেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবে নাই—স্বদেশেব মাযায় জগদ্ব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনেব সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন কবিযাছে—নিজেদেব শক্তি কতকগুলি বৃথা নরহত্যায় অপচয় কবিযাছে—এই ছিল তাঁহাব প্রধান অভিযোগ। নানা বিপদেব পব বিদেশে তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হয। লণ্ডন হইতে 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) পত্রিকা প্রকাশ কবিযা তিনি নিজেব মতামত প্রচাব কবিতে লাগিলেন। মার্ক্সীয দলেব নেতৃত্বে বাশিযাব শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও বিপ্লবেব জন্য প্রস্তুত কবাই তাঁহাব জীবনেব ব্রত ছিল। সম্রাটের সমস্ত চবেব চক্ষে ধূলি দিযা 'ইস্ক্রা' বাশিযাব সর্ব্বত্র পৌঁছাইতে লাগিল, কাবণ নেতৃবৃন্দেব অনুপস্থিতিতেও কার্য্য চালাইবার লোকেব অভাব হয নাই।

১৯০৩ সালে লণ্ডনে সোসিযালিষ্ট্-ডিমোক্রাট্দেব দ্বিতীয অধিবেশন হয়। লেনিনেব মতামত লইয়া এই সভাতে ছুই দল সৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে লেনিনেব সমর্থনকাবীবা সংখ্যায় অধিক থাকাতে তাহাবা বল্শেভিক্ অথবা সংখ্যাধিকেব দল বলিযা আখ্যা লাভ কবে। অন্য পক্ষ মেন্শেভিক্ নামে পবিচিত। বল্শেভিক্গণ নূতন পদ্ধতি অনুসাবে মার্ক্সীয়দলেব পুনর্গঠন চাহিল। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিব দিকে মন না দিযা যাহাতে উপযুক্ত লোকেবাই কেবল সভ্য হইতে পাবে তাহাব চেষ্টাকেই তাহাবা কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিল। সকলেই একটি কেন্দ্রীয় সমিতিব আদেশ-অনুসাবে কার্য্য কবিবে—মধ্যবিত্ত শ্রেণীব সহিত তাহাবা কোন সহযোগ বাখিবেনা—শ্রমিকদেব অবস্থা পবিবর্ত্তন একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবদ্বাবাই সম্ভব—ইত্যাদি মতগুলিও মেন্শেভিকেবা গ্রহণ কবিতে পাবে নাই। মেন্শেভিকেবা মুখে বিপ্লবেব কথা বলিলেও কার্য্যতঃ জার্ম্মান্ সোসিযাল্-ডিমোক্রাট্ বা ব্রিটিশ লেবাব দলেব ন্যায় শান্তিপ্রিয ছিল—প্রচাবকার্য্যেব উপবই তাহাবা অধিক নির্ভব কবিত। মতভেদ সত্ত্বেও সোসিয়ালিষ্ট্-ডিমোক্রাট্দেব ছুইটি শাখা এই সমযে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইযা গেল না। ১৯০৩-এব পবে প্লেকানভ্ বল্শেভিক্দেব অপেক্ষা মেন্শেভিক্দিগেব প্রতি অধিক প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তাহাব ফলে বাশিযাতে মার্ক্সীয দলেব কর্ত্তৃত্ব মেন্শেভিক্দেব হস্তেই ন্যস্ত হইল। লেনিন্ কিন্তু ফবওযার্ড্ (Forward) নামে পত্রিকা বাহিব কবিযা নিজেব আদর্শ প্রচাব কবিতে লাগিলেন।

৮

রুষ-জাপানেব যুদ্ধেব ফলে জাবেব সিংহাসন টলমল কবিয়া উঠিল। দেশব্যাপী অসন্তোষ প্রকাশ পাইল প্রাদেশিক সমিতিগুলিব সম্মিলিত সংস্কাব-কামনায় (নভেম্বব, ১৯০৪)। গণতন্ত্র স্থাপনেব দাবী সমর্থন কবিয়া নানাদিকে সমিতি ও সঙ্ঘ গঠিত হইতে লাগিল—সকল শ্রেণীব লোকেই আন্দোলনে যোগ দিল। বাজধানীতে ১৯০৫ সালেব জানুযাবী মাসে একদিন নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সঙ্ঘেব সভ্যেবা শোভাযাত্রা কবিয়া বাজদববাবে নিজেদেব প্রার্থনা জানাইতে গেল। সৈনিকেবা কর্ত্তৃপক্ষেব আদেশমত তাহাদেব উপব গুলি চালাইলে প্রায় ১৫০০ লোক সেদিন হতাহত হয। হত্যাকাণ্ডেব সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে দেশেব একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলনেব স্রোত বহিয়া গেল। দক্ষিণে কৃষ্ণসাগবে পটেম্‌কিন্‌-নামক বণতবীব বিদ্রোহ ক্ষণস্থাযী হইলেও সাম্রাজ্য-পতনেব পূর্ব্বাভাসেব ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বিপুল জনসভা, শ্রমিকদিগেব ধর্ম্মঘট, কৃষকদেব জমিব দাবী, মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভোটাধিকার প্রার্থনা—নানা উত্তেজনায ১৯০৫ সাল বাশিয়াব পক্ষে স্মবণীয হইযা উঠে। অক্টোবর মাসে বেলকর্ম্মচাবীদিগেব ধর্ম্মঘট হইতে দেশব্যাপী General Strike সম্ভূত হয়—সকল শ্রেণীব লোকে নিজ নিজ কর্ম্ম বন্ধ বাখিযা এক বিবাট্‌ হবতালেব সৃষ্টি কবে। বাজধানীতে এই সময় এক অভিনব শক্তিব আবির্ভাব হইল—সোসিযালিষ্ট্‌দেব নেতৃত্বে প্রথম সোভিয়েট্‌ আপনাব কর্ত্তৃত্ব বিস্তাব কবিতে লাগিল। সোভিযেট্‌ শ্রমিকদিগেব নির্ব্বাচিত সমিতি মাত্র কিন্তু এই নির্ব্বাচনেব কেন্দ্রগুলি নগবেব বিভিন্ন পল্লী অনুসারে ভাগ কবা নয়—প্রতি কাবখানাব শ্রমিকমণ্ডলী পৃথক্‌ভাবে তাহাদেব নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কবে। যে কোন মুহূর্ত্তে নূতন প্রতিনিধি পাঠাইতে পাবা যায বলিয়া সোভিযেট্‌ শ্রমিকদিগেব ইচ্ছা প্রকাশ করিবাব পক্ষে উপযুক্ত উপায-স্বরূপ সমাদর লাভ করিল। চাবিদিক হইতে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিযা অবশেষে সম্রাট্‌ অক্টোবর মাসে ঘোষণা কবিতে বাধ্য হইলেন যে, পূর্ব্ব বৎসবেব নভেম্বব মাসেব সম্মিলিত প্রস্তাব অনুযায়ী দেশেব জনসাধাবণকে শাসন-কার্য্যে কিছু ভাগ দেওয়া যাইবে।

দেশে উত্তেজনা কমিয়া গেলেও যাহাবা সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রেব পক্ষপাতী তাহাবা আন্দোলন চালাইতে লাগিল, কাবণ সম্রাটের প্রস্তাব সকলকে সন্তুষ্ট কবিতে পাবে নাই। কিন্তু এইবাব চবমপন্থীগণ বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পাবিল না। দ্বিতীয়বার General Strike-এব চেষ্টা ব্যর্থ হইবাব পব সুযোগ পাইয়া রাজধানীব সোভিয়েট্‌টিকে নির্ম্মূল করা হয। ১৯০৫

সালের মধ্যেই সম্রাটের প্রভুত্ব অনেকাংশে ফিরিয়া আসে। এই বৎসরের বিপ্লবচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, সোসিয়ালিষ্ট্‌গণ ইহাতে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করে নাই—আন্দোলনে দেশের সকল দলেরই যোগ ছিল। ১৯০৫-এর শেষে মস্কোতে শ্রমিকগণ যে বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা করে, লেনিনের তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটে। অল্পদিনের জন্য তখন তিনি দেশে ফিরিতে পারেন। বারো বৎসর পরে লেনিন তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন।

৯

সম্রাটের প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেশে নূতন ব্যবস্থা হইল—প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত এক মহাসভা দেশের শাসনযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দেখা দিল। ইহার নাম ডুমা। কিন্তু ডুমার ক্ষমতা যথাসাধ্য অল্পপরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হয়—অধিকাংশ ব্যাপারই সম্রাট্ ও তাঁহার নিযুক্ত মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত রহিল। এই কারণে সোসিয়ালিষ্টেরা প্রথমে নির্ব্বাচনে যোগ দেয় নাই। তথাপি ১৯০৬ সালে যখন প্রথম ডুমা সম্মিলিত হইল তখন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অল্প সংখ্যক ভোট-ই পাওয়া গেল। সম্রাট্ তখন নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। প্রথম ডুমার অধিকাংশ সভ্য ভাইবোর্গ্ হইতে দেশের লোকের নিকট গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগের আবেদন করেন কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই।

দ্বিতীয় ডুমায় (১৯০৭) সোসিয়ালিষ্ট্ দুই দলের (এসার ও মার্ক্সীয়) বহুলোক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু নেতাদের মধ্যে অনেককে ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে গভর্ণমেণ্ট শাস্তি দিতে উদ্যত হওয়ায় মহাসভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করে। এই দোষে সভার অধিবেশন সাঙ্গ করিয়া নব নির্ব্বাচনের আদেশ হয়। শাসকদিগের প্রীতিপ্রদ না হইলে, জনমতের কোন মর্য্যাদা নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেন সম্রাট্ এই কার্য্য করিলেন। নির্ব্বাচনের নিয়মাবলীও এমনভাবে পরিবর্ত্তন করা হইল যে, অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই ভোট দিবার অধিকার রহিল। ইহার ফলে অবশ্য তৃতীয় (১৯০৭) ও চতুর্থ (১৯১২) ডুমায় গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সভার সার্থকতাও নিশ্চয় অন্তর্দ্ধান করিল। সোসিয়ালিষ্টেরা পুনরায় বিপ্লব চেষ্টায় মন দিল। ডুমার মধ্যে রক্ষণশীল অক্টোব্রিষ্ট (১৯০৫-এর অক্টোবরে জারের প্রস্তাবমণ্ডলীতেও ইহারা সন্তুষ্ট ছিল) ও উদারনৈতিক ক্যাডেট্ দল বাগবিতণ্ডা করিত বটে কিন্তু দেশের লোকের আর ইহার উপর অধিক আস্থা রহিল না।

১৯০৭ হইতে ১৯১১ সাল সোসিয়ালিষ্ট্‌দিগেব অবসাদেব সময়। কিন্তু ১৯১২ হইতে শ্রমিকদিগেব মধ্যে আবাব নূতন উদ্দীপনা দেখা গেল। এপ্রিল মাসে লেনা-খনিব শ্রমিকদেব উপব গুলিবর্ষণেব ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বল্‌শেভিক্‌বাদেব বিখ্যাত সংবাদ-পত্র 'প্রাভ্‌দা' (সত্য) এই সময়ে স্থাপিত হইল। ডুমাব মধ্যেও স্বতন্ত্র বল্‌শেভিক দল তখন সৃষ্টি হয়। ১৯১২ সালে লেনিনেব নেতৃত্বে বল্‌শেভিকেবা মেন্‌শেভিক্‌দেব সংস্পর্শ ত্যাগ কবিযা আপনাদেব আদর্শ অনুযায়ী নূতন দল গঠন কবে।

১০

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে ১৯১৪ সালে বাশিয়া যখন যোগ দিল তখন দেশেব আভ্যন্তবিক অবস্থা আশাপ্রদ ছিল না। বহুকাল হইতে বাশিয়াব কৃষকেবা জমিদাবেব জমি পাইবাব আশা কবিতেছিল—তাহাদেব মতে জমি ন্যাযতঃ তাহাদেবই প্রাপ্য। পঁচিশ লক্ষ শ্রমিক তাহাদেব নিজেদেব শক্তি বুঝিতে শিখিতেছিল। তাহাদেব মধ্যে সোসিয়ালিষ্ট্‌ মতবাদ প্রভূত প্রচাব হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশে অধীন জাতিসমূহ অত্যাচাবে জর্জ্জবিত হইযা মুক্তিব আশায় বসিযাছিল।

যুদ্ধে ক্রমাগতঃ শাসনযন্ত্রের অক্ষমতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-বাৰুদ, দেশের ভিতব খাদ্য, এক স্থান হইতে স্থানান্তবে যাতায়াত—এ সমস্তেরই অভাব দেখা গেল। বিপদেব সময জনমত পুনরায় শাসনতন্ত্রেব সংস্কাব চাহিল। ডুমাব অধিবেশনেও তাহাব প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই সমযে বাশিয়াব প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন বাস্‌পুটিন্‌ নামে একজন ক্রীশ্চান ভিক্ষু। সাম্রাজ্ঞীব উপব তাঁহাব অগাধ প্রভাব থাকায় তাঁহাব ইচ্ছামত সমস্ত চলিত। তাঁহাবই ইঙ্গিতে সাম্রাজ্ঞী সংস্কাবের পথে দৃঢভাবে বাধা দিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নিকোলাস্‌ চিবকালই দুর্ব্বল চিত্ত—এখনও তাঁহাব পাবিপার্শ্বিক প্রভাব তাঁহাকে আচ্ছন্ন কবিযা বাখিল। ১৯১৬ সালেব ডিসেম্ববে বাস্‌পুটিন্‌ শত্রু হস্তে নিহত হওযায সঙ্গে সঙ্গে বোমানভ্‌ বংশেব সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরতবে অস্তমিত হইল।

মহাযুদ্ধে সোসিয়ালিষ্ট্‌দিগকে বিপদে পডিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহারা দেশে দেশে যুদ্ধেব বিরুদ্ধে অনেক প্রচাব কবিয়াছিল কিন্তু ১৯১৪ সালে ইউবোপেব প্রতি-দেশে সোসিয়ালিষ্ট্‌দেব মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বাশিয়াতে প্লেকানভ্‌ তাঁহাব চিবজীবনেব মতামত বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধ সমর্থন কবিলেন—দেশেব লোককে জাবেব পতাকামূলে দাঁডাইবাব উপদেশ দিলেন। মেন্‌শেভিকেবা যুদ্ধে পাবতপক্ষে যোগ দেয় নাই, নিরপেক্ষভাবে যুদ্ধ শেষেব অপেক্ষা কবিতে লাগিল। কিন্তু বল্‌শেভিক্‌দেব

মনে হইল যে, এই যুদ্ধই পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক-বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাস ও সুবর্ণ সুযোগ। ১৯১৫-১৯১৬ সালে সুইট্‌জাবল্যাণ্ডে যুদ্ধের বিরোধী সোসিয়ালিষ্ট্‌দের দুইটি সভা হয়। লেনিন্‌ সেখানে বল্‌শেভিক্‌ মত প্রচার করেন। তাঁহার দেশে ফিরিবার উপায় ছিল না কিন্তু তাঁহার বাণী দেশে প্রচার করিবার জন্য খাটিবার লোকের অভাব ছিল না। অনেকে গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে শ্রমিকদিগের মধ্যে বল্‌শেভিক্‌বাদ বিস্তার করিয়া যাইতেছিল। বর্ত্তমানে রাশিয়ার কর্ণধার ষ্টালিন্‌ তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

১১

খাদ্যাভাবে ও পুটিলোভ্‌ কারখানায় ধর্ম্মঘটের ফলে রাজধানী পেট্রোগ্রাড্‌ নগরে ১৯১৭ সালের মার্চ্চে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ৯ই মার্চ্চে গুলি চলে কিন্তু ১০ই সৈনিকেরা আর আদেশমত শ্রমিকদের আক্রমণ করিতে চাহিল না। পরদিন এই নূতন ভাব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ১২ই মার্চ্চ সৈন্যদল বিদ্রোহী হইল—শ্রমিকেরাও ১৯০৫ সালের অনুকরণে তাহাদের সোভিয়েট্‌ গঠন করিয়া ফেলিল। অন্যদিকে ডুমার একটি সমিতি সমস্ত রাজ্যের ভার নিজের হস্তে লইল। ১৫ই তারিখে নিকোলাস্‌ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে রোমানভ্‌ বংশের রাজ-শক্তির উচ্ছেদ হইয়া গেল।

নূতন গভর্ণমেণ্ট ডুমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় কিন্তু পেট্রোগ্রাড্‌ সোভি-য়েটেরও প্রচণ্ড ক্ষমতা রহিল। সোভিয়েটে এই সময় মেন্‌শেভিকদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাহারা নিজেদের হাতে দেশের শাসন ভার না পাইয়া গভর্ণমেণ্ট দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লইবে এইরূপ ভাবিত। মেন্‌শে-ভিকেরা চিরকালই আপনাদের উপর সকল ভার লইতে ভয় পাইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মতে দেশ তখন সোসিয়ালিজ্‌মের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। অন্যান্য দেশের মত রাশিয়াতেও প্রথমে সাধারণ গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি অনিবার্য্য বলিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দিতেছিল। এসারদিগেরও কোন স্থির সংকল্প ছিল না। একমাত্র বল্‌শেভিকেরা মার্চ্চের বিপ্লবে সন্তুষ্ট না থাকিয়া আরও অগ্রসর হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল।

এসার নেতা কেরেণস্কি দেশের কর্ণধার নিযুক্ত হইলেন বটে কিন্তু তদুপযোগী ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। দেশে বিপ্লবের স্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিতেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈনিকেরা চলিয়া আসিতেছিল—তাঁহাদের অধ্যক্ষদের আর তাহারা মানিতে চাহিল না। কৃষকেরা সুযোগ পাইয়া জমি দখলের চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রমিকেরা নগরে নগরে

সোভিয়েট্ গঠন কবিল। অধীন জাতিগুলি মুক্তিব চেষ্টায ব্যস্ত হইযা পড়িল। এই সময বিদেশ হইতে প্রত্যাগত লেনিন্ ও তাঁহাব সহকর্ম্মিগণ সোৎসাহে বল্‌শেভিক্‌বাদ প্রচাব কবিতে লাগিলেন। পেট্রোগ্রাডে প্রতিদিন লেনিন্ বক্তৃতা কবিতেন। তিনি চাবটি প্রস্তাবে দেশেব লোকেব মন জয কবিলেন—যুদ্ধ এখনই বন্ধ কবিযা দিতে হইবে; কৃষকেবা জমিদাব-দিগেব জমি দখল কবিতে পাবিবে; সোভিয়েট্‌গুলিব হস্তে সমস্ত শাসন-ভাব সমর্পণ কবা প্রয়োজন এবং অধীন জাতিগুলি তাহাদেব ইচ্ছামত শাসনেব ব্যবস্থা কবিয়া লইবে। দেশেব অবস্থা ও দেশেব লোকেব ইচ্ছা এইৰূপে বুঝিতে পাবিযা লেনিন্ বল্‌শেভিক্‌দেব আধিপত্য সম্ভব কবিয়া তুলিলেন।

তাঁহাব অধীন সহকর্ম্মীদেব কাহাবও কাহাবও দোষে জুলাই মাসে তাঁহাব মতেব বিরুদ্ধে একবাব বিপ্লবেব চেষ্টা হয়। তখনও ঠিক সময় আসে নাই—বিদ্রোহ বিফল হইল। লেনিন্‌কে তাহাব ফলে ছদ্মবেশে আশ্রয খুঁজিতে হইযাছিল। এই অজ্ঞাতবাসেব সময তাঁহাব বিখ্যাত গ্রন্থ—The State and Revolution বচিত হয়। গ্রন্থেব দ্বিতীয় ভাগ লিখিবাব পূর্ব্বেই কিন্তু তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে ফিবিয়া যাইতে হইল।

দূব হইতেও লেনিন্ তাঁহাব বন্ধুদেব সহিত যোগ রাখিয়াছিলেন। মস্কো ও পেট্রোগ্রাড্ সোভিযেটে অবশেষে বল্‌শেভিক্‌দেব সংখ্যাধিক্য হইল। এদিকে কেবেণ্‌স্কি দেশেব শাসন-পদ্ধতি স্থিব কবিবার জন্য একটি জাতীয় মহাসভা আহ্বান কবিলেন। সমগ্র দেশে বল্‌শেভিকেবা মুষ্টিমেয মাত্র। সেই জন্য সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন তাহাদেব উপায ছিল না। লেনিনেব পবামর্শ মত বল্‌শেভিক্ নেতাগণ বিপ্লবেব চেষ্টা কবিবাব জন্য প্রস্তুত হইলেন। কেবেণ্‌স্কি ও মেন্‌শেভিক্‌দেব দুর্ব্বল হস্ত হইতে দুই দিনেব সঙ্ঘর্ষেই বল্‌শেভিকেবা সমস্ত ক্ষমতা কাড়িযা লইতে পাবিলেন। (৬ই-৭ই নভেম্বব, ১৯১৭) লেনিন্ দেশেব শাসনভাব গ্রহণ কবিলেন।

বল্‌শেভিকেবা তাহাদেব প্রতিশ্রুতি অনুসাবে কৃষকদিগকে জমি ও অধীন জাতিগুলিকে মুক্তি দিয়া নিজেদেব ক্ষমতা দৃঢ কবিযা লইল। যুদ্ধেব অবসান ঘোষিত হওযায সাধাবণ লোকে আনন্দিত হইল। দেশময সোভিযেট্ গঠিত হইল এবং তাহাদের মধ্য দিয়া অনেকাংশে শ্রমিকদেব হাতে শাসনভাব আসিযা পড়িল। ১৯১৭ সালেব নভেম্ববেব বিপ্লবেব ফলে বল্‌শেভিক্‌দেব নেতৃত্বে এক সম্পূর্ণ নূতন যুগেব এইৰূপে সূচনা হয।

শ্রীসুশোভন সবকার

বিজ্ঞানের সঙ্কট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা নতুন যুগ আরম্ভ হ'য়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা' আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন্ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বল্লে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিষ খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জান্‌তাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্পে বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য কার্য্যকরী হ'তে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ-বিজ্ঞানের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ ক'রে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক্ ও তাঁদের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকেরা, জড জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আন্‌বার চেষ্টায়, সেই রীতি ও নিয়ম-সমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড্ তাই এখনও পর্য্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়ম-কানুন যে জড পদার্থের গতিবিধিতে লাগান যেতে পারে, তা' নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সাম্‌নে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখ্‌ছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাক্‌লে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা' আগে থেকে নির্দ্দেশ করা যায় কিনা, এইটেই হ'ল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে অনুসরণ ক'রে দেখালেন যে, আকাশের গ্রহ তারকা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট-বড় সব জিনিষের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু'বৎসর বাদে কোন গ্রহের উদয় হ'বে, তা' আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে শত্রুব্যূহের মধ্যে ঠিক কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হ'য়ে পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা জড়পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এ-সব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল প্রসঙ্গের

অনুসন্ধানে প্রায় একই বকম বীতিব অনুবর্ত্তন কবেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্য হ'যেছেন।

এদিকে আবাব প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থেব গঠন ও উদ্ভব-সম্বন্ধে গবেষণা চল্‌ছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতেব আদি উপাদান নিরূপণ কবাব জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানব মন ব্যগ্র ছিল। বহুদিনেব অনুসন্ধানেব ফলে আজ বসায়নশাস্ত্র বল্‌তে সক্ষম হ'যেছে যে, বিবানব্বইটী আদি ধাতুব বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদেব নিকট প্রতীয়মান সর্ব্বপ্রকাব যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথব থেকে আবম্ভ ক'বে প্রাণীদেহেব উপাদান-সমূহ সবই ঐ আদি বস্তুগুলিব সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণ-স্বরূপ বাসায়নিক তাঁব পবীক্ষাগাবে বোজ বোজ নতুন নতুন জিনিষ তৈবী ক'বে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসাবে যে সব জিনিষ জন্মায়—কি খনিব মধ্যে, কি জীব দেহে—মানব চক্ষেব অন্তবালে প্রকৃতি যে সমস্ত জিনিষ তৈবী করে, তাদের উৎপত্তি আগে বহস্যময ব'লে মনে হ'ত। আজ সেগুলিব বিশ্লেষণ ক'বে দেখা গেছে যে, সকলেবই মূলে কেবল সেই কয়টী আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুব পুনঃ সংমিশ্রণে সেই সব জিনিষ নিজেব পরীক্ষাগাবে তৈবী কবতে মানুষ সক্ষম হ'য়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণেব নিযম খুঁজতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক পবমাণুবাদে উপনীত হ'যেছেন। আজকেব বৈজ্ঞানিকদেব সিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যতঃ কঠিন তরল বা বাযবীয সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পবমাণুব সমষ্টি; পদার্থেব কাঠিন্য, তাবল্য ও বায়ু-স্বভাব মূলতঃ পবমাণুদেব গতি ও পবস্পবেব প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণেব ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়-ভাবে উপনীত হ'বাব জন্য বৈজ্ঞানিকদেব দেখ্‌তে হ'ল, যে-নিযমে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুদেব গতিবিধি চল্‌ছে, সেই নিযম ইন্দ্রিযাতীত সূক্ষ্মশবীব পবমাণুদেব পক্ষেও খাটে কি না। বাসাযনিক বিবানব্বইটী আদি বস্তু আবিষ্কাব কবেছে, সে কথা আমি আগেই বলেছি। ঊনবিংশতি শতাব্দীব শেষভাগে, টম্‌সন, বাদারফোর্ড্‌ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকেবা গবেষণাব ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'যেছেন যে, ঐ বিবানব্বইটী আদি বস্তুও আবাব দুইটী মৌলিক উপাদানে গঠিত। তাব একটী ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন্‌, আব একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রণ্‌। প্রত্যেক বকম পরমাণুবই মূল উপকরণ এই দুইটী। যে-বিশ্লেষণে বাসায়নিক দেখিযেছিলেন যে, বিভিন্ন বকমেব জড-পদার্থেব মূলে বিবানব্বইটী আদ্য ধাতু বর্ত্তমান, প্রায সেই বকম বিশ্লেষণ কবেই আজকালকাব বৈজ্ঞানিকেবা দেখিয়েছেন যে, আদি বস্তুর পবমাণুর মূলে ঐ দুটী বিদ্যুতাণুর কল্পনা কবা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বিদ্যুৎ-কণার পরস্পর সংযোজনে ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্ন-ধর্ম্মী পদার্থের উদ্ভব হ'য়েছে, সেই যোজন-মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম-অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌর জগৎ যেমন সূর্য্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাশির সমাবেশে গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতিও তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভিতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশি। এরি চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন কক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেক্‌ট্রণ্ ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে নিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু-গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেকট্রণ্-সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর অণুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রণ্ বিরাজমান। রাদারফোর্ড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন, এবং এই গঠন-প্রণালীর ফলে যে আদিবস্তুর অনেক ধর্ম্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড় পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেক্‌ট্রণ্ ধনাত্মক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে-বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা আবার কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, যা আমাদের এ-স্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যতঃ ঘন-কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি ব'লে প্রতীয়মান হ'ল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই চিরচঞ্চল অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য বাহ্যাবস্থার কারণস্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতুযষ্টির একপ্রান্ত রাখলে আগুনের বাইরে অন্য দিকও যে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে, এর কারণ, তাঁদের মতে, অনেকটা এই ; অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্ব্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হ'য়ে উঠে ; সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশঃ ঘাত-প্রতিঘাতে বাহিরের দিকে সংক্রামিত হয়।

উত্তাপেব পবিমাণ বস্তু-অণুদেব চাঞ্চল্যেব পবিমাণ নির্দ্দেশ করে। এই ধাবণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁরা উত্তাপভেদে বস্তুব যে অবস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদেব গতিব তাবতম্য দিয়ে বোঝানোব চেষ্টা কবতে লাগলেন। নিউটনেব গতিবিজ্ঞানেব নিয়মসমূহ এই ক্ষেত্রে খাটান যায় কি-না, সে বিষয়েবও আলোচনা সুরু হ'ল এবং তাতে তাঁবা কতকটা কৃতকার্য্যও হ'লেন। এখানে অবশ্য মনে বাখ্‌তে হ'বে যে, নিউটনেব গতিবিজ্ঞান যে রকম ক'বে নক্ষত্রেব বিষয়ে লাগান গিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে সে নিয়ম-গুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পবমাণুদেব বিষয়ে লাগানো একরূপ অসম্ভব। আমবা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড বস্তুব অবস্থানেব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কবতে গেলে গণনাব জন্যে সেই বস্তুগুলিব উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দবকাব। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্ত্বেও গতি-বিজ্ঞান যে নির্দ্দিষ্ট কিছু বলতে পাবে ব'লে আমরা মনে ক'বে থাকি, সেই বিশ্বাসেব ভিত্তি মুখ্যতঃ এই—বহু কোটী সূক্ষ্ম অণুব সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড় পদার্থ। জড় পদার্থেব গুণাগুণ বিবেচনা কবতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটীব অব-স্থানেব সঠিক খবব জানা বিশেষ প্রয়োজন নয়, সাধাবণ কয়েকটীব আচবণ আমবা গতিবিজ্ঞানেব নিয়ম থেকেই বলতে পাবি, অনেক সময় উত্তাপ-বিজ্ঞানেব পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেমন একটী দেশে—যেখানে কোটী কোটী লোকেব বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনেব গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশেব আর্থিক হিতাহিত ও জন্মমৃত্যুব গড়পডতা হাবেব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত কবা যায় যেটা সাধাবণতঃ নির্ভব ক'বে সে দেশের জল-বায়ুব ও পাবিপার্শ্বিক অবস্থাব উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে আমাদেব কাজে লাগে এবং সে সকল বিষয়ে আমবা যেমন একটা হিসাব-নিকাশ খাডা কবতে পাবি, অণুসমষ্টিব গতি-বিধিব নিয়মেব গণনাও অনেকটা সেই বকম।

নিউটনেব গতিবিজ্ঞানেব নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রেব নিয়ম-কানুনেব মত অমোঘ, এই বিশ্বাসেব ফলেই বৈজ্ঞানিকেবা গ্রহ ও স্থূল জডেব বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনাব সহিত ঘটনাব সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকদেব মনে প্রথমে ধাবণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নিয়মই ঐ বকম অনতিক্রমনীয় ও অটল হ'বে। কিন্তু উত্তাপ বিজ্ঞানেব নিয়মেব বিষয়ে সে নিশ্চয়তা যে খাটে না, তা' আগেকাব কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যাবে। পবমাণু অতিক্রম ক'বে আজ যখন বৈজ্ঞানিকেবা ইলেকট্রণ্‌ ও প্রোটনেব সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড জগতকে দেখ্‌তে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত হ'বে না যে, আজ তাঁবা বিদ্যুৎতেব আদি-ধর্ম্ম থেকে যে সব জাগতিক নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসাবে, উপনীত

হচ্ছেন, সেগুলিকে আব জ্যামিতিক নিয়মেব সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসান সম্ভব নয়। ব্যবহাবিক জীবনেব পক্ষে দবকাবী কতকগুলি নিয়ম-রূপেই সেগুলিকে দেখ্‌তে হ'বে। জ্যামিতিক নিয়ম ও পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক-গুলি নিযমেব মধ্যে তফাতেব কথা পবে আবো বলাব ইচ্ছা বইল।

ইলেক্‌ট্রণ্‌ ও প্রোটন্‌ কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশবীব পরমাণুদেব বঙ্গস্থল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পবমাণুবাদীদেব ধাবণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-গোলকেব আয়তন ও আকৃতি যেমন আমবা ভাবতে পাবি, অতি ক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিযাতীত পবমাণুদেব কিংবা আবো ছোট প্রোটন্‌ বা ইলেকট্রণেব আয়তন ও আকৃতিও আমবা সেইরূপে কল্পনা কবতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পবমাণুব ভিতবকাব বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশেব ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলিব আকৃতিব এবং আয়তনেব অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূবত্ব এত বেশী যে, জগতেব কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থবিক্ত আকাশক্ষেত্রেব কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকেব ধর্ম্ম অনুশীলন করতে গিযে বৈজ্ঞানিকেবা দেখলেন যে, আলোককে এই আকাশপথে বহমান তবঙ্গ বিশেষ ব'লে ভাবলে এই শাস্ত্রেব অনেক সমস্যাব সদুত্তব মিলে যায়। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথম থেকেই এই ধাবণা তাদেব মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেলো যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথাব-নামে একটা বিচ্ছেদহীন, অখণ্ড পদার্থ। পবমাণু বা বিদ্যুৎকণা সেই ঈথাব-সমুদ্রে ভাসমান। আলোকবশ্মি এই ঈথাব-সমুদ্রেব তবঙ্গ বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোটবড নানা বকমেব ঢেউ উঠতে পাবে, এবং সকল ঢেউ বিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্র গতিতে ধাবমান। আলোব বর্ণভেদেব কাবণ ঢেউএব দৈর্ঘ্যেব তাবতম্য। যে-সকল ঢেউএব স্পন্দন আমাদেব দর্শনেন্দ্রিযে আলোকজ্ঞান উৎপাদন কবে, তাদেব চেয়েও অনেক বড ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেবা আবিষ্কাব কবেছেন। ঈথাবে তবঙ্গ উত্তোলন কববাব বহস্যেব অনেকটা আজকাল মানুষেব আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশ পথে যে বেতাবে নিমেষেব মধ্যে এক স্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূবে মানুষেব খববাখবব যাচ্ছে, সেই কার্য্যে বার্ত্তাবহ ঈথাবেব ঢেউ। এগুলি আলোকেব ঢেউএব চেযে অনেক বড়। পক্ষান্তবে যে বঞ্জনবশ্মি আজকাল বোগনিদানেব জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ওই ঈথারেব তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোব ঢেউএব তুলনায় অনেক ছোট।

এক পবমাণু ও অপব পবমাণুব মধ্যে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তাবকা ও পৃথিবীব মধ্যে অপবিমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথাব সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত ক'বে বেখেছে। ঈথাব-তবঙ্গেই আমাদেব কাছে চন্দ্র তাবা

নীহাবিকা হ'তে আলো আসছে। এই পথেই আমবা স্বর্য্যেব কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনেব বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, যে-শক্তিব বিকাশ ও অপচয় আজ আমবা মানুষেব নানা ক্রিয়াকলাপে দেখ্‌ছি, সে-সমস্তেবই মূলে হচ্ছে ঈথাব-পথে আনীত সূর্য্যেব কিবণরাজি। আলোক তবঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীব ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ'বে বাঁধছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথাব-তবঙ্গেব সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন্‌-ইলেক্‌ট্রণেব পবস্পব আকর্ষণ-বিকর্ষণেই যে জগতেব বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন-ধর্ম্মী জডেব বিকাশ হ'য়েছে ও তাব লীলাখেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থবিজ্ঞানেব মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাতের ও আকর্ষণ-বিকর্ষণেব মূল সূত্রগুলিব অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানেব যে-ক্রমোন্নতিব ও বিকাশেব কথা বলেছি, তা নিউটন্‌ থেকে আবম্ভ ক'রে এই বিংশ শতাব্দীব প্রথম পর্য্যন্ত মানব-প্রতিভার অক্লান্ত পবিশ্রমেব ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যেই নিউটনেব অনুসবণ ক'বে গণিতকাবেবা গতিবিজ্ঞানেব চূডান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ওই গতিবিজ্ঞানেব সাহায্যে নিবাকরণ কবতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। ফলে তাদেব মনে এই ধাবণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি নিউটনেব গতিবিজ্ঞানেব অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনেব নিয়মেব যে ব্যতিক্রম হ'তে পাবে, তা তাঁবা ভাবতেই পাবতেন না। তাঁবা মনে কবতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রেব সমস্যার যে দু-একটিব উত্তব তখনো মেলেনি, তাব জন্য তাঁদেব গণনাব অক্ষমতাই দায়ী,—নিয়মগুলি কিন্তু সর্ব্বকাল ও সর্ব্ববিষয়েই প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই জন্যেই তাঁবা পদার্থবিজ্ঞানেব নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনেব মাধ্যাকর্ষণেব নিয়মেব মত ধ্রুব মনে কবতেন এবং ভাবতেন, নিযমমাত্রেই ওই একই পর্য্যায়েব অন্তর্গত। ক্রমশঃ যখন পবমাণুবাদ ও ইলেক্‌ট্রণ্‌বাদেব উদ্ভব হ'ল, যখন উত্তাপবিজ্ঞানেব নিয়ম-সমূহ আগেকাব নিযমকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্য্যাযেব ব'লে তাঁবা দেখতে পেলেন। তখন ওই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে-বিষযে চিন্তা করতে সুরু কবলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে, বিশেষ কবে, এই সব কথাগুলি আলোচনা কববাব দবকাব হ'ল। আলোকবিজ্ঞানেব চর্চ্চা কবতে কবতে বৈজ্ঞানিকেবা তখন উভয়সঙ্কটে এসে পড়লেন। অন্য ক্ষেত্রে পরীক্ষাব ফলে যে-সব নিয়মেব সত্যতা সম্বন্ধে তাঁবা নিঃসন্দেহ ছিলেন, আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিযে তাঁবা যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত

হ'লেন, সেগুলি পরীক্ষার ভুল ব'লে সাব্যস্ত হ'ল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান-অনুসারে আলোকতরঙ্গের সহিত পরমাণুদের ঘাতপ্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে, তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে ১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum theory বা শক্তিকণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটি বলতে গেলে ব্যাপারটি এই। যদিও আলোক-বিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্ল্যাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু আলোকতরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টিকালে পরমাণুর কার্য্যশক্তি ঈথারে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। আলোকপথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোকরশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান-প্রদান ঘটে, তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায়না। সেই সময়ে বরং আলোক শক্তিকণার সমষ্টি, এইভাবের একটি কল্পনার দরকার হয়।

যেমন রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে হ'য়েছিল, আলোকের উৎপত্তি ও আলোকরশ্মি থেকে জড়পদার্থের শক্তি আকর্ষণের ধর্ম্ম বিচার করতে গিয়ে তেমনি আলোককণাবাদে উপস্থিত হ'তে হ'ল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোককণার সমষ্টি, এইটিই Quantum theory-র মূল কথা। আলোকের স্পন্দন-সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে; এবং জড়ের পরমাণু কিংবা ইলেক্‌ট্রণ্‌ যখন আলোক থেকে শক্তি আহরণ করে তখন আলোক থেকে এই একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, জড় পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তি অর্জ্জন করে, একএকটি আলোককণা উদ্ভূত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের একেবারে পরিপন্থী। নিলস্‌ বর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গত কয়েক বৎসর চেষ্টা করছেন, কি ক'রে এই আলোককণাবাদের সহিত পূর্ব্বযুগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হ'বে।

আলোকবিজ্ঞানের উভয় সঙ্কটের কথা মুখ্যত এই ঃ— আলোকের প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যে-সব প্রশ্ন ওঠে, সেগুলির সমাধান তরঙ্গবাদেই মিলে; এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে, আলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কণাবাদই

এ-ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সুচারুরূপে দিতে সমর্থ। তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলেনা। গত চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার বিদ্যুৎকণার বিষয়ে কতকগুলি নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি; তার ফলে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠেছে। ইলেক্‌ট্রণ্‌কে যদিচ আমরা স্বল্পায়তন কণারূপে কল্পনা ক'রে আসছিলুম, তবু টমসন-গারমার-প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন যে, সময়-বিশেষে ইলেক্‌ট্রণের স্রোতকে তরঙ্গ-ধর্ম্মী ব'লে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময়-বিশেষে বিচ্ছুরিত হ'য়ে বর্ণচ্ছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেক্‌ট্রণের স্রোত অনেক সময়ে সেইরূপভাবে জড়পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে একটা বিপ্লব হ'য়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মত কল্পনা করা চলবেনা। যাকে এতদিন অত্যল্পায়তন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা ব'লে ভেবে আসা যাচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোক-তরঙ্গকে ঢেউ সমষ্টি ব'লে কল্পনা করলে ভুল হ'বে, কারণ অনেক সময়ে সেটি ঠিক জড়ের মত কণাসমষ্টিরূপেই ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারৎ খাড়া করা হ'য়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরী করার ন্যায়-সঙ্গত প্রয়াস, সে-বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ও সময়-নির্দ্দেশ-সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ, এই মাপজোপের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; আমরা যখন সেগুলির মাপজোপ করি তখন কি কি প্রচ্ছন্ন জিনিষকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা হ'ল বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায়, নিত্যনতুন আবিষ্কারের লালসায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত জিনিষকে বিশেষ বিচার না ক'রেই ধ'রে নেওয়া হ'য়েছিল, এখন বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো ক'রে বোঝাপড়া করতে। এই বোঝাপড়ার বিষয়ে পরে কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

শিল্পীর ব্যথা

ইউবোপেব এক বিখ্যাত শিল্পাগাবে চিত্রকবেব চিত্রশালাব একটি আলেখ্য আছে। শিল্পীব আঁকা নানা আকাবেব নানা চিত্র দেওয়ালে ইতস্ততঃ ঝোলান। সকলগুলিব বিষয় ভাল বোঝা যাচ্ছে না। উঁচু খোলা জানালা থেকে আলো এসে ঘবখানি আলোকিত। চিত্রাধাবেব উপরে একটি যুবতীব অসমাপ্ত চিত্র। নিম্নেব প্রত্যঙ্গগুলি অতি যত্নেব সহিত আঁকা ও সেগুলিব সৌন্দর্য্য ক্লাসিক্ গ্রীক্ ভাস্কর্য্যেব মত নিখুঁত। মুখখানি আঁকতে আবম্ভ কবা হ'য়েছে, অতি নিপুণ হাতেব টানে মুখেব রেখা-চিত্রখানি টানা, ছ'চাবটি বর্ণেব আঁচডও দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু চিত্রকব যা ফোটাতে চাচ্ছিলেন, তা পাবছেন না। তাই হতাশ হ'যে তুলিটি ফেলে দিযেছেন। তিনি গভীব অবসাদ-ভবে একটি চৌকিব উপব বসে পডেছেন, অবিন্যস্ত হাত-পাযেব ভঙ্গীতে নিবাশা ফুটে উঠেছে। চোখছুটি মুদ্রিত। খোলা জানালা দিয়ে সোনালী আলোর স্রোতে কলালক্ষ্মী প্রবেশ কবছেন। আলোব স্রোতে তাঁব স্বচ্ছ অবয়ব ও স্ফুবিত বসনেব প্রান্ত ঈষৎ বোঝা যাচ্ছে ; মুখে গভীব অনুকম্পা, চাঁপাব কলিব মত দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলিব প্রান্ত দিযে তিনি শিল্পীব ললাট স্পর্শ কবছেন ও ফলে মুদ্রিত-নয়ন শিল্পীব মুখেব উপব একটি গভীব আনন্দ ও সাফল্যেব জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত। এদিকে শিল্পীব সর্ব্বদেহে অবসাদ ও নিবাশাব ছাপ। চিত্রখানিব চমৎকাব শিল্প-চাতুর্য্যে মুগ্ধ না হ'য়ে থাকা যায় না। পূর্ব্ব সৃষ্ট চিত্রগুলি শিল্পীকে ঘিবে বয়েছে, অথচ সেগুলি তাঁব কাছে সুদূব ও অস্পষ্ট। তাঁব চোখেব সামনে ভাসছে চিত্রাধাবেব উপব ওই যুবতীব অসম্পূর্ণ চিত্রখানি। চিত্রের পশ্চাতে কোন পটভূমি নেই, তুলনাব অন্য কোন বস্তুই নেই, স্রষ্টা ও দর্শকেব সমস্ত মন অধিকাব কবে শূন্যেব উপব এই বৃন্তহীন সৌন্দর্য্য-শতদলটি বিকশিত। যতটুকু আঁকা হ'য়েছে তাব অঙ্কন-চাতুর্য্য একেবাবে নিখুঁত। গোল বেধেছে আননশ্রীব উপব ভাব-ব্যঞ্জনা কবতে গিয়ে। কেবল শাবীবিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলা শক্ত কথা নয় কিন্তু শিল্পী চাচ্ছেন মুখেব উপব এমন একটি ভাব ফুটিয়ে তুলতে যাতে যেভাবেব স্রোতে এই সৌন্দর্য্য-কুসুমটি ভেসে এসেছে, তাব গতি প্রকাশ পায়। যেটিকে অবলম্বন ক'বে এই সুন্দবীর বিচিত্র জীবন গন্ধে-বসে-ভোগে-আনন্দে-ব্যথায় পূর্ণ হ'যে উঠেছে, সুন্দবীব জীবনেব সেই মূলসূত্রের সন্ধানে শিল্পী বেবিযেছেন। তিনি মানুষেব মনে সেই কুহকদণ্ডটি ছোঁয়াতে চান যাতে তাব যুগযুগান্তব্যাপী সুপ্ত অতৃপ্ত বাসনাবাশি মুহূর্ত্তে জেগে উঠে, শিবায় শিবায়, প্রতি বক্তকণিকায়, জীবকোষেব অন্তবতম অন্তঃপুরে, আনন্দ-

বেদনেব তীব্র শিহবণ আনে। হায়! দুঃসাহসী শিল্পীব আকাঙ্ক্ষা তাকে কোন শান্তিময় অধিত্যকা থেকে কোন দুবাবোহ বিপৎসঙ্কুল শৈলশিখবে তুল্‌লে। আশ্চর্য্য কি যে, শিল্পী গভীব নিবাশায় তুলিকা ত্যাগ কবেছেন।

একটি ক্ষুদ্র নাবীমূর্ত্তি আঁকতে গিয়ে শিল্পী অজ্ঞাতে কোন বহস্য-সঙ্কুল বাসনাব, নিবাশাব, গভীব তৃপ্তিব, অসীম তৃষ্ণাব বাজ্যে, অন্ধকাব স্বপ্ন-পথে কোন তীব্র আনন্দেব ও তীব্রতব যন্ত্রণাব মধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছেন। শিল্পীব সুদীর্ঘ অন্তব জীবনেব যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাব ও আনন্দ-বিষাদেব সবোবরে সৌন্দর্য্য-শতদলটি ফুটেছে, এই ক্ষুদ্র নাবী মূর্ত্তিটিব ছোট মুখেব উপব তার বৈচিত্র্য, তার স্বাদ, তাব উন্মাদনা, কি ক'বে তিনি ফুটিয়ে তুলবেন? নিবাশা, অবসাদ ত আসবেই। বসায়নশাস্ত্রে বলে, বিভিন্ন গ্যাসেব সমবায় মাত্র-একটি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে নিমেষে এক নূতন পদার্থে পবিণত হয়। মনবাজ্যেও এমনই একটা কিছু বিপ্লব ঘটে। তাকে মানুষেব অক্ষম ভাষায় বলে দৈব-প্রেবণা। এই বিপ্লব-মুহূর্ত্তে কত জন্ম সঞ্চিত, কত ভিন্ন স্থানে আহৃত সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, কল্পনা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা একীভূত হ'য়ে একটি অখণ্ড, গভীব, ব্যাপক আনন্দানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয় ও এই আভ্যন্তবিক প্রলযেব বিজলী-ঝলকে এইরূপ আনন্দময়ী মূর্ত্তিব অবভাস হয়। এই অবভাস যেমনই আকস্মিক তেমনই তীব্র ও ক্ষণিক। কিন্তু এ-মূর্ত্তি শিল্পীব অন্তবে অগ্নিবেখায় ক্ষোদিত হ'যে যায, এব স্পর্শে তাব অন্তঃপ্রকৃতিব আমূল পবিবর্ত্তন হয়। একটা নূতন আলোকে জগৎ মণ্ডিত হ'যে ওঠে, একটা অব্যক্ত উন্মাদনায় শিল্পীব শান্তি নষ্ট হয়। শত সহস্র পূর্ব্ব-জীবনেব আনন্দ-বেদনা এক মুহূর্ত্তে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে একটা মধুব অব্যক্ত তীব্র অবর্ণনীয় স্মৃতি বেখে মিলিযে যায। এই অনুভূতি এমনই তীব্র ও এমনই ক্ষণিক যে, শিল্পী সাবা জীবন তাব মোহ ভুলতে পাবেন না, চিবকাল চেষ্টা কবেন তবুও আব সে অনুভূতি ফিবে পান না, কিন্তু চেষ্টাবও বিবাম থাকে না। ব্যর্থতাব আক্রোশে, নূতন উদ্যমে নব নব শিল্প সৃষ্টি ক'বে চলতে থাকেন কিন্তু সর্ব্বদাই ব্যর্থ হন। লক্ষকোটি বৎসব ধ'বে, যুগযুগান্ত ব্যেপে জন্ম-মৃত্যুব ছন্দে আবর্ত্তন কবতে কবতে শিল্পী কণায় কণায়, বেখায় বেখায় যে সৌন্দর্য্য যে সৌষ্ঠব-জ্ঞান আহবণ ক'বে এসেছেন, প্রাণেব উৎসে বিন্দু বিন্দু ক'বে যে তিক্ত-মধুব অভিজ্ঞতায় জীবনেব গাগবী ভবেছেন, আজ তাঁব অস্তিত্বেব চবম মুহূর্ত্তে সেই সকল সঞ্চয়, সেই সকল কল্পনা একীভূত হ'যে এই কল্প-লোক-দুর্লভ সৌন্দর্য্যেব, আনন্দেব বিদ্যুৎ-বিলাস-রূপে আত্মাব অন্তঃস্থলে চমকিত হ'ল। একটি মুহূর্ত্তে তাঁব চিবকালেব আকাঙ্ক্ষাব নিবৃত্তি, তাঁব জন্মজন্মান্তবেব তৃষ্ণাব পবিতৃপ্তি হ'ল। মুহূর্ত্তেব জন্য তাঁব মানসনয়ন ঝল্‌সে গেল, মনে হ'ল যেন তাঁর আত্মা

পবম চবিতার্থতা লাভ কবেছে। তাবপরই মনে হ'ল এই মুহূর্ত্তটি ত নিমেষে মিলিয়ে গেল্! এই পবম মুহূর্ত্তটিকে ধ'বে বাখবাব, ও সুদীর্ঘ ক'রে চেখে' চেখে' ভোগ কববাব ইচ্ছা হ'ল;—চেষ্টা করলেন,—শিল্পীব এই নিবাশা ও অবসাদ তাবই ফল। শিল্পী যদি যথার্থ বসজ্ঞ না হ'তেন তাহ'লে হয়ত তুলিকাব কযেকটি পদ্ধতিসম্মত টান দিয়ে চিত্রখানি সম্পূর্ণ করতেন ও মানবসাধাবণ হয়ত সেই শিল্পকীর্ত্তিব প্রশংসায় মুখব হ'যে উঠত। তিনি যথার্থ শিল্পী বলেই এমন গোঁজামিল দিযে লোক-সমাজকে ঠকাতে চাননি—চিত্রটিও সম্পূর্ণ হয নি। কলালক্ষ্মীব আবির্ভাব ও ভক্তের ললাটে স্নেহককণ স্পর্শেব দ্বাবা সেই পবম মুহূর্ত্তটিব পুনকদ্বোধনেব ভিতব বোমান্টিক্-সম্প্রদায়-সুলভ একটা খেলো ভাব-প্রবণতা আছে। থাক্, শিল্পীব এই দুর্ব্বলতায আমাদেব ভিতবেব বসলোলুপ মানুষটি ববং সায দেয়, আমাদেব একটু ভালই লাগে। এই দুর্ব্বলতাটুকু না থাক্‌লে শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে হয়ত চিত্রখানিতে খুঁত থাকত না, কিন্তু রসসৃষ্টিব হযত একটু হানি হ'ত।

শিল্পীব জীবনে দৈবপ্রেবণাব সেই পবম অনুভূতিটি ত মুহূর্ত্তেই আসে ও মুহূর্ত্তেই যায, কোন চেষ্টাতেই তাকে আর ফিবিযে আনা যায় না। বড জোব তাব একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, একটি বর্ণহীন ছাযা মাত্র পাওয়া যায, এবং শুধু শিল্পীই অনুভব কবে এগুলি কত অপ্রাকৃত, কত অসত্য। কোনরূপেই এই অবর্ণনীয স্বপ্নসুন্দব মুহূর্ত্তটিব, এই বিচিত্র তীব্র অলৌকিক অনুভূতিব চিত্রটিকে স্থায়ী কবা যায় না—যাতে তাকে চেখে' চেখে' ভোগ কবা বা বিশ্লেষণ কবা চলে। যুগ-যুগ-ব্যাপী বিবর্ত্তনেব পথে এই বিপুল বিশ্ব শিল্পীকে যত প্রকারে স্পর্শ করেছে, আহ্লাদে বিকশিত কবেছে, সঙ্গীতে মুখব ক'বে তুলেছে, বসে সিঞ্চিত কবেছে, আনন্দে অনুপ্রাণিত কবেছে, এই একটি মুহূর্ত্তেব অনুভূতির উত্তাপে সে সমস্তই যেন দ্রবীভূত হ'য়ে, বিশ্বেব ও শিল্পীব অন্তবাত্মাব নিবিডতম মিলনে বিজলীচপল একটি অপূর্ব্ব অখণ্ড আনন্দেব আবির্ভাব হয়। ক্ষণপ্রভাব মতই মুহূর্ত্তটি মিলিয়ে যায় এবং বিশ্বজগৎ ও শিল্পী আবাব পূর্ব্বেব সহজ অবস্থায় ফিবে আসে। বিশ্বজগতেব উপব কিন্তু একটা অপূর্ব্ব আলোকেব আভা থেকে যায ও শিল্পীর মনে সেই পবম মুহূর্ত্তটি ফিবে পাবাব জন্য একটা দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা সমস্ত যুক্তি-বিচাবেব বাধা অবহেলা ক'বে জেগে উঠে। শিল্পী বোঝেন যে, সে মুহূর্ত্তটি ফিরে পাওয়া যাবেনা, কিন্তু আত্মাব ক্ষুধা ত বুদ্ধিব ভ্রূকুটিতে মিটেনা। অবুঝ শিল্পী সহস্রভাবে, সহস্র দিক্ দিযে সেই আনন্দ ফিবে পেতে চেষ্টা কবেন—চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নানা শিল্পে সেই দুর্লভ লাভেব চেষ্টা ফুটে উঠে। হয়ত সে আনন্দেব দুই-একটি রশ্মি ক্ষণেকেব জন্য

পূর্ব্বস্মৃতি জাগিযে তোলে, কিন্তু সে ক্ষণেকেব জন্যই। এই সকল ব্যর্থ প্রয়াসের উপেক্ষিত নিদর্শনেই পৃথিবীব শিল্পাগাবগুলি পূর্ণ।

দৈবানুপ্রেবণাব পবমানন্দময় মুহূর্ত্তটি যে ফিবে পাওয়া যায় না, এ দুঃখ সকল প্রকৃত শিল্পীব অদৃষ্টেই অবশ্যম্ভাবী। এ দুঃখ যে কি, তা' যিনি ওই আনন্দেব মধুব তীব্রতা ভোগ কবেননি, তাঁব পক্ষে বোঝা শক্ত। সুধায ভরা স্নিগ্ধ পাত্রটি কে যেন ওষ্ঠাধবে তুলে দিয়েছে, একটি চুমুকে চিরজীবনেব সকল অতৃপ্তিব যেন অবসান হ'যে গেল, আব তাবপবেই কোন নিষ্ঠুব দুর্দ্দৈব নির্ম্মম হস্তে সেটি চিবকালেব জন্য অপসাবিত কবলে। সে-সুধাব আস্বাদ এখনও ওষ্ঠাধবে লেগে বযেছে, আব একটি চুমুকেব জন্য অন্তবাত্মা উন্মুখ, কিন্তু প্রাণপাত ক'বেও কেবল তাব স্বাদহীন বিকাব ছাডা কিছুই মেলে না। কি অসীম ব্যথা, কি গভীব যন্ত্রণা! এ-ব্যথায সমবেদনা মেলে না। যে এই সুধাব আস্বাদ না পেয়েছে সে ব্যতীত এ দুঃখ কে বুঝবে? শিল্পীব ব্যর্থ প্রযাসেব নিদর্শনগুলিকে নির্ব্বোধ মানব যতই প্রশংসা কবে, শিল্পীব ব্যথা ততই বেডে যায়। এ কি অভিশাপ প্রতিভাব প্রতি!

আকাঙ্ক্ষিত অনুভূতি ফিবে পাওয়াব প্রয়াসে, শিল্পী অনেক সময় তাঁব অন্তবেব মর্ম্মস্থলে আঘাত দেন ও নব নব অনুভূতিব আনন্দ লাভ কবেন; হয়ত পূর্ব্বানুভূত আনন্দেব মতই এটা গভীর ও ব্যাপক, প্রতি অনুভূতিটিই নূতন, কিন্তু পুবাতনটি অন্তবেব মধ্যে বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত কবে আব জেগে ওঠে না।

শিল্পীবা আপনাপন শিল্পসৃষ্টিব মূল্য বোঝে না ব'লে দোষ দেওয়া হয়। শিল্পসৃষ্টিগুলি অন্তবেব প্রতীতিব বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এবং শিল্পীবা এগুলিকে তাঁদেব অন্তবেব অনুভূতিব দিক্ দিযেই দেখেন। জনসাধাবণ ও সমালোচকেবা এই শিল্পসম্পদ্ থেকে যে আনন্দ আহবণ কবেন, তাবই অনুপাতে এগুলির বিচাব কবেন। এ দুই বিচাব সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, স্রষ্টা-শিল্পীব ও বসবিৎ সমালোচকেব ভাষা যেন বিভিন্ন, দুজনেব পবস্পবকে বোঝা একরূপ অসম্ভব ব'লেই বোধ হয়। নিজেব যে-সব সৃষ্টি দৈবানু-প্রেবণাব পবমানন্দেব একটুকুও তাঁব মনে জাগায়, শিল্পী সেইগুলিকেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে কবেন। অথচ এগুলি দেখ্‌লে সমালোচকেব মনে হয়ত সেরূপ কোন আনন্দই জাগে না। ভুল-বোঝাব প্রতিকাব আছে, ভুল-অনুভূতিব, ভুল-প্রতীতিব কোন প্রতিকাব নেই; সকলেব চিত্তেব অনুভূতিশক্তি ত সমান নয়।

চিন্ময় আনন্দেব এই পবম অনুভূতিকে বাইবে প্রকাশ কবতে গিয়ে, লোকসাধাবণকে তাব আস্বাদ দিতে গিয়ে শিল্পী যে কেবলমাত্র সেই পবম মুহূর্ত্তগুলি ফিরে পেতে পারেন না ব'লে দুঃখ পান তাই নয়, বহিঃপ্রকাশেব

জন্য যে-সকল উপকবণ-সামগ্রীব ব্যবহাব অনিবার্য্য সেগুলিও তাঁব দুঃখেব কাবণ হ'য়ে উঠে। জন্মজন্মান্তবেব সঞ্চিত সৌন্দর্য্য ও আনন্দেব বিচ্ছিন্ন অংশগুলি এক মুহূর্ত্তে একত্রে মিলে, গ'লে গিয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছাস সৃষ্টি কবে, তাকে সাধাবণ ব্যবহাবিক জীবনেব অগভীব অভিজ্ঞতাব ভাষায় প্রকাশ কবা শক্ত। শিল্পশাস্ত্রেব পবিভাষায়, সঙ্গীতেব সুবে, চিত্রেব স্থিব বেখা-বেষ্টনে, নৃত্যেব চপল রেখাব হিল্লোলে সেগুলিকে প্রকাশ কবতে যাওয়া, দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিব বস্তুকে একত্রে সমাবেশ কবাব প্রযাসের মত একরূপ অসম্ভব, অথচ এই অসম্ভবকেই শিল্পী সম্ভব কবতে চান। এব ফল কি কখনও শিল্পীর পক্ষে সন্তোষকব হ'তে পাবে ?

প্রেমাস্পদেব প্রতি প্রেমিকেব মনেব ভাবটি, সেই আনন্দ, গর্ব্ব, তৃপ্তি, ব্যাকুলতা, বেদনা, আশা, নিবাশার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ কি কোন্ কবি, কোন চিত্রকর, কোন সঙ্গীত-বচযিতা প্রকাশ কবতে পেবেছেন ? প্রেমাস্পদেব স্পর্শটিব মধ্যে কি মোহ আছে—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পবিমূঢেন্দ্রিয়গণো
বিকাবৈশ্চৈতন্যং ভ্রমযতি চ সংমীলয়তি চ ॥

এই অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় ভাবটিকে ভাষায় প্রকাশ কবতে গিয়ে কবি নিষ্ফল কাতবতায় ব'লে উঠেন—

Ce qu'on dit, c'est si vide
Je cherche, je cherche un moyen
J'ai besoin de exprimer, d'expliquer, de traduire
On ne sent tout a fait que ce qu'on a su dire
On vit plus ou moins a travers des mots
J'ai besoin de mots, d' analyses
Il faut, il faut que je te dise
Il faut que tu saches　　Mais quoi!
Si je savais trouver des choses de poete,
en-dirai-je plus—reponds—moi—
que lorsque je te tiens ainsi, petite tete,
et que cent fois et mille fois
je te repete eperdument et te repete
Toi! Toi! Toi! Toi!

মানুষেব ব্যবহাবিক জীবনেব প্রয়োজন-সাধনেব জন্য সৃষ্ট ভাষা প্রেমেব মত সাধাবণ অনুভূতিকে প্রকাশ কবতে গিয়ে যদি এমনই বিফল হয়ে আসে, তবে দৈবানুপ্রেবণাব মত বিবল অথচ সহস্র মানবীয প্রেমেব অপেক্ষা তীব্র, কেন্দ্রীভূত আনন্দস্ফুলিঙ্গকে প্রকাশ কবতে গিয়ে তাঁব বিফলতা

গভীব নিবাশায় পবিণত হবেই! এই পবম মুহূর্ত্তে শিল্পী তাঁব পার্থিব প্রকৃতি ও আবেষ্টনকে অতিক্রম ক'বে অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে উপনীত হন।

এই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তটিকে প্রকাশ কবতে গিযে শিল্পীকে যে-সকল উপাদানেব সাহায্য নিতে হয, তাদেব স্থূল সীমাবেখাগুলিকে না মেনে উপায় নেই। চিত্রকবকে আলোক-বিজ্ঞানেব নিযম, বর্ণ-বিশ্লেষণ ও সংযোজনের নিযম ভাল বকম জানতে হয, বেখা-প্রক্ষেপেব দক্ষতা অর্জ্জন কবতে হয় ও সহস্র ছোটখাট কৌশল আয়ত্ত কবতে হয। এই সকল ক্ষুদ্র বিষযে দক্ষতা অর্জ্জন কবতে গিয়ে প্রচুব শক্তির অপচয কবলে, শিল্পীব সৌন্দর্য্য-স্বপ্নভোগেব আনন্দ ও তন্মযতাব আব কি অবশেষ থাকে? ফলে সৌন্দর্য্য-স্বপ্নবিভোব অপার্থিব সুকুমাব শিল্পীকে জগৎ চেনে না, চেনে ব্যবহাবিক জগতেব স্থূল, বিজ্ঞানদক্ষ, সুচতুব, কৌশলী কারুকে। শিল্পীব জীবনে এটা একটা বিরাট দুঃখ—তাঁব সৌন্দর্য্যানুভূতিব পবম মুহূর্ত্তগুলি ফেবে ত না-ই, তাব যে অস্পষ্ট প্রতিচ্ছাযা, ক্ষীণ স্মৃতিটি থাকে তাকেও বাইবে আকাব দান কবতে গেলে এতগুলি অপ্রত্যাশিত স্থূল বিদ্যায় পাবদর্শিতা প্রয়োজন যে, তাঁর সুকুমাব শিল্পী-প্রকৃতি তাব ছাপে নিঃসন্দেহ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয। জার্ম্মাণ চিত্রকব ড্যুবাব নির্দ্দোষ বেখা-ঙ্কনেব উপর অতিবিক্ত মনোযোগ দিযে প্রতিভার কতখানি অপচয় কবেছেন তাঁব চিত্রেব ভাব-ব্যঞ্জনাব স্ফূর্ত্তিব অভাবে তা' প্রকাশ পায। যান্ত্রিক কৃতিত্বেব সাধনা প্রতিভাবান শিল্পীব প্রতিভাব উৎসমুখে একটা জগদ্দল পাথর-রূপে চেপে থাকে, তাব ক্ষমতাকে পঙ্গু ক'বে বাখে। কাজে কাজেই শিল্পী যা' উপলব্ধি কবেছেন তা' ত প্রকাশ কবিতে পাবেন না-ই, সে উপলব্ধির যে অস্পষ্ট প্রতিচ্ছাযা তাঁব স্মৃতিপটে আছে তাকেও বাইবে আকাব দিতে পাবেন না, বাইবেব স্থূল উপকবণগুলি যা' প্রকাশ কবতে সক্ষম তাই তিনি তাঁব প্রতিভাব বঙে বাঙিযে প্রকাশ কবেন। দুর্ল্লভ অনুভূতিব, দুরূহ সাধনাব কি শোচনীয় পবিণতি! শিল্পীর এ-ব্যথাব কি পবিমাণ আছে! নানা দেশেব শিল্পাগাবে যে অমূল্য শিল্প-সম্পদ্ সঞ্চিত বয়েছে, সেগুলিতে শিল্পীব সৌন্দর্য্য-স্বপ্নেব কোন নিদর্শনই পাওযা যায় না, পাওয়া যায় শুধু শিল্পেব অনাবিল আধ্যাত্মিক প্রকৃতিব উপব নির্ম্মম জড়-প্রকৃতিব নিষ্ঠুব দৌবাত্ম্যের পবিচয়। যাঁদের সৃষ্টি এগুলি, তাঁবা যে এগুলিকে অবহেলাব চক্ষে দেখেন তাতে আব আশ্চর্য্য কি! এগুলি ত তাঁদেব মানস নযনেব পবিপূর্ণ সৌন্দর্য্যেব প্রতিকৃতি নয়, তাঁবা যা' প্রকাশ কবতে চেযেছিলেন তা' নয, এগুলি শুধু বাইবেব বর্ণ, পট, পাথব বা সুব, তান, লয যেটুকু প্রকাশ কবতে পাবে সেটুকুবই নিদর্শন। শিল্পী এ দুইএব

পার্থক্য ভালই বোঝেন, তাই যা' প্রকাশ করতে পারেন না, কতকগুলি সাঙ্কেতিক ভঙ্গীর দ্বারা তার নির্দ্দেশ করেন। অবনত-জানু পূজারিণীর উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষু-তারকা, প্রেমিকের নয়নের আনন্দজ্যোতিঃ, আনম্র-শিরঃ নিবেদিতা—এ সকল ভঙ্গী কি দর্শকের মনে ভক্তির শান্ত গভীর আনন্দ, প্রেমের বিদ্যুন্ময় উন্মাদনা, বা আত্মনিবেদনের অসীম পরিতৃপ্তি জাগিয়ে তোলে ? এগুলি কেবল চিরকাল-সম্মত সঙ্কেতে পরিণত হ'য়েছে। এই সকল সঙ্কেতের পূর্ণ অর্থ, "ফ্রি-মেসন"-সম্প্রদায়ের গূঢ় সঙ্কেতের মত, শুধু তাঁরাই বোঝেন যাঁরা এই তীব্র আনন্দ উপলব্ধি করেছেন, যাঁদের অন্তরাত্মা এই অগ্নিদীক্ষায় পূত ও পবিশুদ্ধ।

নিজের শিল্পসৃষ্টিগুলি, শিল্পীর নিকট, তিনি যা' প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার অতি অক্ষম অনুবাদ, অনেক সময় হয়ত ব্যঙ্গ ব'লেই বোধ হয়। কিন্তু তথাকথিত রসজ্ঞদের হাতে এই সকল শিল্প-সৃষ্টির সমাদর (বা নিগ্রহ) শিল্পীর কাছে নিদারুণ যন্ত্রণার কারণ হ'য়ে উঠে। তিনি যে বিপুল পুলক অনুভব করেছেন তাকেই মূর্ত্তি দিতে চান ও সাধারণের মনে সেই সুরের প্রতিধ্বনি তুলতে চান, কিন্তু ভিন্ন মানুষের মন এমনই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত যে, এই প্রতিধ্বনি অনেক স্থলে শিল্পীর বিস্ময় ও বিরাগই উৎপাদন করে। সাগরকূলে সূর্য্যাস্তের চমৎকার ছবিটি আঁকতে গিয়ে শিল্পীর মনে হয়ত দিবাশেষের ক্লান্তিহারা শান্তির ও ঘনায়মান আঁধারের গম্ভীর রহস্যাকুল মোহের ভাবটি পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু অস্তাচলের প্রান্তে সূর্য্যের লোহিত চক্রটি দেখে নানা লোকের মনে নানা স্মৃতির উদয় হ'য়ে থাকে যা' শিল্পী কখনও ভাবেন নি—প্রেমিকের মনে হয়ত প্রিয়তমার নির্ম্মল ললাটের সিন্দূর-বিন্দুটি, সৈনিকের মনে হয়ত মৃত্যুদ্গীরণকারী কামানের মুখের রক্তবর্ণ গোলা ও পাচকঠাকুরের মনে হয়ত বা অগ্নিকুণ্ডের উপরস্থ উত্তপ্ত পাকপাত্র বিশেষটি। কোন বিশেষ শিল্পকীর্ত্তি দেখলে দর্শকের মনে কি ভাব উঠবে তা' নির্ভর ক'রে তাদের মনের উপাদানের উপর ও উপাদান বিন্যাসের উপর, মনের সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহিতা বা কর্কশতার উপর ও সবচেয়ে তার ভিতর জন্মজন্মান্তর- আহৃত সংস্কার-লীন বাসনার উপর। বিশ্বনাথ কবিরাজ রসবিচার করতে গিয়ে রসের সহৃদয়-হৃদয-সংবেদ্য-অনুভব-যোগ্যতা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, দর্শকের মনে যদি সেই বাসনা সঞ্চিত না থাকে ত রসানুভূতির চেষ্টা তাঁর পক্ষে পণ্ডশ্রম মাত্র—যেমন বৃদ্ধ মীমাংসক বা শুষ্ক বৈয়াকরণ। কথাটা সকল শিল্পসৃষ্টি-প্রণিধানের বিষয়েই সত্য। মনের তার যদি মোটা বা অসম হয় ত যত দক্ষ হাতেই তাতে ঘা দেওয়া যাক না কেন, তা' থেকে কর্কশ ও বেসুরো ধ্বনি বেরুবেই। অনেক শিল্পকীর্ত্তি দেখে তাই অনেকের মনে

কলুষিত ভাব ও দুষ্কৃতির প্রবোচনাই জেগে উঠে। আর এই সমস্ত লোকই সমজদার-হিসাবে রুচিবাগীশ হন; পারি নগরীর নগ্ন পাষাণ-প্রতিমাগুলির কটিতটে সবুজ পাতার আবরণ পরিয়ে বেড়ান (Anatole France, Les Opinions de Jerome Coignard)। প্রকৃত শিল্পীর ভাগ্যে নিষ্করুণ দৈব এই সকল সমালোচকদের বিচার শোনার দণ্ডও বিধান করেন। শিল্পীর ব্যথার কি পরিমাণ আছে! বর্ত্তমান লেখক এমন একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কথা জানেন, যিনি একবার মাত্র তাঁর রচনা প্রকাশ ক'রে সাধারণের নিকট যে সমাদর লাভ করেছিলেন, তাতে জীবদ্দশায় আর কখনও কোন রচনা প্রকাশ করার সাহস তাঁর হয়নি। সেগুলি যে তাঁর চিত্তোদ্যানের কল্পকুসুম, কত যত্নে, কত সাধনায় মুকুলোদ্গম হ'য়েছে, রাসায়নিকদের পরীক্ষাগারে কি তাদের দগ্ধ ক'রে, বিমর্দ্দিত ক'রে সৌরভের বিশ্লেষণ করতে দেওয়া যায়?

অথচ তাঁদের সৃষ্ট শিল্পকীর্ত্তির সুবিচার, তার মর্ম্মবাণীটির প্রকাশ ও ন্যায্য প্রশংসাদান শিল্পীর পক্ষে কত প্রয়োজন তা' বলা যায় না। সুচিন্তিত প্রশংসা ও উৎসাহের আবহাওয়া না পেলে শিল্প-প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হয় না। শিল্পী যে মানবচিত্তের একটা অভাব মিটিয়েছেন, চিরন্তন মানবকে চিরকালের জন্য একটা নিবিড় আনন্দের সামগ্রী দান করেছেন, এটা লোকে না বুঝলে তাঁর মনে হয় যেন সকল প্রয়াসই বিফল। তিনি যত আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন তা' ত পারেন নি, এ অক্ষমতা কাঁটার মত শিল্পীর বুকে বিঁধে আছেই কিন্তু যা' দিতে পেরেছেন তা' যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর অবহেলার বস্তু নয় এইটুকু জানতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর তা' না পেলে উৎসাহ আসে কোথা থেকে। কবির ভাষায় বলতে গেলে সকল যথার্থনামা শিল্পীরই আকাঙ্ক্ষা—

> নবীন আষাঢ়ে রচি নবমায়া
> এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
> করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
> বাসন্তীবাস পরা।
> ধরণীর তলে, গগনের গায়,
> সাগরের জলে, অরণ্যছায়,
> আর একটুখানি নবীন আভায়
> রঙীন করিয়া দিব।
> সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
> রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
> দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর,
> তারপরে ছুটি নিব।

না পাবে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিবিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে,
মাগিছে তেমনি সুব ,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশেব ব্যথা,
বিদাযেব আগে দু'চাবটি কথা
বেখে যাব সুমধুব।

আব যখন শিল্পী দেখেন যে তাঁব প্রাণান্ত প্রযাসে জগতে মতভেদ ও দ্বন্দ্বেবই সৃষ্টি হচ্চে তখন সে দুঃখেব কি সীমা আছে! তথাকথিত বসজ্ঞদেব শিল্প-বিচাবে শিল্পীবা যে অসহিষ্ণুতা, যে অবজ্ঞা প্রকাশ কবেন, তা'তে তাঁদেব বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি? উভয়েব বিচাবেব মূল্য নির্দ্ধাবণেব মূল সূত্রই যে ভিন্ন। শিল্পীবা রুক্ষস্বভাব, অব্যবস্থিত চিত্ত, কর্কশ প্রকৃতিও নন এবং প্রতিভা আর উন্মত্ততাও এক পর্য্যায়েব বস্তু নয়।

শিল্পীব ব্যথাব বোধহয় প্রতিকাব নেই, কিন্তু সে দুঃখটা যে কি তা' বোঝা ও তাব সহিত সমবেদনা অনুভব কবা বোধহয অসম্ভব নয়। বিজলী-চপল মুহূর্ত্তে প্রাণ-মন-উন্মাদক, গভীব, তীব্র, অবর্ণনীয়, আনন্দ-প্রতীতি একা প্রতিভাব ভাগ্যেই ঘটে। তাবপরই শিল্পীব দুঃখের আবম্ভ। সেই আনন্দেব স্মৃতি এমনই পাগল ক'বে তোলে যে, সেই অনুভূতিব সন্ধানে সকল শক্তি নিয়োজিত কবতে হয়। এই পবম অনুভূতিব অন্বেষণে বেবিয়ে তেমনই তীব্র ও গভীর নব নব অনুভূতি পাওয়া যায় কিন্তু তৃষ্ণা বেড়ে যায়। সে আনন্দময় মধুব স্বপ্নটিকে বাইবে আকাব দিতে যতদিক্ দিযে প্রযাস পাওযা যাক্ না,—কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, যে স্থূল উপাদানেব সাহায্যে এই চেষ্টা কবা যায সেগুলিই তাদেব জড শৃঙ্খলে প্রতিভাকে বেঁধে পঙ্গু ক'বে তোলে,—আব শিল্পী যতই তাব বিকলাঙ্গ সন্তানদেব দিকে চান, ততই তাঁব দুনয়নে দুঃখেব বাবি ছাপিয়ে উঠে। সেগুলি যতই বিকলাঙ্গ হ'ক, যদি তাবা দর্শকেব মনে শিল্পীর অনুভূত বিপুল পুলকেব একটুকুও বেশ তুলত তাহ'লে শিল্পীব কিছু সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু চাবিদিক্ থেকে যে অভিনন্দনেব কোলাহল উঠে, খাঁটি আর্টেব দিক্ দিয়ে, শুধু form-এব দিক্ দিয়ে, সমাজেব দিক্ দিয়ে, নীতিব দিক্ দিয়ে, মনস্তত্ত্বেব দিক্ দিয়ে যে উন্মত্ত সমালোচনাব তাণ্ডবলীলা আবম্ভ হয়, তাতে শিল্পী আপনাকে এই দ্বন্দ্ব-নিনাদেব মূল-কাবণ ভেবে, মহা অপবাধী ব'লেই মনে কবেন। কোথায় আদি বিশ্বেব

বিবর্ত্তনের স্রোতে কণায় কণায় ভেসে আসা সৌন্দর্য্যের নিমেষে পরিপূর্ণ সমগ্রতায় বিকাশ ও আনন্দ-প্লাবনে বিশ্বজগতের ও শিল্পীর আপন অস্তিত্বের নিমজ্জন, আর কোথায় এই অর্থহীন প্রশংসার ও নিষ্প্রয়োজন নিন্দার কর্কশ চীৎকার! অসহিষ্ণু শিল্পী যদি গভীর অবজ্ঞাভরে ব'লে উঠেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥

তাহ'লে কি তার যথেষ্ট কারণ আছে বলতে হবে না? আমাদের মধ্যে একটুখানিও শিল্পী-প্রকৃতি না থাক্‌লে তাঁকে আমরা বুঝব কি ক'রে? মর্ত্ত্যের জীব হ'য়েও শিল্পীর স্বপ্ন-বিভোর নয়নে একটুখানি স্বর্গীয় অঞ্জনের লেশ লেগে আছে, আর আমরা যে মৃণ্ময়ী পৃথিবীর নিতান্তই ধূলিধূসর সন্তান।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রেমপত্র

"গল্প কখনও সত্য হয ?"

"নিশ্চযই হয, নচেৎ আমি কখনও প্রেমে পডি ?"

"বল কি হে ? প্রেমে ত সকলেই পডে !"

"আমি ত আব সকলেব একজন নই ।"

"জানি তুমি অ-সাধাবণ। শুনি এক অ-সাধাবণ ব্যক্তিব অ-সাধাবণ গল্পটি ।"

দুই বন্ধুব মধ্যে কথা হচ্ছিল। দু'জনেবই বয়স ত্রিশেব ওপব। ঠোটেব চাপে, চোখেব দীপ্তিতে, চিবুক-চোয়ালেব গঠনে পার্থক্য ধবা পডে। একজন বুদ্ধিমান, বুদ্ধিব গর্ব্বে গর্ব্বিত। অন্যজন সাদাসিধে, ভাল মানুষ। দু'জনে নদীব ধাবে গিয়ে বসল।

"ছ্যাখ, অ-সাধাবণ ব্যক্তিব অভ্যাসই হচ্ছে যে, সে নিতান্ত সাধাবণ ঘব-পোষা লোকেব কাছে তাব অ-সাধাবণত্বেব বডাই কবে। যখন তাব দলেব অন্য ব্যক্তিব বিদ্রূপে সে কর্ণপাতই কবছে না, তখন দেখা যায যে, তাব নিম্নশ্রেণীব লোকেব ঠাট্টায় সে বিচলিত হচ্ছে। নেপোলিযনেব সর্ব্বদাই ভয় হ'ত, প্যাবিসেব মেয়েলী আড্ডায়, বুল্‌ভার্দেব কাফেতে তাব সম্বন্ধে কে কি বলছে। তোমাদেব দেশেব যে কোন বড লোকেব কথা স্মবণ কবতে পাব, নজীব পাবে। সেই জন্য আমাব গল্প শুনে তুমি ঠাট্টা কবলে আমি বিচলিত হব। কিন্তু ঘটনাটি নিতান্তই সাধাবণ হ'লেও ব্যাপাবখানি সত্যই অ-সাধাবণ ও অলৌকিক।"

"বল"

"সে ছিল আমাব খুব দূব সম্পর্কেব আত্মীযা। আমাব সঙ্গে সম্বন্ধও হযেছিল—বিয়ে কবি নি। এক বন্ধুব সঙ্গে তাব বিয়ে হয়। হয কেন ? আমিই ঘটকালি ক'বে দিযে দিই। বন্ধুব সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় Science Association-এব লেক্‌চাব হলে। ছেলেটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক—অর্থাৎ ইংবেজী না জানাব, ইতিহাস মুখস্থ কববাব অক্ষমতা এবং সংস্কৃত ঝামা অক্ষবেব প্রতি প্রীতি না থাকাব দরুণই যে সে বিজ্ঞান পডত তা নয। নিজেব মুখে শুনেছিলাম যে, সে ছেলেবেলা থেকেই লেন্‌স্ নিয়ে নাডাচাডা কবত। বাপেব বউবাজাবে একটা পাথুবে চস্‌মাব দোকান ছিল। সে যাই হোক্, বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে গেল। বন্ধু স্ত্রীকে নিযে ঘবে পুবলেন। বছব খানেক কি দেড়েক পবে মেযেটি এল বাপেব বাডীতে। কাবণটি শুনলাম সনাতন, সাধ-ভক্ষণ। মাস দুই পবে, এক গভীব বাতে মেযেটিব ভাই এসে ডাকাডাকি কবল, কেদাব দাসেব বাডী যেতে হবে। ভীষণ

বিপদ—শীতেব বাত ! যাবা মূর্খ, যাদেব স্বামী এমন মূর্খ তাদেব সাহায্য কবাই পাপ, তাদেব মবাই উচিৎ। হঠাত মনে হ'ল কেদাব দাসেব এক এসিষ্টান্টেব ছেলে ত আমাব বন্ধু—বুক কোম্পানিতে আলাপ—ছেলেটাব বাপেব পযসা আছে, নতুন বই কেনে, পড়ে কিনা জানি না। মেযেটিব ভাইবে একটা চিঠি দিতে সম্মত হলাম। ছোক্‌বা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লে, 'দাদা, তুমি চল, খুকী মব-মব, সবই কবেছ, আব একটু উপকাব না হয় কবলে!' ও বকম কাকুতি কবলে আমাব আবাব কেমন দুর্ব্বলতা আসে। তাই গেলাম। সস্তাব এক দাসকে ধ'বে নিযে এলাম। বাড়ী ঢুকতে যেন গাটা ছম্ ছম্ ক'বে উঠল, একটা গোঁঙানি কানে এল। ছিঃ, ugly শুধু নয়, একেবাবে vulgar—। হাঁ, বুঝি Creative Evolution লেখা হচ্ছে, বার্গসনেব গোঁঙানি বোঝা যায়! কিন্তু এ কী! জীব-জগতে সৃষ্টিব মধ্যে সহজ ভাব কোথায? সব বাধা-বিঘ্ন, impediments-কে consume কবলেই, পুড়িয়ে ফেল্লেই ত আলো শুভ্র হয। যা সৃষ্টি হচ্ছে তাব ভবিষ্যৎ ত জানাই আছে! সকালে শুনলাম একটা জড়পিণ্ড জন্মেছে, ও তখনি শিশুমৃত্যুব ক্রম-বর্দ্ধমান হাবকে শ্রদ্ধা জানিয়েই মাবা গিয়েছে। জড়পিণ্ডেব জড়-ভাবতী মা'টি তখনও জীবিতা, প্রথামত খাবি খাচ্ছেন। উচ্ছন্ন যাক্ বাঙলা দেশ। ভাগ্যিস্ একজন ডাক্তাব এনে দিযেছিলাম! ডাক্তাবদেবকেও বিশ্বাস নেই। সেদিন দেখছিলাম, বিলেতে শতকবা যত মেযে আঁতুড ঘবে মবে, অথচ যাদেব মবা উচিত নয, তাদেব মধ্যে শতকবা ১৮ জন মবে ডাক্তাবদেব দোষে, আব শতকবা সেই সংখ্যাই মবে নিজেদেব মূর্খতা ও অজ্ঞানতাব দোষে। তা হ'লে ডাক্তাবেব বাহাদুবীটা কি? তবু আনলাম ত!

কি জানি কেমন ক'বে নিজেকে দেখলাম আঁতুডঘবেব দবজায। বোধহয, সৃষ্টিতত্ত্বেব শেষ ফলটি দেখতে, সমালোচকেব নেশাই তাই। ভাগ্যিস্ ঐতিহাসিক নই! গলা পর্য্যন্ত ঢাকা, ঘবেব কোণে হাঁড়িতে গুলেব আগুন টিম্ টিম্ ক'বে জ্বলছে—ধোঁয়াব ব্যূহ ভেদ ক'বে কিছুই নজবে পড়ে না। নজবে পড়ল এক জোড়া চোখ! কী করুণ, গরুগুলো যেমনি ক'বে চায, কী বড! আকাশ জুড়িযা মেলিল তব আঁখি—চোখ দুটো বাডতে বাডতে আকাশ ভবিয়ে দিলে—ঘোলাটে মেঘেব সঙ্গে মিশে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, চোঁয়ান চাঁদেব আলোব ম্রিয়মাণ মুমূর্ষু দীপ্তি যেন আত্মগোপন কবতে চাইছে, একটা যূথভ্রষ্ট বলাকা ডানাব ঝাপটা দিতে দিতে, করুণ আর্ত্তনাদ ক'বে উড়ে গেল, তাবই আওয়াজ যেন কানে এল।

"এসেছ?"

"তাব আব কী হয়েছে! এ-ধাবে যে ঘব বিষে ভ'বে গেল, গুল্
ভাল পুড়ছে না, পিসীমা, হাঁড়িটা বাইবে নিযে যাও।"

"বোসো—মাথা ঘুবছে, কথা কইতে পাবছি না।"

"একটু কেমিষ্ট্রি জানা ভাল মেযেদেব বঙটাও পবিষ্কাব হয়, আত্মবক্ষাও হয়, সঙ্গে সঙ্গে দাবিদ্র্যও দূব হয়, তোমাব স্বামী আবাব পদার্থ-বিজ্ঞানেব অপদার্থ এম্, এস্, সি, বুঝি, থুডী!"

"কাল মবছিলাম, সে কী কষ্ট!"

"দু'দিন পবেই ভুলে যাবে, দিদি, কোন কষ্ট কি ভয় থাকবে না।"

ভাল লাগল না, চলে এলাম। সর্দ্দাবিলেব সর্দ্দা সাহেব মহাত্মা-গান্ধীব চেযে বড়। আবো বড় হ'তে পাবতেন, যদি সমাজ-বক্ষকেব দল না থাকত।

তাব পব বোজই যাই। মেযেদেব কী অসাধাবণ সেবে ওঠবাব ক্ষমতা! এক মাসেব মধ্যেই উঠে হেঁটে বেডাতে আবম্ভ কবল। বেশ গোলগালধবণ, বঙ গৌব নয, তবে কেমিষ্ট্রিব সাহায্য-ব্যতিবেকেও চামড়া পাৎলা ও মসৃণ, নাইবাব সময় তুর্কী তোযালেব দবকাব হয় না, চোখেব পালক sea-gull-এব ডানাব মতন, সে ডানা যেমন দেহেব তুলনায বড়, তেমন বড় চোখেব পালকগুলো তাব চোখ ঢেকে ব'য়ে এসে গালেব ওপব পড়েছে। স্বভাব মিষ্টি, চবিত্রে কিসেব একটা সাম্য আছে, লোভেব অভাবে বোধ হয়, চোখে, মনে কিসেব একটা শান্তি আছে—অজ্ঞান তিমিবান্ধস্যেব বোধ হয়। লম্বা ধবণেব ছিপ্ ছিপে হ'লে Nausica-ব মতন হ'তে পাবত। মোটেব ওপব মন্দ নয়—ঢেব বেশী সুন্দব মেয়ে দেখেছি ওব চেয়ে। বোজ যেতে হয, বোজই কথা কই। মাঝে মাঝে চাল ভাজা, মুড়ী খেতে ভালই লাগে। গেলে কি যে কববে ঠিক্ পায না। কিন্তু হাঁটে আস্তে আস্তে, চিবকালই তাই। মনে ভাবেন হযত থিয়েটাবেব বাণীব মতন হাঁটাই আদর্শ হাঁটা। তাও নয বোধ হয—জোবে হাঁটা শিক্ষায বাধে। সংযম, সংযম! কী যে সমাজেব চাপ! কত বড জগদ্দল পাথব বুকেব ওপব চাপান বয়েছে! হৃদয়েব গোপুবমে সংস্কাবেব পাহাড!

মেয়েটি দেখি একদিন এক মাসিক-পত্রিকা পডছেন। খাঁটি অভিজাত, কুলীন-সাহিত্য, এক সংখ্যায় তিন-তিনটি আই, সি, এসেব লেখা ও গল্প। সাহিত্যেব নামে সৌখিনত্বেব, snobbishness-এব প্রকাশ! সেও ভাল। একটু আলোচনাব পব দেখি কেমন একটা সবল বসগ্রহণেব ক্ষমতা আছে। তাকে বুঝিয়ে দিলাম 'সবলভাবে বসগ্রহণ কবাব কোন মূল্য নেই। আদৎ কথা সমালোচনা-শক্তি, তাকে অর্জ্জন কবতে হয় বিলেতী বই পড়ে, মার্জ্জন কবতে হয শিক্ষিত-সম্প্রদাযেব মুখে মতামত শুনে।' আমি ভাল ভাল বই যোগাবাব ভাব নিলাম, মাঝে মাঝে শক্ত জাযগাগুলো

বুঝিযে দিতাম, আব, আমাব মতামত ছাড়া আব কাকব মত শোনবাব সুযোগ তাব ছিল না। স্বামী তখন Compton effect নিয়ে ব্যস্ত—বেচাবি সাহিত্যালোচনা কখনও কবেনি। সে মাঝে মাঝে আসে, আব জিজ্ঞাসা কবে, 'দাদা, যতীন সেনেব কবিতা নাকি ভাল?' আমি কবিব pessimism-এব ব্যাখ্যা কবি। বলি 'আমাদেব বর্ত্তমান সাহিত্যেব অবস্থায নতুন সুব বটে, কিন্তু দেশেব ঐতিহ্য ও অন্যান্য অবস্থা দেখলে এই সুবই স্বাভাবিক মনে হয়। এতদিন বাজে নি কেন আশ্চর্য্য হই! আশ্চর্য্যান্বিত হবাব ফলে হযত যতীন সেনেব কবিতাকে একটু বড ক'বে দেখি। অবশ্য লেখেন ভাল। আমি দুঃখবাগেব অন্য বাগিণী শোনবাব অপেক্ষায ব'সে আছি'—ইত্যাদি। মেয়েটি গালে হাত দিযে, কখনও বাঁকা চোখে, কখনও পালক নামিয়ে শোনে—বুঝতে চেষ্টা কবে, কিন্তু ভুরু কোঁচকায় না। স্বামী নিজেব মেসে চলে যায। একটু আমাব উপব কৃতজ্ঞ। কোন দিন সেখান থেকে জলখাবাব খেযে আসি—নিজে হাতে তৈবী কবে। বান্নাব হাত মন্দ নয়।

তাব পব মধ্যযুগ। সে যুগেব শুধু করুণাটুকু, ঘোডায চডা কিম্বা তলোয়াব খেলা নয়। কেমন যেন আমেজ লাগে। আচ্ছা, মাথায় কি করুণা বাসা বাঁধে? মধ্যযুগেব ধাবণা ছিল—করুণাব পীঠস্থান পেটে। বেশ চিঁড়ে ভাজা খাওয়া যেত, চা ভাল হ'ত না, অত তাডাতাড়ি জল গবম হয না, এক চুমুক খেযে বেখে দিতাম, পবে শিখে নিলে। ঘবেব কাজ ছেডে আমাব কাজই কবে। ঘবেব আব কাজই বা কি? সেবা-খাওয়াব মধ্যে একটা মধুব বিলাস আছে, প্রথম শবতেব হাওযাব মতন। অভ্যাসেব বশে দাবী কববাব প্রবৃত্তি এল। অবশ্য এ ভাবটা ঠিক্ মধ্যযুগেব নয, তখন প্রেম ছিল কর্ত্তব্যজ্ঞান। আব দাবী কববই না কেন? আমি না কবলে আব কেউ কববে। আমাব ধর্ম্মই তাই—তাব ধর্ম্মও তাই। কথাটা সন্দীপ বলতে পাবত, নয়? কিন্তু সেও মক্ষিবাণী নয, আব স্বামীটিও নিখিলেশ ছিলেন না। আমাব দাবী কববাব অধিকাবকে সে কেমন নীববে, বিনা ওজব-আপত্তিতে, হাওয়া যেমন মানুষে টেনে নেয, সেই বকম সহজে মেনে নিলে। একটু খাবাপ লাগত, অত অম্লান-বদনে কেউ কিছু মেনে নিলে তাকে ভাল লাগতে পাবে না, তাকে শুধু ব্যবহাব কবা যেতে পাবে। হাজাব হোক্ সে ত পবস্ত্রী, আব পবেব ক্ষেতেই ঝাল খেতে ভাল। আমাব নিজেব মানসী-প্রতিমা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধাবণা নেই—কিন্তু পবেব কি ধবণেব হওয়া উচিত তা আমি জানি। পবস্ত্রী হবে যেন ধনুকেব জ্যা, ছুঁলেই টঙ্ ক'বে বাজবে, চাবুকেব মতন চটপটে, লিক্‌লিকে—না হ'লে মনে হয যেন বর্ষাকালে তিন দিনেব বাসি মুড়ী খাচ্ছি, তাও আবাব ঘি দিয়ে। কিন্তু তবু অত নির্ব্বিবাদে আমাব দাবী গ্রহণ ও অত অকৃপণ

ভাবে সে দাবী-পূবণ দেখে দেখে মনে সন্দেহ হ'তে লাগল। কেমন যেন নতুন নতুন ঠেক্‌ল? এই নতুনত্বেব মোহই আমাব চোখে ছানি টান্‌লে।

মোহটা কি ধবণেব জান? বাংলা দেশেব পাডার্গাযে, বর্ষাকাল শেষ হ'লে, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসেব ভোববেলাব miasma দেখেছ? বোম-সাম্রাজ্যেব মতন দুর্দ্ধর্ষ সাম্রাজ্য গেল কাম্পানাব কবলে—আমাব stoicism কোন্ ছাব! কিন্তু এব বিপক্ষে লডাই কবিনি, কি সাবধানী হই নি ভেবো না। চাব-ধাবেব ডাঙ্গা শুক্‌নো বেখেছি, কোন মশাকে ডিম পাড়তে দিই নি, নিজেকে মশাবিব ভেতব বেখেছি, নিম-পাতা কুইনিন খেয়েছি—তবুও কোথা থেকে কামডে দিল, তাই মাঝে মাঝে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে, কাঁপুনি আসত। হৃদয়েব আবেষ্টন নীবস বাখবাব প্রাণপণ চেষ্টা ক'বেও, আকর্ষণেব কোন সুবিধা ও কাবণ না ঘটতে দিযেও, নিজেকে দূবে সবিযে বেখেও, cynicism-এব আববণ সত্ত্বেও, আমাব সব পুরুষালি দাম্ভিকতাকে তাব নীবব নাবীত্ব ঠক্ ঠক্ ক'বে কাঁপিযে দিলে। কত কঠিন হয়েছি, কত বকেছি, কত নিষ্ঠুব, নির্ম্মমভাবে অবহেলা কবেছি—কিন্তু কই আমি ত—এই ছাখনা তোমাব কাছে জীবন-কাহিনী বল্‌ছি। আগে কখনও ভাবতে পাবতে যে আমি তোমাব সঙ্গে ব'সে এই ধবণেব 'কাব্যি' কবব?

একদিন তাকে দাবী ও অধিকাবেব ইতিহাস ও মর্ম্ম বোঝাতে লাগলাম। আদিম যুগ থেকে আবম্ভ ক'বে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কি ছিল, কি হ'ল তাবই ইতিহাস। সমাজ-তত্ত্ব মেযেদেব বোঝা উচিত। চুপ ক'বে শুন্‌লে, মাঝে মাঝে, বড বড চোখ ক'বে চায, পালক ঝাঁপেব মতন ওঠে পড়ে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চল্‌ছে কিনা বোঝা যায না। বুঝছে কিনা প্রমাণ পাই না। প্রশ্ন কবে, "দাবী-দাওযাব ভাগবাটোযাবা ক'বে কাব কতটুকু বইল? যতটুকু বইল তা'তে যদি সুখ না হয়, ভাগ না ক'বে কেউ যদি শুধু দাবী কবে, আব কেউ দাবীব অধিকাব পূবোপূবি স্বীকাব ক'বেই সুখ পায়, তা'তে ক্ষতি কি?" উত্তব দিই, "মেযেদেব ও-ভাবে মৈবী ও মার্থাব খোঁয়াড়ে পূব্‌তে পাব—জানি না ঠিক্—কিন্তু পুরুষ মানুষেব স্বভাব ও শিক্ষা ভিন্ন। একই পুরুষ দিতেও জানে নিতেও জানে। তোমাব কি মনে হয?" "কি জানি", ব'লেই ভাঁডাব ঘবে চ'লে যায। তর্ক সে কখন কবতে শেখে নি। সব শিক্ষা বৃথা হযেছে, ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে!—সে কিছুই গ্রহণ কবে নি। সে শুধু দিতে শিখেছে।

আব একদিন তাব বাডি গিয়েছি। সপ্তাহ খানেক যেতে পাবি নি। স্বামীব সঙ্গে কথাবর্ত্তা হচ্ছে। আমি যেতেই ব'লে উঠল—'যে লোক তিলেব তেল আব নাবকেল তেলেব তফাৎ বোঝে না, তাব বিজ্ঞান পডাব

মুখে ছাই! আমি আনতে বোল্লাম গন্ধ তেল, আনা হ'ল বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল!' আমি বল্‌লাম, 'বৈজ্ঞানিকের মতই কাজ করেছেন, ও সুগন্ধি তেলকে তোমার চুলের পক্ষে খারাপ ভাবে, তাই আনে নি।' 'আমার চুল কিসে ভাল হয়, আর কিসে খারাপ হয় আমি জানি, বৈজ্ঞানিক জানে না, এ ফেরৎ দিও, যা বলেছি কাল এনো।' বন্ধু একটু অপ্রস্তুতের হাঁসি হেঁসে চলে গেল। তার পর আধঘণ্টা ধ'রে তাকে শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছি, কোন রকমের অনুশোচনার চিহ্ন পর্য্যন্ত নজরে পড়ে নি। সংযম বটে! হয়ত সংযমের কথাই নয়। তবে কি মেয়েদের স্বভাব অন্য ধরণের?—কারুর কাছে দাবীই করে, যতটুকু না দিলে নয় তাই দেয়, দেবার সময় ঠকায়, যেন সবই দিচ্ছে, আবার কারুর দাবী মাথা পেতে গ্রহণ করে, দ্বিধা করে না, বুঝিয়ে দেয় আরও ভার সে সহ্য করতে পারে? প্রত্যেকেই multiple personality, সামান্য উত্তেজনাতেই dissociated হ'য়ে যায়। আগে ভাবতাম, লোক ঠকিয়ে খায়, তা নয়।

ঠিক্ এই সময়ে আমাকে বার্গসনে পেয়ে বস্‌ল। জীবনীশক্তি নাম শুনেই মনে হ'ল, তাই ত, সবই ত এরি কাজ, আমারা ত এরি হাতের পুতুল। বুঝলাম স্ত্রীজাতি ত এরি প্রধান এজেন্ট। লোকটার কী লেখবার ক্ষমতা! যা সন্দেহ ক'রে এসেছি তাই ঠিক্ ব'লে দেয়—এই না হ'লে লেখক! সামান্য সামান্য ঘটনায়—যার পারম্পর্য্য তুমি বার্গসন না পড়লে বুঝবে না—আমি প্রমাণ পেলাম যে আমি কোন্ শক্তি-প্রবাহের ঘূর্ণীতে পড়েছি—আমাকে ঘাড় ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, টানের জোরে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলেছি। বুদ্ধিগড়া নিজত্বটুকু, অ্যালান পো-এর গল্পের ঘূর্ণীর মধ্যে নৌকার মতনই, ভেঙ্গে খান্ খান্ হ'য়ে গেল। আমি নিজেকে হারালাম। যেদিন বুঝলাম যে হাল আমার হাত থেকে খসে গিয়েছে, সেদিন আমার যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ এসেছিল বল্লে, আশা করি, বিশ্বাস করবে। না, না, অত বিশ্বাস ক'রে অপমান করো না। কী কুক্ষণেই বার্গসন্ পড়ি!

জান বোধ হয়, বার্গসনের শিষ্যবৃন্দ Syndicalist-রা, তাঁদের প্রধান কথা Direct Action। তাই একদিন তা'র দিকে সোজা চেয়ে বল্‌লাম—'তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে'। চোখের পাতা নামিয়ে নিয়ে পায়ের আঙ্গুলটা পর্য্যন্ত সাড়ির পাড় দিয়ে ঢেকে দিলে। বল্‌লাম, 'তা ভাল, পূর্ব-পশ্চিমের তফাৎ অনেক'। আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌ল—আর কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ঘন গলায় বল্‌লাম, 'আর আমার এখানে আসা উচিত নয়।' কী বড় চোখ তার, কালো তারা, পালকগুলো যেন চীনে

কালিতে ডোবান তুলিব আঁশ। বুদ্ধিব প্রভা তাতে নেই, শুধুই ভাল মানুষ, নিছক্ ভাল মানুষ। চোখ নিযে জন্মেছে, তাই চায।

আবার গেলাম, পবেব দিনই। তাকে বল্‌লাম যে সে আমাকে আকর্ষণ কবেছে, সে আকৃষ্ট হযেছে কিনা প্রশ্নেব হ্যাঁ কি না সাফ্ উত্তব চাই, আমি আকৃষ্ট হয়েছি সে জানে কি না। নড়ে না, চড়ে না নয়ন পাথাব—নট্ নড়ন্ চড়ন্ ঠকাস্-মার্ব্বেল। তা হ'লে জানাই ভাল—nothing like facing the issue—এই হ'ল নতুন মনোবিজ্ঞানেব কথা। আমি তাব হাত ধবতেই উঃ কবে উঠল, হাতেব নোযা বেঁকে গিয়েছে। কথা কয না, দাঁডিযে শুধু কাঁপে। এ এক বিপদ! নিশ্চল হ'য়ে দাঁডিযে থাক্‌তে তাব জুড়ী দেখি নি। হয়, নির্ব্বিকল্প সমাধিব অবস্থা, না হয় প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, জড়ভাবতী! 'কথা কও, কথা কও, অমন ক'বে দাঁড়িয়ে থেকো না,' বলতে চোখ তুলে চাইলে—তা'ব পবই water-works! ভাবলাম সুবিধা বটে, কেননা নীববতা কান্নাব সঙ্গে মিশলে স্বীকাবোক্তি কেন চুক্তিপত্র পর্য্যন্ত বেজেষ্ট্রি হ'যে যায। হ'লও তাই।

তাব পব, তাব পব আব কি? সে আমাকে এক লম্বা চিঠি লিখলে। অমন লম্বা, অমন আবোল-তাবোল, অমন ভাবপ্রবণতাব বসে ডোবান বসগোল্লা মার্কা চিঠি, অমন boring লেখা এক বাঙলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া অন্য কোথাও পড়িনি। উচ্ছ্বাস, কেবলই উচ্ছ্বাস, একটু ন্যাকামি মেশানো, বেডিওতে নতুন ঢঙেব যেন গজল গান শুনছি। বিবাহেব পব স্ত্রীকে পড়তে দেবো ভেবে চিঠিখানি অনেকদিন বেখে দিয়েছিলাম। সে দিন পুড়িয়ে ফেলেছি। চিঠিব উত্তব দিই নি। বিকেলে যখন গেলাম তখন দেখে মনে হ'ল যেন সে ব্যক্তিই নয। শুপাবি কাটছে। এই শান্ত প্রকৃতিব ঘবণী-গৃহিণীব মধ্যে এত উচ্ছ্বাস ছিল—আগ্নেয় গিবিব বুকে ছাইয়েব মতন। যাই হোক্, সে ছাই উড়ে আমাব আকাশকে বঙীন কবলে, কতদিন পর্য্যন্ত মনেব আকাশে যে সূর্য্যাস্তেব সময সে ছাই বঙেব ভিযান বসাত তাই ভেবে এখনও অবাক্ হই। স্মবণ আছে এখনও, না হ'লে তোমাকে গল্প বলি!

যখন জিজ্ঞাসা কব্‌লাম 'যা লিখেছ সব সত্যি,' সে জবাব দিলে 'হ্যাঁ সত্যি, সত্যিব অর্দ্ধেকেবও কম।'

'আব বাকীটা? সব মিছে?'

'না, তাও সত্যি।'

'আমাকে অনেক দিন থেকে বাসতে পাব, কিন্তু কত জন্ম ধ'বে বাসছ কি ক'বে জান্‌লে? জাতিস্মব?'

'জানি।'

'বিজ্ঞানে জানে না'। বাইডাব হাগ্যার্ডেব গল্পটা বলেছিলাম, মনে হয় না ত!

'তবু জানি।'

পিকিঙ্‌ মুণ্ডেব যুগে না হয় সে আমাকে ভালবাসতে পাবত, তাবও আগে? ববফেব যুগে? তাবও আগে?- পৃথিবী যখন আগুনে টগ্‌বগ্‌ ক'বে ফুট্‌ত? তাবি বুকেব জ্বালায় বোধ হয়!

'আমাকে দেখ্‌তে, কেবল দেখ্‌তে ভাল লাগে?'

'হুঁ।'

'কেন? সুন্দব ব'লে?'

'জানি না।'

'জান বই কি? অনেকেবই চেহাবা আমাব বয়সে আমাব চেয়ে ভাল ছিল।'

'হয়ত ছিল।'

'চিবকাল দাসী হ'যে সেবা কববে? তুমি কোন যুগেব? এটা বিংশ শতাব্দী জান? বিলেতে মেযেবা সমগ্র স্ত্রীজাতিব অধিকাবেব জন্য জেলে পর্য্যন্ত যাচ্ছেন জান? কতবাব না বলেছি জেলে পর্য্যন্ত যেতে হবে তোমাদেব?'

'দাসীও হব, জেলেও যাবো।'

'সে কি ক'বে হয়, বিবাহেব সঙ্গে সঙ্গে দু কাজ একত্রে সমাধা হ'য়ে গিয়েছে যে!'

'বিয়ে আমাব হয নি।'

এ কী কথা বলে? সেই যে সাতপাক, সেই যে মধু দেওযা, পিঠে পুতুল আঁকা, মন্ত্র পাঠ,—মন্ত্রেব শক্তি, দেখছি, শুধু অনুৰূপা দেবীই বুঝেছেন! সংস্কৃত মন্ত্রকে বাঙলায তর্জ্জমা না কবলে চলে না দেখছি। 'বিবাহ তোমাব হযে গিয়েছে।'

'না গো হয নি।'

কোথা থেকে তাব গলায এত জোব এল কে জানে। পাথবেব গাযে কোঁদা অক্ষবেব মতন প্রত্যেক অক্ষবটি স্থিব, সুনিশ্চিত, কথাব মধ্যে কোন জডতা নেই, সন্দেহেব দোলন কি কম্পন নেই, ভাবালুতাব লেশ পর্য্যন্ত নেই। এ কী ক'বে হয়?

'আমাকে ও ভাবে চিঠি লিখলে কেন? এতদিন কি ঐ শিক্ষা হ'ল? বাকী ছিল, প্রিয়তম, প্রাণেশ্ববটুকু, আবো বেশী বানান ভুল আব আটে শূন্য আসি তোমাবই দাসী—বাদ পড়ল কেন?'

'তুমি আমাকে ব্যথা দিতে ভালবাস।'

"এই ত তরুণদেব ভাষা জান। তবে কেন আত্মগোপন? ধবা দেবেনা ব'লে? আমাকে খুঁজে নিতে হবে ব'লে?

"আচ্ছা, আব কখনও লিখব না। তোমাব সব শিক্ষা বিফল হয়েছে।"

"ঠিক্ বলেছ। ক্ষেত্র বোধ হয উর্ব্বব ছিল না।"

"আমি যে ও ছাডা লিখতে জানি না।'

"এতে অবশ্য তোমাব বেশী দোষ নেই। অন্য সাহিত্যে প্রেমপত্র সব ছাপা হয়, বড বড প্রেমিকেব, হযত তা'বা বডলোকই ছিল না। প্রেমপত্রেব চয়নিকা সস্তা দামে বিক্রী হয়, সেজন্য সে দেশেব প্রেমপত্রেব সাধাবণ standard অত উঁচু। ববি বাবু ভানুসিংহেব পত্রাবলী ছাপিযেই ক্ষান্ত হলেন, তাই দেশেব এই দুর্দ্দশা, তুমি কি কববে!"

কিন্তু মনে তৃপ্তি পেলাম না। ও দেশেব প্রেমপত্রও ত ঝোলাগুড়, কোন দানা নেই, অথচ যাবা লেখে তাদেব চবিত্রেব দৃঢ়তা ও কাজ কববাব শক্তিও অদ্ভুত! তবে কি প্রেম-নিবেদনেব ভাষাই ঐ? তা হ'লে, সাহিত্যেব ভাষা দুর্ব্বল হ'লেও তাব পিছনেব ভাবটি সত্য হতে পাবে? রূপ তা হ'লে কি? সেদিন এই সব প্রশ্নেব বোঝা নিয়ে বাড়ী ফিবলাম। উত্তব আজও পাইনি। কিন্তু আমাব অগোচবে একটি ধাবণা আমাকে ধ'বে বসল যে হয়ত এই মেয়েটি সত্য কথা কয়েছে, কিন্তু ভাষাব দোষে তাব ভাবটি পর্য্যন্ত বিকৃত হযেছে। একদল মনোবৈজ্ঞানিক বলেন ভাষা থেকেই ভাবেব সৃষ্টি হয়। সে কথা বোধ হয ঠিক নয়। জোব, ভাষাব জোবে ভাবটি ভিন্নরূপ ধাবণ কবতে পাবে, কিংবা বিকৃত হ'তে পাবে। সে সত্য কথা বলেছে ধাবণাটি যখন আমাকে ভূতেব মতন পেয়ে বসল, তখন বুদ্ধিব সব আগড গেল ভেঙ্গে। হলাম বর্গসনেব গোঁড়া শিষ্য।

এই হ'ল আমাব অ-সাধাবণ গল্প। আমাব মতন লোকেব ছোট খাট মানসিক ঘটনাও অ-সাধাবণ। যদি না বুঝে থাক, তা হ'লে স্বীকাব কব যে, ferro-concrete-এব ভিতব দিযে অশথ গাছেব চাবা জন্মাতে পাবে। আমাব বার্গসনে বিশ্বাস, আমাব পক্ষে স্ত্রীলোককে শিক্ষিত কববাব প্রবৃত্তি, আমাব পক্ষে romanticism-এব, হৃদয-বৃত্তিব দাবী মানা—এ সব যদি অ-সাধাবণ ঘটনা না হয, তা হ'লে আব কাকে অ-সাধাবণ ঘটনা বলবে জানিনা।"

বন্ধুটি বল্লেন—'ও বকম খোসামোদ কবলে সকলেই বার্গসনেব শিষ্য হ'তে পাবে। তুমিই আদৎ silly, তোমাব বুদ্ধিবাদ সব pose—চাল! সে মেযেটি তাব সহজ অনুভূতি দিযে তোমাব pose expose কবেছিল। তুমি একটি আস্ত বোকা, ধবতেই পাবনি। অতি সহজেই

মেয়েবা পুরুষেব ফাঁকি ধবতে পাবেন। মেয়েদেব একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে, যাব জোবে—'

'যাব জোবে তোমাব বোকামি-মাখান কীর্ত্তিকলাপ অবলীলাক্রমেই তোমাব গৃহিনী ধবতে পাবেন, কেমন? তোমাব স্ত্রীজাতিব ওপব যে বকম প্রগাঢ় বিশ্বাস তাতে তোমাকে যে-কোন আশ্রমেই পাঠালে চলে—খুব বড চেলা হবে হে! পবে মোহন্ত পর্য্যন্ত উঠতে পাব! হযত তোমাব ওপব অন্যায় কবেছি। বার্ণাড শ পডে বোধ হয cynic হয়েছ—তাই ভাবছ মেয়েটি বোধ হয অতিশয় চালাক ছিল। চল, ওঠা যাক্ আজ সন্ধ্যাটাই মাটি, তুমি যাও সত্যেব সন্ধানে, আমি যাই স্বপ্নেব বাজ্যে। বার্ণাড শ পডোনা হে, যদিও পড, তাঁব গুরু বার্গসন পোডো না, বিপদে পডবে। আচ্ছা যদি এই নিযে একটা গল্প লিখি তা হ'লে 'বার্গসনেব বাহাদুবী' নাম দিলে কি হয?

'মন্দ হয না, কিন্তু 'Pose Exposed' নাম বাখলে আবো ভাল হয়।'

'একই কথা'।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান

বর্ত্তমান প্রবন্ধকে মোটামুটি বাংলা ও হিন্দী গানেব তুলনামূলক আলোচনা বলা যেতে পাবে। জগতেব সব গানেব মধ্যেই মূলগত একটা ঐক্য পাওয়া যায়, কাবণ জীবোৎপত্তি সর্ব্বস্থানে প্রায়একই ধাবা অনুসরণ কবেচে। অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য গানেব মধ্যে প্রকাশ কবেনি, এমন জাতি দুর্ল্ভ। তবু ভিন্ন ভিন্ন জাতিব রুচি তাদেব সভ্যতা-অনুযায়ী, একমাপে গড়ে ওঠেনি; তাই সঙ্গীতের শাখা-প্রশাখা, পত্রপুষ্প যখন বিকশিত হ'যে উঠেচে, তখন তাবা মূলকে অগ্রাহ্য না ক'বে-ও নিজেদেব মধ্যেব ব্যবধানে ও দূবত্ব স্থষ্টি কবেচে। একই উপাদান যে নির্ম্মাণে ভিন্ন হ'য়ে পড়ে, তাব কাবণ মানুষ ও জাতিব মধ্যে স্থষ্টিব বৈষম্য আছে। সৌন্দর্য্যেব অনুভূতিব প্রকাব এক হ'লেও স্থানকালপাত্র ভেদে প্রকাশের আকাব ভিন্ন হ'য়ে যায়।

হিন্দী ও বাংলা গান একই সভ্যতাব ছাযায পুষ্ট হ'য়ে উঠেচে। ভাবতেব আচাব-ব্যবহাব ও ভাষাব বিভিন্নতা অল্পবিস্তব থাকলেও তাব শিল্পকলাগুলি পরস্পব থেকে একেবাবে সম্বন্ধশূন্য হ'যে পড়েনি। হিন্দী ও বাংলা গানের সংস্পর্শ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-বেখাব ন্যায় স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হ'লেও অদৃশ্য নয়। এই প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য হিন্দী ও বাংলা গানেব বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত কবা—কে কোথায শ্রেষ্ঠ, কে বড়, কে ছোট ইত্যাদি মূল্যেব তাবতম্য বিচাব কবাব কোন উৎসাহ বা প্রয়াস লেখকেব নেই।

প্রথমে একটি অবান্তব বিষয়েব আলোচনা কবতে হবে। সেটি বাগে স্বরেব বৈচিত্র্য। স্বব-বৈচিত্র্যেব প্রকৃতি বুঝলে আমাব বক্তব্যটি, অর্থাৎ হিন্দী ও বাংলা গানেব মূলগত প্রভেদ, পবিস্ফুট হবে। বাংলা ও হিন্দী উভয় সঙ্গীতেই বাগবাগিণীর ব্যবহাব হযেচে। হিন্দুস্থানী গানে সাতটী শুদ্ধ ও পাঁচটী কোমল স্ববেব ব্যবহাব হয়। কিন্তু যখন গান গাওযা হয়, তখন দেখা যায়, যে-সব স্বব ব্যবহার হচ্চে, তাদেব সংখ্যা এই বারটীব দ্বাবা পূবণ হয় না। কযেকটা উদাহবণ দেওয়া যাক ঃ—

(ক) হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব কোমল স্ববগুলিব স্থান অনির্দ্দিষ্ট; পাশ্চাত্য স্বব-কম্পনেব সংখ্যা এখানে আমাদেব বিশেষ সহায়তা কবে না।

ভৈবব ও শ্রীবাগেব ঋষভ, মিয়ামল্লাব ও কানাড়াব গান্ধাব, ভৈববেব ধৈবত আন্দোলিত হ'য়ে পার্শ্বস্থিত শ্রুতি (quartertone বা microtone) স্পর্শ কবে, এবং তাদেব এই প্রকাব বাগেব আন্দোলন ব্যতিবেকে বিস্তাব কবা অসম্ভব।

(খ) যেখানে কোমল স্বব আন্দোলিত হয় না, সেখানে অনেক বাগে আবোহণে (চড়বার সময়) ও অববোহণে (নামবাব সময়) একই স্ববেব অল্প তাবতম্য ঘটে। টোড়ীর গান্ধাব; পুবিয়া ধানশ্রী, জৌনপুবী ও মালকোষেব ধৈবত; ভীম-পলাশীব নিষাদেব উল্লেখ কবা যেতে পাবে।

(গ) কাফী ঠাটেব কয়েকটী রাগে কোমল গ ও নি'ব আবোহণে প্রায় উচ্চ হওয়াব প্রবণতা থাকে।

(ঘ) বিহাগ ও শঙ্কবাব গান্ধাব ও নিষাদ অল্প উচ্চতা লাভ কবে। সোহিনী, হিন্দোল প্রভৃতি কয়েকটী বাগে ধৈবতে এই রকম পবিবর্ত্তন দেখা যায়।

এবকম দৃষ্টান্ত আবও অনেক আছে, কিন্তু বাহুল্যেব প্রয়োজন নেই। যে কোন প্রথম শ্রেণীব হিন্দুস্থানী গায়কেব গান মনোযোগ দিয়ে শুনলে এটা সুস্পষ্ট হবে। তাঁবা বাগভেদে স্ববভেদ এত অবলীলাক্রমে কবতে থাকেন যে, অনেক সময় বিস্মিত না হ'যে থাকা যায় না। এইজন্যে বাল্যকাল থেকে ওস্তাদেবা এই শক্তিব উৎকর্ষসাধনে সচেষ্ট হন এবং যোগ্য হ'লে অসামান্য দক্ষতা লাভ কবেন। ইন্দোবেব সঙ্গীতবতন নাসিরুদ্দীন, পুণাব আবদুল কবিম, লক্ষ্ণৌব শ্রীকৃষ্ণ বতনজনকব বা বামপুবেব মুস্তাক হোসেনেব নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নেওয়া যেতে পাবে।

কিন্তু লোককে বিপদে ফেলাব জন্যে ওস্তাদেবা এ জটিলতাব সৃষ্টি কবেননি। বংশানুক্রমে দীর্ঘকাল চর্চ্চাব পব তাঁবা জানতে পেরেছিলেন, স্বব আপনা হ'তে বাগবিশেষে নিজেব উচ্চতা, অনুচ্চতা বেছে নেয়, আব বুঝেছিলেন বাগেব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বহুল পবিমাণে এই স্বব-বৈচিত্র্যেব উপবেই নির্ভব কবে। য়ুবোপীয়বাও এ-খবব রাখেন, যদিও তাঁদেব সঙ্গীতে হার্ম্মনি-আবির্ভাবেব কারণে তাঁবা স্বববৈচিত্র্যেব দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নি। সেদিন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েব শ্রীযুক্ত Metfessel কয়েকটী প্রসিদ্ধ গায়কেব গ্রামোফোন রেকর্ড পবীক্ষা ক'বে দেখেচেন, তাঁদেব স্বব সব সময় স্বরকম্পন-অনুযায়ী নিখুঁত থাকে না, প্রায়ই অল্পবিস্তব ভ্রষ্ট হয়; এবং তাঁর মতে গানেব আর্ট অনেকটা এই বিচ্যুতিব দ্বাবা নির্দ্দেশ কবা যায়। আমাদেব দেশে এই স্বরবৈচিত্র্যেব সৌন্দর্য্য আজই আবিষ্কৃত হয়নি, আমাদেব সঙ্গীতে এব ব্যবহাব পূর্ব্বেও ছিল।

শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে হ'লে শ্রুতিব কথা না ক'যে উপায় নেই। শ্রুতি নিয়ে এত বিভীষিকাব উদ্ভব হ'য়েছে যে, একথাব উত্থাপন কবাতেও আতঙ্ক আসে। কিন্তু অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রী শুধু কথাব মাবপেঁচে এত রকম বাদানুবাদেব সৃষ্টি কবেচেন যে, এ-বিষয়ে নির্ম্মল আলো-বাযুব নিতান্ত

প্রয়োজন হয়েচে। শ্রুতিকে দুইদিক থেকে দেখা যায়। প্রথম আমাদেব প্রাচীন হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স্কেল (ঠাট বা মেল) নিরূপণে। এইদিক থেকেই কণ্ঠসঙ্গীতে উদাসীন পণ্ডিতেবা সব চেয়ে জোব দিয়েচেন। এবিষয়ে বিস্তাবিত আলোচনা এ প্রবন্ধেব বিষয়ীভূত নয়, কৌতূহলী পাঠক লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজেব প্রকাশিত 'Sangeeta'-ব প্রথম দুই সংখ্যা দেখতে পাবেন*। যেহেতু শাস্ত্রকাব বলেচেন যে, নি ও সা'ব মধ্যে চাবটী শ্রুতি, সা ও বে'ব মধ্যে তিনটী শ্রুতি আব বে ও গা'ব মধ্যে দুটী শ্রুতি আছে, অতএব কয়েকজন স্থিব করে বসলেন এবা য়ুবোপীয সঙ্গীতেব major, minor, semitone ছাডা আব কিছু নয। অথচ তাঁবা লক্ষ্য কবলেন না যে, এসব স্বব দবকাব-মত নিজেব শ্রুতিব সংখ্যা কমাতে বাড়াতে পাবে, এমন নজিব শাস্ত্রে আছে। সেদিন হৃদয়নাবায়ণ দেবেব প্রণীত 'হৃদয প্রকাশ' (১৭শ শতাব্দী) গ্রন্থে বাগভেদে যে স্ববেব শ্রুতিভেদ হয়,—তাব অনেক দৃষ্টান্ত পেযেছিলাম, অর্থাৎ দরকাব হ'লে একই স্বর যে চতুঃশ্রুতি, দ্বিশ্রুতি আব একশ্রুতি হ'তে পাবে—একথা লেখা ছিল। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। দ্বিতীয দিক থেকে শ্রুতিব যে সার্থকতা ছিল, তা' পুবোনো স্কেল আবিষ্করণেব গোলমালে চাপা প'ড়ে গেল। শ্রুতিব ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকাব বলেছেন—যা' শুনে চিনতে পাবা যায় (অভিজ্ঞেয়ত্বম্) এবং সঙ্গীতে যাব ব্যবহাব হ'তে পাবে (গীতোপযোগিত্বম্) তাবই নাম শ্রুতি। তাব থেকে এবং বাগ বর্ণনা থেকে এটা অনুমান করা শক্ত নয যে, শ্রুতিব ব্যবহাব ও প্রযোগ প্রাচীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেও ছিল। স্ববেব এই উচ্চ বা অনুচ্চ অবস্থাকে ইংবাজীতে intonation বলা হয়, আমবা বাংলাতে শ্রুতিভেদ কথাটা এইস্থানে ব্যবহাব কবতে পাবি। প্রাচ্য সঙ্গীতেব প্রধান বিশেষত্বগুলিব মধ্যে এইটী অন্যতম।

বাংলা ভাষায খেয়াল বা ধ্রুপদ গাওয়া প্রায় উঠে গিয়েছে। ৪০।৪৫ বৎসব পূর্ব্বে বাংলা ও পশ্চিম দেশবাসী কয়েকজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী খেয়ালী ও ধ্রুপদী হিন্দুস্থানী ঢঙে বাংলা ভাষায রচিত গান গাইতেন, তাতে আলাপ, তান সামান্যই থাকত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব চেয়ে তাব প্রকৃতি সবল ও সহজ ছিল। এমন কি, সে সময়কাব থিয়েটাবে হিন্দীগান ভেঙ্গে বিশুদ্ধ বাগে বাংলা গান বচনা হ'ত। কিন্তু এসব প্রাচীন গাযকদেব কাছে শোনা কথা, তার থেকে মাত্র অনুমান কবতে পারি, সে সময়কাব বাংলা গানে সামান্য শ্রুতিভেদ থাকাব সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধে

---

* দ্বিতীয সংখ্যায Nature of Hindusthani Raga-melody-প্রবন্ধে স্কেলেব পবিণতি ও শ্রুতিব সার্থকতা যথাসাধ্য পবিষ্কাব কবে বলতে চেষ্টা কবেছি।

আলোচ্য সঙ্গীত বর্ত্তমানেব, সুতবাং তাবই প্রকৃতি নির্ণয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হ'বে। বাংলা দেশে ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল সেন ও কাজী নজরুলকে নতুন ঢঙেব প্রবর্ত্তক বলা চলে। তাদেব প্রত্যেকেবই গানে একটী নিজস্ব ছাপ পাওযা যায, যদিও প্রায সকলেই দেশজ অর্থাৎ কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল, বামপ্রসাদী, পুবাতন টপ্পা ইত্যাদিব অনুকবণে গান বচনা কবতে দ্বিধা কবেন নি।

একথা বললে মিথ্যাব দাযী হ'তে হ'বেনা যে, বর্ত্তমান বাংলা গান হাবমোনিযমের সাহায্যে পুষ্ট হ'য়ে উঠেচে এবং এব কাল ২৫।৩০ বৎসবেব বেশী হ'বে না। উল্লিখিত সঙ্গীত বচযিতাদেব কাছে শুধু গলায় গান শোনবাব সৌভাগ্য হ'লেও, তাঁদেব গান হাবমোনিয়ম ছাডা বাইবে কোথাও শুনেছি বলে স্মবণ হয় না। হাবমোনিয়মেব অনুকবণে স্ববপ্রয়োগেব দরুণ শ্রুতিভেদ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। আমি বলচিনা, এব ব্যতিক্রম নেই বা সব জাযগায় গাযক হুবহু হাবমোনিযমেব সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান কবেন। আমি বাংলা দেশেব সাধাবণ অবস্থার কথা বলচি। সস্তা ও সুবিধাব যন্ত্র জাপানী মালেব মত চাবিদিক ছেয়ে ফেলচে, তা' ভাল কি মন্দ তাও এখানে বিচার্য্য নয়, কেবল তাব ফলে বাংলা গান কি বকম দাঁড়াচ্চে, সেইটেব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লেখকেব উদ্দেশ্য।

হাবমোনিযমেব কথা যখন এসেচে, তখন একটু সবিশেষ বর্ণনাই ভাল। যুবোপীযদেব শুদ্ধ স্কেল (diatonic scale) প্রায় আমাদেব বর্ত্তমান শুদ্ধ (বিলাবল) ঠাটেব মতন। Diatonic scale-এব শুদ্ধ স্ববগুলিব মধ্যে দূবত্ব অসমান। পিয়ানো বা হাবমোনিয়মে যখন এই স্কেল ব্যবহার হ'ল, তখন দেখা গেল যে, শুধু সা থেকে গান-বাজনা আবম্ভ কবলে, তাতে কাজ চলে, কিন্তু স্কেল যদি বদলায়, অর্থাৎ সঙ্গীতে বে, গা, মা, পা ইত্যাদিকে সা কবা যায, তা'হলে বহু নূতন স্ববেব প্রয়োজন হয। যুবোপীয় সঙ্গীতে স্কেল বদলান একটা বীতি, তাই তাঁবা দেখলেন, শুদ্ধ Diatonic scale ছাড়তে হয। ফলে একটি সপ্তক (octave) বারটী সুবে পবস্পব থেকে সমান দূবত্ব (equal temperament) মেপে ভাগ কবা হ'ল এবং সেইজন্য সা ছাড়া কোন স্বব শুদ্ধ বইল না। হাবমোনিয়ম এইভাবে শুদ্ধ স্বব থেকে ভ্রষ্ট হ'ল। যুবোপীয়েব সহজ প্রবৃত্তি হচ্চে সুবেব যুগপৎ ব্যবহাবেব সামঞ্জস্য (consonance), যেটা ভাবতীয সঙ্গীতেব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁদেব কানে এই tempered scale তত খাবাপ লাগেনা, কিন্তু যখন ভাবতীয় সঙ্গীতে এই যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহাব হতে আবম্ভ হ'ল, তখন ফলেব জন্য বেশী অপেক্ষা কবতে হ'ল না। একে ত হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স্বরগুলিব কিছুই

পাওয়া গেল না, তাবপব শ্রুতিব বা মিডেব বিশেষত্ব কিছুই থাকলনা।* দক্ষিণ ভাবতেও যে এই নিয়ে আন্দোলন আবম্ভ হ'য়েছে Madras Music Academy-ব প্রকাশিত সঙ্গীত-পত্রিকাব প্রথম তিন চাব খণ্ড তাব সাক্ষ্য দেবে। বাংলা দেশেই হারমোনিয়মেব প্রভাব সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই, পশ্চিমেও সাধাবণেব মধ্যে এব বিপুল প্রচাব হচ্চে। সুখেব বিষয় উচ্চ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব কোনো ক্ষতি এখনও হয়নি, কাবণ গায়কেবা এখনও তানপুবা ও সাবেঙ্গ ছাডা স্ববসাধনা কবেন না। তবুও সেদিন বেহাবেব এক সহবে হিন্দুস্থানী ওস্তাদদেব শুনলাম হাবমোনিয়মেব সাহায্যে খেয়াল শেখাতে, সে গান আব যাই হোক্ হিন্দুস্থানী গান নয়, একথা নির্ভয়ে বলা চলে। কলকাতায় আমাব একটী আত্মীয়া ছোট মেয়েকে গান শেখাবাব জন্য একজন খ্যাতনামা মুসলমান ওস্তাদ নিযুক্ত কবা হ'য়েছিল। ওস্তাদ নিজে তান-পুরায় গান অভ্যাস কবেচেন, কিন্তু এসে দেখলাম বালিকা গলার চেঁয়ে হাবমোনিয়মের উপব ভবসা বাখে। প্রতিবাদ কবায় তিনি বল্লেন, "কলকাতায় বাঙ্গালীব বাডীতে শিক্ষায় এই সাধাবণ বীতি এবং যদি ইচ্ছে কবেন তবে তানপুবাতে শেখাই।" আমাদেব ইচ্ছে সেইবকম হওয়াতে তিনি তানপুবাতে শেখান আবম্ভ কবেন।

বর্ত্তমানে আবাব আব এক বিপ্লব আবম্ভ হয়েচে। তরুণ বাঙ্গালী গায়কদেব হিন্দুস্থানী গান ভাল লাগে, তাই তাঁদেব মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুস্থানী তান, আলাপ, খোঁচ ইত্যাদি বাংলা গানেব মধ্যে প্রযোগ কবচেন।

*" If the Mohammedan 'Star' singer knew that the harmonium with which he accompanies himself was ruining his chief asset, his musical ear, and if the girl who learns the pianoforte could see that all the progress she made was a sure step towards her own denationalization as if she crossed the black water and never returned—they would pause before they laid such sacrilegious hands on Saraswati Excuses may be made for such practices, but there is one objection fatal to them all, the instruments are borrowed To dismiss from India these foreign instruments would not be to check the natural, but to prune away an unnatural growth" Music of Hindostan, p 16 Fox Strangways

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানগুলিতে (লক্ষ্ণৌ, ববোদা ও গোঁযালিযাব) হার্ম্মোনিয়ামেব প্রবেশ নিষিদ্ধ। গানেব সঙ্গে বা বাজাবাব জন্যে কোনভাবেই তাব ব্যবহাব নেই। Fox Strangways সাহেবেব কাছে ভাবতীয় সঙ্গীতেব অনেক কিছুই আবোধ্য ঠেকেছিল, কিন্তু তাঁব স্বদেশীযন্ত্রেব সম্বন্ধে বলতে বাধেনি " Hence the serious menace to Indian music of the harmonium, which has penetrated already to the remotest parts of India It dominates the theatre, and desolates the hearth, and before long it will, if it does not already, desecrate the temple Besides its deadening effect on a living art, it falsifies it by being out of tune with itself " Ibid p 164

এতে প্রথমে কোন কোন দিকে সামান্য সুফল দেখা গেলেও, হাবমোনিয়ম, আলাপ, তান, হিন্দুস্থানী খোঁচ ইত্যাদি মিশ্রিত হ'য়ে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত হয়েচে। অনেকে এব প্রতিবাদ কবচেন কিন্তু বর্ত্তমানে বেডিয়োব প্রোগ্রাম যে কোন বাত্রে শুনলে মনে হয়না তাতে বিশেষ কোনো ফল হচ্চে। সঙ্গীত-বচয়িতাদেব নিজেব বিশিষ্টতা যেতে বসেচে এবং এব যদি গতিবোধ না হয়, অদূব ভবিষ্যতে বাংলা গান নানাবিধ বিভিন্ন প্রকৃতিব সমন্বয়ে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে পবিণত হ'বে। গতিবোধেব ভাব আমাব হাতে নয়, আমাব কাজ শুধু অবস্থা-বর্ণনা। গাযকরা বলতে পাবেন, ভাবতীয সঙ্গীতেব বিশেষত্ব হ'ল তাব স্বাধীনতা। হিন্দুস্থানী গানে সঙ্গীত-বচয়িতাব স্থান খুব উর্দ্ধে নয়। অতএব বাংলা গানেব বচয়িতাব উচ্চস্থান না স্বীকাব কবলে, আমাদেব প্রাচ্য সঙ্গীত-বিধানেব বিরুদ্ধে কিছু কবা হ'ল তাও মনে হয় না। যাঁবা গায়কেব স্বাধীনতা দাবী কবেন, তাঁবা বলতে পাবেন যে, আজ যেটি কৃত্রিম বলে মনে হচ্চে, দশদিন পবে তাই স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে। আদিম মানুষ পাবিপার্শ্বিকেব ঘাত-প্রতিঘাতে বিস্তব বদলেচে, সে বৃক্ষতল ছেড়ে দববারেও পৌছিয়েচে। খাপ খাইয়ে নেবাব তাব যথেষ্ট শক্তি আছে। গানেব বেলায় চলাব দিকে প্রবণতা যে শুধু শাসনে স্থগিত থাকবে এমন মনে হয় না। এব শেষ সীমায পৌছাবাব সময আতিশয্যটুকু সৌষ্ঠবেব অভাবে ঝবে যাবে, এইটুকু ভবসাই আমবা কবতে পাবি। এটা অস্বীকাব কবা চলে না, হিন্দুস্থানী ঢং সামান্য পবিমাণে বাংলা গানে আনলে সৌন্দর্য্যেব বৃদ্ধি হয়। অতুল সেন ও কাজী নজরুলেব গানই তাব প্রকৃষ্ট উদাহবণ। কিন্তু সফলতা যখন সামান্য থেকে অসামান্য হ'তে চায়, অর্থাৎ বাংলা গান যখন পূবোপূবি হিন্দুস্থানী বেশ গ্রহণ কবতে চেষ্টা কবে এবং তাব ঢেউ যখন ববীন্দ্রনাথেব বিভিন্ন প্রকৃতিব সঙ্গীতে গিযে লাগে, তখন স্বতঃই মনে হয় "কোথা। কতদূব!" কিন্তু হাবমোনিয়ম ছাড়া আরও কযেকটী কাবণ আছে যাব জন্যে হিন্দুস্থানী ঢং বাংলা গানে আনা শক্ত।

হিন্দুস্থানী ও বাংলা সঙ্গীতে স্বববর্ণেব প্রয়োগে তাবতম্য আছে। স্বববর্ণেব সাঙ্গীতিক মূল্য খুব বেশী, কাবণ ব্যঞ্জনবর্ণেব মত তাবা কণ্ঠ দিয়ে আসবাব সময় জিহ্বা, তালু ইত্যাদি দ্বাবা ব্যহত হয না এবং তাবা মুখে দুটি স্ববকক্ষের সৃষ্টি কবে। এই স্ববকক্ষগুলিতে কণ্ঠেব স্বব ছাড়া অন্য স্ববেব অনুবণণ হয এবং ঠোঁট গোলাকাব ক'বে গালে অল্প জোবে আঙ্গুল দিযে আঘাত কবলেই সহজে সে-অনুবণণ শোনা যায়।* এই কাবণে স্বববর্ণেব ব্যবহাবে গানে খানিকটা অভিনবত্ব আসে। হিন্দুস্থানী গানে স্বববর্ণগুলিকে

* এই প্রসঙ্গে Marris Music College, Lucknow থেকে প্রকাশিত Sangeeta-ব দ্বিতীয় সংখ্যায় Nature of Hindustani Raga-melody দ্রষ্টব্য।

দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগই 'সা'তে গিয়ে শেষ হয়—

ই (মোরি) উ (ঝুম)
এ (কহে) অ (যব, ইংরাজীর Cup-এর u-এর ন্যায়)
আ (যাবো) আ——

'ই'-তে ওষ্ঠ দুইপার্শ্বে বিস্তৃত হ'যে প্রায় মিলিত হয় এবং 'এ' হ'যে 'আ'-তে যাবার পথে ক্রমেই গোলাকার হয়। 'উ'-তে মুখ ক্ষুদ্র গোলাকার হয় এবং 'অ' হ'য়ে 'আ'-তে যাবার পথে ক্রমেই বিস্তারিত হ'তে থাকে। হিন্দুস্থানী গানে স্বরবর্ণের উচ্চারণ বাংলার মত স্থির থাকে না, একের থেকে অন্যতে যেতে চেষ্টা ক'রে,—যে কথা 'উ'-তে আরম্ভ হ'ল, সে 'উ' ছাড়িয়ে 'ও'-তে যেতে চায়। বাংলাতে স্বরবর্ণ প্রায় খাড়াখাড়া ভাবে থাকে। হিন্দী 'মোসে' ও বাংলা 'মোর' কথাটি পাশাপাশি গানে ব্যবহার করলে অর্থ পরিস্ফুট হ'বে। মুসলমান গাইয়েরা বিশেষ ক'রে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য (modulation) দেখান। বাংলা গানে স্বরবর্ণের অচল অবস্থা গায়কের কল্যাণে সামান্য সচল হয়েচে,—গানে খানিকটা হয়ই। কিন্তু ঠিক হিন্দুস্থানী-কথার মোচড় তাতে দিতে গেলে, নমনীয়তার বদলে বিকৃতিরই সম্ভাবনা। এটা অবশ্য নির্ভর করে গায়কের ও শ্রোতার কানের উপরে। কোথায় তার সীমা ও কোথায় সেটা অতিক্রান্ত হ'য়ে অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে, এটা তাঁদের বিচার্য্য।

স্বরবর্ণ নিয়ে বলা হ'য়েছে, এবার শব্দতে উত্তীর্ণ হওয়া যাক্। হিন্দী গানে দরকার হ'লে উল্টেপাল্টে একই কথা বারবার গাওয়া যায় আর একটী শব্দকে টুকরো ক'রে বাড়ানরও রীতি আছে। অতুল সেনের 'আমার বাগানে এত ফুল, সে ত নাহি ফিরে চায়' গানটী নেওয়া যাক্। হিন্দী ঠুংরীর ছাপ অতি স্পষ্ট, গানের ঢঙেএ সহজেই তা' চোখে পড়ে 'সে ত নাহি ফিরে চায়' স্থানটী একটি ঠুংরীর 'তোসে নাহি বলু রে'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে গায়কের স্বতঃই চেষ্টা হ'বে 'সেত' কথাটী 'তোসে'র মত ভেঙ্গে 'সেত——', 'সে——ত , ইত্যাদি নানা প্রকারে হিন্দী কথার অনুকরণে বারবার বলা ও ভাঙ্গা। আজকাল শ্রুতিকটু লাগলেও কে জানে পরে এটা সহ্য হ'যে যাবে কি-না। পুরোনো ঢঙের টপ্পা শুনলে দেখা যায়, বাংলা গানে তান প্রায় শব্দের শেষ অক্ষর টেনে করা হ'ত। স্বর্গীয়া বিনোদিনীর 'এমন যে হবে প্রেম যাবে এ ত কভু মনে ছিল না' গানটীতে আরম্ভতে 'হবে', 'মনে', 'ছিল না' শব্দের শেষ অক্ষর টেনে তান নেওয়া হয়েচে। তানেতে বাংলা শব্দকে যে কখন ভাঙ্গা হয় না, এমন কথা নয়,—তবে সে তত সাধারণ নয়।

হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানেব মধ্যে কতকটা মিল থাকলেও তাদের প্রকৃতি সর্ব্বাংশে এক যে নয়, সেটা বোঝা যায় দুই বিভিন্ন প্রকৃতিব দবদে (emotional element)। এটা কথায় বোঝান শক্ত। দুটো যে এক নয়, তা' তীব্রভাবে কানে আসে যখন এক অন্যকে স্বস্থানভ্রষ্ট কবে। বেমানান ও অশোভন হচ্ছে, এ-ছাড়া অন্য কিছু তখন মনে আসে না। এব সীমাবেখাব নির্দ্দেশ কঠিন, তবু দুই সঙ্গীতে কথাব স্থান বিচাব কবলে খানিকটা পরিষ্কার হ'তে পারে। বাংলা গানে কথাব একটা গুরুতব অংশ থাকেই,হিন্দুস্থানী গানে যাব বিশেষ কোন অর্থ নেই। নিছক গানেব ভাব বাংলা গানে কথাকে একেবাবে অবহেলা কবতে পাবে না, যা' হিন্দুস্থানী গানে সম্পূর্ণ সম্ভব ও শোভন। বাংলায় অর্থেব জটিলতা সুবেব সঙ্গে খাপ খেয়ে চলে এমন বলি না, তবু গায়ককে অর্থেব দিকে দৃষ্টি বাখতে হযই। কথাব নডচড় কোথাও একটু হ'লে, শ্রোতাব বিবক্তিব অবধি থাকে না। বাংলা গান এর কারণে দোষার্হ নয়, তাব প্রকৃতিই এ বকম। হিন্দুস্থানী গানে শক্ত ও সূক্ষ্ম ভাব নেই বল্লেই হয, এবং একই গানেব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কবণ হ'লেও তাতে বসসৃষ্টিব অসুবিধা হয় না। লক্ষ্ণৌতে এক ওস্তাদ ও বাইজীকে একটি ঠুংবীব শুধু 'ওবি ননদিযা' কথাটী নিযে গাইতে শুনেছিলাম, মজলিসে শ্রোতাদেব উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও সজল চক্ষু দেখে মনে হয নি কেউ তাতে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন। এতটা সংক্ষেপ অবশ্য সাধাবণ নয়, তবে এক লাইন গেয়ে গান শেষ কবা অনেকবাবই শুনেছি।

কেউ কেউ বলবেন, বাংলা গানকে যে হিন্দুস্থানী ঢং-এ ঢেলে সাজবাব চেষ্টা হচ্ছে, এ কেন ? যাঁদেব নির্জ্জলা হিন্দুস্থানী ঢং ভাল লাগে, তাঁদেব জন্য হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংবীব অভাব নেই। তাঁদেব হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কৃতিত্ব প্রদর্শনেব পূর্ণ অবকাশ আছে। হিন্দুস্থানী উচ্চ সঙ্গীত বাংলায় বিদেশী নয। কতদিন থেকে বাঙ্গালী গায়কেবা তাব চর্চ্চা বেখেছেন, তাতে উত্তব ভাবতের সকলেবই দাবী আছে। হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান এতদিন স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি থাকল, আজ তাদের সংঘর্ষেব নতুন কিছু communal কাবণ ঘটেনি। বাংলা গান হিন্দুস্থানীব সঙ্গে টেক্কা দিতে পাবে না ব'লে তাব প্রতিষ্ঠা, সম্মান সব চলে যাবে, এমন কোন কথা নেই। আদান-প্রদান কাছাকাছি থাকলে হয়ই, কিন্তু সেটা উগ্র হ'য়ে যদি বাঙ্গালীব নিজস্ব স্বরূপ-প্রকাশেব পথ রুদ্ধ ক'বে ফেলে, তবে তা' বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী কারুব পক্ষে শুভ হ'বে কি-না ভাববার সময় এসেচে।

পশ্চিম থেকে এল হাবমোনিযম, তা'ও আবাব বিদেশীয় স্বরসম্বন্ধ নিয়ে, আমবা তাকে যোগ কবলুম প্রাচ্য সঙ্গীতের সঙ্গে। ফলে দাঁড়াল

এই যে বাংলা গান পূর্ব্বে যা ছিল তার লোপ হ'ল, যা কিছু সহরের বাইরে বাঁচল তাও যেতে বসেচে। বিদেশী সবই খারাপ নয়, কিন্তু গ্রহণেও সৌষ্ঠব জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাচ্য সঙ্গীতে বিদেশী ছাপ পড়েচে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত যে প্রাচ্যের কাছে কিছু নেয়নি এমন নয়। আন্তর্জাতিক পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-রক্ষার দোহাই দিয়ে কোন আর্টকে বাচাবার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি নেই। কিন্তু নেওয়ারও একটা রীতি আছে, আহৃতকে যদি আমরা নিজস্ব ক'রে না নিতে পারি, অর্থাৎ তাতে যদি ভারতীয় বিশেষত্বগুলি অটুট না থাকে, তবে সেটা ত্যাগ করতে হ'বে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে jazz আফ্রিকার নিগ্রো ছাপ নিয়ে এল, সেখানে লোকের তাই ভাল লাগে, কিন্তু মূল সূত্র তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু যেখানে হারমোনিয়ম রাগের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করে, সেখানে আপোষে মীমাংসা করা দুষ্কর। বাংলা রচয়িতাদের মধ্যে কারুর কারুর উপরে বিদেশীর ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তারা পূর্ণতা ও সুসংহতি লাভ করতে পারে। বাইজীদের ঠুংরীতে য়ুরোপীয় melody-র দু-একটা টুকরো কখনও কখনও শোনা যায়, কিন্তু সারেঙ্গির সঙ্গে তা' কিছু বেমানান লাগেনা। কিন্তু হারমোনিয়াম ছাড়া যদি তাকে গাওয়া না চলে, তবে তাকে নিয়ে ঘর করা মুস্কিল। সমাজের নিম্নস্তরের দিকে তাকালে ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হ'বে। সমস্ত উত্তর ভারতে বিলিতীর অনুকরণে কর্ণেট, ড্রাম, ক্লারিওনেট ইত্যাদির সহযোগে একরকম ব্যাণ্ড তৈরি হয়েচে। এদের গৎএর ১২ আনা ধাঁচ হ'ল বিদেশী। এরা উৎসবে ও ব্যসনে বাজায় এবং থিয়েটার ও সিনেমার হ্যাণ্ডবিল বিলি করে। পশ্চিমে কোন কোন সিনেমায় হারমোনিয়ম ও তবলা নিয়ে যে সুরসঙ্গতের সৃষ্টি হয়, তাতে বিজাতীয় অংশই বেশী। বাংলাতে ঘরে ঘরে অর্গ্যানে chord দিয়ে যে বাজনা হয় তাও প্রাচ্য নয়। এরা হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতে এসে না পড়লেও অবহেলার বস্তু নয়। ভারতীয় চিত্রকলায় একদিন য়ুরোপীয় অতি নিকৃষ্ট চিত্রের অনুকরণ আরম্ভ হ'য়েছিল, লোকে তা' বুঝেছিল আর তার প্রতিকারও হ'য়েচে। উচ্চ সঙ্গীতকে রেডিয়ো ও গ্রামোফোন কোম্পানীরা ব্যবসাদারির খাতাতে আমল দিতে চান না। প্রথম প্রথম ক্ষতিস্বীকার ক'রে কখনও দেখা হ'লনা সাধারণের কি ভাল লাগে। উচ্চ সঙ্গীতের প্রসার বাড়লে একদিন রুচির উন্নতি হ'বে কি-না তা বলা শক্ত। হিন্দুস্থানীর প্রভাব বাংলা গানে আমরা সইতে পারব, কারণ সে যাই হোক্ ভারতীয়, কিন্তু হারমোনিয়মের ধাক্কার জের কাটিয়ে বাংলা গান কতটা প্রাচ্য থাকবে, আজকাল তাই ভাববার বিষয় হয়েচে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়
লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজ

কবিতাগুচ্ছ

ভিক্ষা-উৎসব

গগনে মেঘেবা গবজায়,
ববষা তিমিব-ববণী,
সুন্দব, মম দবজায়
অতিথি আজিকে ধবণী।
নিদাঘ-সায়ব বাহিয়া
এসেছে সে মোবে চাহিয়া,
কি কাতব গীতি গাহিয়া
হৃদয়ে ভিড়াল তবণী!

তিমিবে নাহিয়া পবিল
মেঘ-ডুম্বুব প্রাবরণ,
সকল অঙ্গে ধবিল
ইন্দ্রনীলেব আভবণ,
বিদ্যুৎ তাব ঝলকে
স্নিগ্ধ সজল অলকে,
গাগবী ভবিয়া ছলকে
তীর্থ-সলিল আহবণ।

গগনে মেঘেবা গবজায়,
ববষা তিমিব-ববণী,
সুন্দব, মম দবজায়
অতিথি আজিকে ধবণী।
কথা ছিল, তাব লাগিয়া
বাতায়নে ব'ব জাগিযা
এ-হৃদয় অনুরাগিযা
উজলিব তার সবণি।

হায় গো আমার হৃদয়ে
নিবেছে প্রদীপ-সলিতা ;
তুমি জানো তাহা নিদয়ে,—
কেমনে তাহারে বলি তা' !
কথা ছিল, যবে আসিবে
জ্যোতিঃর জোয়ারে ভাসিবে,
উৎসব-বাতি হাসিবে
বিহগ-কাকলী-কলিতা।

সব গান মোর থেমেছে,
সুন্দর, তাহা জানো ত ?
নিবিড় আঁধার নেমেছে
ভরি' আঁখি-দুটি আনত।
তবুও সাহস নাহিরে
অতিথিরে রাখি বাহিরে,
এসেছে সে মোরে চাহিবে,
এ লজ্জা মোর মানো ত ?

ডেকেছিনু করি' দেয়ালা
বসন্ত নাহি ফুরাতে,
তখনো হৃদয়-পেয়ালা
ভরা ছিল মধু-সুরাতে।
তখনো দীপক বাজিছে,
দীপালিতে গৃহ সাজিছে,
সব-শেষে এল আজি সে
শূন্য হৃদয় কুড়াতে !

হায়, আমি মধু-ঋতুরে
পারিনি ধরিয়া রাখিতে,
এ কোন্ আলোক-ভীতুরে
বহে' ফিরি আজ আঁখিতে !
মন-দেওয়া-নেওয়া ফুরাল,
শিরাতে শোণিত জুড়াল,
দুহাতে কে পুঁজি উড়াল
বেসাতির বেলা থাকিতে !

গগনে মেঘেরা গরজায়,
ররষা তিমির-বরণী,
সুন্দর, মোর দরজায়
অতিথি আজিকে ধরণী !
এসেছে সে কত আশাতে,
কি গাহিব কোন্ ভাষাতে,
পারি যে কাঁদাতে হাসাতে
কোথা গীতি সুধাক্ষরণী।

তুমি যদি শুধু আসিতে,
আপনি দীপালি জ্বলিত।
না হয় ভালো না বাসিতে,
ফুলের ফসল ফলিত।
যদি ঐ দুটি চরণে
আঁকিতে শোণিতবরণে
পারিতাম, সুধাক্ষরণে
বিশুষ্ক হিয়া গলিত।

নব ররষার এ তিথি,
বন্ধু গো, তব দোষ নাই।
তোমারও কুটীরে অতিথি,
সেথা আজি তাই রোশনাই।
তাই ভালো, দাও ভুলায়ে,
উৎসব-দোলে দুলায়ে,
দুনয়নে আনি বুলায়ে
তব নয়নের জ্যোৎস্নাই।

বন্ধু, ও রূপ-রাশিতে
মোর রাত হবে রূপালী,
বাজিবে তোমার বাঁশীতে
আমারই ইমন-ভূপালি।
তোমারই উৎসবে গো
উৎসব মোর হবে গো,
তব দীপদানে র'বে গো
জ্বালা আমারই দীপালি।

সুন্দর, মোব কুটীরে
　　থাক্ থাক্ তুমি এসো না।
অশ্রু-নয়ন-ছুটিবে
　　কৃপা করে' ভালো বেসো না।
অতিথিবে ল'যে সাথে আজ,
তব উৎসব-বাতে আজ
যদি এসে জুটি, তাতে আজ
　　শ্লেষ ভবে শুধু হেসো না।

গগনে মেঘেরা গবজায়,
　　নব-বরষাব এ তিথি,
সুন্দর, মোব দবজায
　　ধবণী আজিকে অতিথি।
ভুলাও ঝলসি' চোখ তার
ভেদ ভিক্ষুক-ভোক্তার,
তব উৎসবে হোক্ তাব
　　মম উৎসব প্রতীতি!

গগনে মেঘেবা গবজায়,
　　ববষা তিমিব-ববণী,
সুন্দব, তব দবজায়
　　অতিথি আমার ধরণী।
ভুলে যেও কাল প্রভাতে
এসেছিল তব সভাতে,
আজিকে ভিখাবী লোভাতে
　　সাজো গো হৃদয়-হবণী!

শ্রীসুধীবকুমাব চৌধুরী

সমাপ্তি

আমাদের প্রেমে ফুরালো কথার পালা,
মন জানাজানি কিছু না রহিলো বাকী।
বাসনার দীপে নিবিলো নিবিড় জ্বালা,
বাসর-শয়নে নীরবে নমিলো আঁখি।
এবার কেবল আঁখিতে আঁখিতে লাগা,
দুটিতে মিলিয়া একটি স্বপনে জাগা।

এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা,
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।
এবার প্রেমেরে মনের আড়ালে মানা,
চির চেতনার চির বেদনারে ভোলা।
আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি,
এতখনে হলো উদ্দামতার ক্ষান্তি।

চুম্বনতাপ হিম হয়ে আসে ধীরে,
চুম্বনছাপ জাগিবে যামিনী ভোর।
ক'টি নিমেষের চকিত সুখস্মৃতিরে
জননীর মতো আবরিবে ঘুম ঘোর।
আমাদের প্রেমে এলো মরণের বেলা,
তারপরে, প্রিয়ে, আজ জনমের খেলা।

নবীন প্রেমের স্বপ্নে পোহাক রাতি,
মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে রও গো মনের পাছে।
অচির মরণে চির জনমের সাথী,
এখনো তোমারে চিত্ত আমার যাচে।
প্রভাতে হেরিবো তোমারি অচেনা মুখ
আমার পাশের উপাধানে জাগরূক।

আজিকার মতো ফুরালো হিয়ার দ্বন্দ্ব,
জানি ভালোবাসো, জানালাম ভালোবাসি।
মৃদু হয়ে এলো অধীর আবেগ অন্ধ,
মুদিত নেত্রে ভাতিলো তৃপ্ত হাসি।
আমাদের প্রেম এতই মধুর হ'লো,
আজিকার মতো তাই নিঃশেষে ম'লো ॥*

বাণীহারা

আমার দিন যায় কাজে অকাজে,
আমার নিশি যায় নিগূঢ় লাজে।
কেন যে আসা মোর, কেন যে থাকা
কালিও ঢাকা ছিলো আজিও ঢাকা।
হিয়ার হায়-হায় থামিলো না যে
জীবন বহে' গেল ফাঁকিতে ফাঁকা।

বীর সে করে' যায় পরাণ পণ,
মরণে মরে না রে তার স্মরণ।
কবি সে ছবি লেখে গানের ছাঁদে,
শতেক যুগ তার ক্রৌঞ্চী কাঁদে।
আমার আজ যদি আসে মরণ
কিছু কি বাঁধা রবে কালের বাঁধে?

এ শোভাবতী ধরা কাঁদায় মোরে,
কিছুই রাখি নাই, নয়নে ভরে'।
নূতন লাগে সবি, যতই হেরি,
রূপের পারাবার কূপেরে ঘেরি'।
জনম দিন মম চলে আজো রে
কিছুই চিনি নাই এ ভুবনেরি।

---

* ''একটি বসন্তে''র শেষ কবিতা

আকাশ ছুঁড়ে মাবে আলোব সোনা,
জমানো সোনা মোব যায় না গোণা।
পাখীবা গান হানে কানেব কাছে,
মবমে পশি গান চরণে নাচে।
পাগল কবে' দিল সুখ বেদনা,
প্রাণে কি আব মম চেতনা আছে!

জীবন যাবে তবু যাবে না বলা
কী মধুবতা দিলো অপথে চলা।
নয়ন মুদে চলি দিকে বিদিকে,
চুমিয়া যায় কাবা নাম না লিখে।
অপথে চলা মোব নয় বিফলা,
সকলে ভালোবাসে ভোলা পথিকে।

"ধন্য কবে' দিলে জীবন মম"—
কহিতে কথা বই মূকেব সম।
সে বাণী বুক ছাড়ি' মুখেব পানে
যখনি পাড়ি দেয়, হারায় মানে।
হে মোব প্রেমিকেবা, ক্ষমো গো ক্ষমো,
দিলে যা বহিলো না এ ক্ষীণ গানে।

যায় বে দিন যায়, যায় বে নিশা,
আমাব থেকে যায় দানেব তৃষা।
সকল দিতে চাই একটি স্তবে—
"ধন্য এসেছিনু ধনীব ভবে।"
ধনেব একে একে পেযেছি দিশা
দু'হাত খালি কবে' বিলাবো কবে?*

---

* "একটি বসন্তে"র একটি কবিতা

CREDO

মনেব কথা মনের মতো ক'বে
　　কইবো আমাব মনেব মতনকে
কবি হবাব নাই দুবাশা ওবে,
　　সাব মেনেছি সত্য কথনকে।
দৈব যদি হয় বে অনুকূল,
　　আয়ুস্ যদি আশাব মতো হয়,
প্রিয়াব কেশে পবিয়ে হিয়াব ফুল
　　জানিয়ে যাবো পূর্ণ পবিচয়।
যশ অপযশ এখন হতে কেন ?
　　হয নি আজো চরম দানেব দিন,
কীর্ত্তিবে ভাই ভুল্‌তে পাবি যেন,
　　নইলে আমাব কীর্ত্তি হবে ক্ষীণ।
মিথ্যা কবিস্ শক্তি পবিমাপ,
　　মোব তুলনা খুঁজিস্ বৃথা রে,
একটি প্রাণে বইলে প্রাণেব ছাপ—
　　ঐ তো আমাব সার্থকতা বে।
সবাব মাঝে না যদি হই বড
　　একটি হিয়ার শ্রদ্ধা যেন লভি,
প্রিযাব কাছে হইলে প্রিযতব
　　হলেম আমি যা হতে চাই সবি।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কব বায়

———

অর্দ্ধনারীশ্বর

সম্মুখেতে দুঃস্বপ্নেব মতো রুক্ষ কঠিন আকাশ,
পদতলে ষ্টীল্‌-নীল পাবহীন গভীব সাগব,
—দোলবাত্রি নহে, নহে কোজাগবী যামিনী জাগব,
খবসূর্য্য চক্ষে মোর, বসহীন শাণিত বাতাস
পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি' চলি' পর্ব্বতেব 'পর।
কৃষ্ণ পর্ব্বতেব স্থূল অঙ্গে নাই সবুজেব বাস—
উলঙ্গ পর্ব্বতে কভু উর্ব্বশীব পড়ে নাই শ্বাস।
চলিযাছি পূজিবাবে মন্দিবেব অর্দ্ধনাবীশ্বব।

উঠিলাম ক্লান্তদেহ শান্তমনে সর্ব্বোচ্চ শিখব—
কোথায় মন্দিব হায়। বর্ণহীন মরুভূ আকাশ,
আব শুধু তৃণশ্যাম সূচ্যাগ্র এ-কোমল প্রান্তব
আব শুধু বহুদূবে অন্তহীন উদাব সাগব—
অকস্মাৎ হেবিলাম মূর্ত্তি তাব ক্লান্ত গতভায।
ভাষাহীন দেঁহে মোরা পূজিলাম অর্দ্ধনাবীশ্বব।

বজ্রপাণি

কাল বজনীতে এসেছিল যবে বৈশাখীপূর্ণিমা,
আকাশেব গাযে লেগেছিল যবে শ্বেতচন্দনলেপ,
বাতাস দেখাল স্নিগ্ধ মধুব কুমাবীব ভঙ্গিমা—
তোমাব দূতেবে পাঠাইলে হায় রুদ্র বজ্রপাণি।

ফুলেবা শয়ান ডান্যাইযেব মতো প্রতীক্ষদেহমনে,
নিঃশাস মোব গন্ধে আতুব ভাবাক্রান্ত মোহে,
বাধিকা চাঁদেব আবেশ ঝবিছে সবুজ কুঞ্জবনে—
মুছে' দিলে হায় পিঙ্গলিমায় সোমপ বজ্রপাণি।

সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়াবে বক্ষে ধবি'
গলিতেছিলাম অর্থবিহীন সুমধুব কাকলিতে,
নাগবিকা মোর করুণ কোমল—মোদেবে লক্ষ্য করি'
দধীচিঅস্থি হানিলে কঠোব, কঠিন বজ্রপাণি!

সুগঠিত প্রেম, বাসনাবিলাস, উপবনপূর্ণিমা
দূব কবে' দিলে ঘোব ঝঞ্ঝায় চূর্ণ চূর্ণ কবি',
যে ভুবনে মোরে নিয়ে' এলে—কোথা নাবীদেহবঙ্গিমা?
তোমারে আমাব বন্ধু কবিয়া কি লাভ, বজ্রপাণি?

শ্রীবিষ্ণু দে

———

কবিতা

(রসেটির Troy Town পঠিতব্য)

আজ মাঝ-রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুট্‌বে যখন,
ঘুম ফেলে' দিয়ে তুমি চলে' এসো এখানে ;—কেমন ?
মুখোমুখি বসে' কবিতা পড়্‌বো আমরা ছ'জন।
(হেলেনের বুকে মনের বাসনা বেঁধেছে বাসা,
মনের বাসনা সকল কালের সব পুরুষের—
ভেঙে গুঁড়ো হ'লো ট্রয় !)

ছুট্‌বে বাতাস, শুক্‌নো বাতাস, কাঁপ্‌বে আকাশ ;
পূবের সবুজে দেখা যাবে লাল চাঁদের আভাস।
চুল খুলে' দিয়ে তুমি চলে' এসো এখানে ;—কেমন ?
(হেলেনের বুক নিখুঁত, নিটোল, নরম, সাদা,
ফলেছে সেখানে মনের বাসনা সব পুরুষের—
পুড়ে' ছাই হ'লো ট্রয় ।)

পূবের রেখায় গাছের সবুজ হয়েছে গভীর,
সেখানে ফুট্‌বে ছোট, একমুঠো চাঁদের আবীর।
মুখোমুখি বসে' কবিতা পড়্‌বো আমরা ছ'জন।
(হেলেনের বুকে ছ'টি পাকা ফল ভরেছে রসে,
বাসনার রসে সকল কালের সব পুরুষের—
পুড়ে' খাক্ হ'লো ট্রয় !)

আকাশের মাঠে ফুটে র'বে তারা ফুলের মতন,
উদার আকাশে হাজার তারার হাজার নয়ন—
মুখোমুখি বসে' কবিতা আমরা পড়্‌বো যখন।
(আফ্রোদিতের মন্দিরে গেলো অর্ঘ্য দিতে
স্পার্টার রাণী হেলেন—বাসনা সব পুরুষের।
—ভেঙে গুঁড়ো হ'লো ট্রয় !)

ঘুম ফেলে' দিয়ে তুমি চলে' এসো, খুলে' ফেলে' চুল,
এলোচুল তব হাল্‌কা হাওয়ায় উড়্‌বে আকুল—
শুক্‌নো বাতাস, ঠাণ্ডা বাতাস ছুট্‌বে যখন।
(হেলেন রচেছে অর্ঘ্য নিজের বুকের ছাঁচে—
সোনার বাটি সে—মনের বাসনা সব পুরুষের।
—চুরমার হ'লো ট্রয়।)

নড়্‌বে হাওয়ায় ঢিলে ব্লাউজের চওড়া কিনার,
চুলগুলি সব চোখে আর বুকে, চিবুকে তোমার
ঝর্‌বে হাওয়ায়;—কবিতা আমরা পড়্‌বো যখন।
(স্পার্টার রাণী ভিনাসের পায়ে আনতজানু—
সোনার সে-বাটি মধুর দুরাশা সব পুরুষের।
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয়!)

মেঝের ওপর মেঘের মতন শাড়ির আঁচল
লোটাবে তোমার;—আঁচল, ঘুমের মতন শীতল,
পুরোনো কবির পুরোনো কবিতা পড়্‌বো যখন।
(আফ্রোদিতেকে অর্ঘ্য দিয়েছে সোনার বাটি
স্বর্গ-দুহিতা হেলেন—দুরাশা সব পুরুষের।
—পুড়ে' খাক্‌ হ'লো ট্রয়!)

টেবিলের আলো হাতের বইতে, হাতে আমাদের;
চুলে আর চোখে ঘুম-ভাঙা, রাঙা আধেক চাঁদের
মলিন জ্যোছ্‌না—কবিতা আমরা পড়্‌বো যখন।
(সোনার সে-বাটি গড়া হেলেনের বুকের ছাঁচে
স্বাদে আর সাধে, বিষাদে ভরেছে সব পুরুষের—
ছারখার হ'লো ট্রয়।)

পৃথিবী নীরব, আকাশ নীরব, সব চুপচাপ,
কেবল বাতাস পাতায়-পাতায় বক্‌বে বিলাপ,
কেবল আমরা কবিতা পড়্‌বো—আমরা দু'জন।
(ভিনাসের পায়ে নতজানু হ'য়ে কহিছে কথা
দেবতা-দুহিতা হেলেন—কবিতা সব পুরুষের।
—চুরমার হ'লো ট্রয়!)

উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস,
বাতাসের ভাষা শুন্‌বে পাতারা, শুন্‌বে আকাশ ;
পুরোনো প্রেমের কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।
('আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিযাছি ভরে' সব পুরুষের।'
—গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'লো ট্রয়!)

বিশাল সাগর পার হ'য়ে এসে বাতাস পাগল
জানালার কাছে চীৎকার করে' আবোল-তাবোল
বক্‌তে থাক্‌বে—আমরা কবিতা পড়্‌বো যখন।
('চেয়ে দ্যাখো, দেবী, মোর দুই স্তন উঠেছে ফুলে',
স্বপ্ন—স্বর্গ—মৃত্যু—মহিমা সব পুরুষের।'
—পুড়ে' ঝুরি হ'লো ট্রয়!)

সারা পৃথিবীরে ঘুরে' ঘুরে' যাবে বাতাস পাগল,
সারা রাত ভরে' সকল পৃথিবী দেবে সে টহল,
আমরা দু'জন প্রেমের কবিতা পড়্‌বো যখন।
('এই নাও, দেবী, মোর উপহার—বুকের বাটি,
দাও তা'র মনে মনের বাসনা সব পুরুষের।'
—ঝুরি-ঝুরি হ'লো ট্রয়!)

বাতাসেব মুখে নৌকোর মত আধখানা চাঁদ
আকাশেব বুকে ছুটিতে থাক্‌বে—চাঁদ উন্মাদ।
উন্মাদ চাঁদ—উন্মন-মন আমবা দু'জন।
('দাও তা'ব মুখে স্বাদ আব সাধ আব বিষাদ
আমাব মুখের ;— সুদূব দুবাশা সব পুরুষের।'
—ছারখার হ'লো ট্রয়।)

এলো তব চুলে ঝিকিমিকি-আলো নাচ্‌বে চাঁদের,
মোবা মুখোমুখি, মোব হাতে বই, মাঝে আমাদেব
টেবিলেব 'পরে ঘন-নীল আলো জ্বল্‌বে ;—কেমন ?
('আমাব বুকেব দিকে চেয়ে দ্যাখো, আফ্রোদিতে,
তাহাব স্বপ্নে দাও এ-স্বপ্ন সব পুরুষের।'
—চুবমাব হ'লো ট্রয়!)

বই থেকে চোখ তুলে' মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমাব
আলো-ছায়া ভরা চুলে আব চোখে—চোখের তারাব
গভীব কালোয় ; তুমি মুখ তুলে' হাস্‌বে—কেমন ?
('দ্যাখো, মোব বুকে দু'টি পাকা ফল ভবেছে রসে—
বাসনাব বসে সকল কালেব সব পুরুষেব।'
—পুড়ে' খাক্‌ হ'লো ট্রয়!)

পুবোনো প্রেমেব পুবোনো কবিতা পুবোনো কবিব
গভীব প্রহবে মোদেব হৃদয়ে বাজ্‌বে গভীর,
ঘুমের সময়ে প্রেমেব লেখন পড়্‌বো যখন।
('জ্বালো তা'ব মনে বিশাল বাসনা, দুবাশা জ্বালো—
আমাব চুলেব স্বাদে ঘুম ভেঙে দাও প্যাবিসেব।'
—দাউ-দাউ জ্বলে ট্রয়!)

জানালার কাছে চীৎকার ক'রে মর্‌রে বাতাস,
জানালার কাছে মূরছি' পড়িবে ভোরের আকাশ।
মলিন আলোয় কবিতা পড়্‌বো আমরা দু'জন।
(স্পার্টার রাণী ভিনাসের পায়ে আনতজানু—
নরম চুলের স্বাদে ভেঙে গেলো ঘুম প্যারিসের।
—ছারখার হ'লো ট্রয়!)

* * *

পূবের সবুজে সাদা হ'য়ে ফোটে ভোরের আকাশ,
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ করে' চুপচাপ বসে' আমরা দু'জন।
(কোথায় ভিনাস! কোথায় বা সেই বুকের বাটি!
বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—
পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়।)

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অনুবাদ

বিচ্ছেদ

[প্রুস্তেব আট ভাগে প্রকাশিত 'অতীতের অন্বেষণে'-নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগেব প্রথম খণ্ড থেকে এ-কয় পৃষ্ঠা নেওয়া। প্রথমভাগে যে-সোযান্ ও ওদেতেব প্রেম ও বিবাহেব কাহিনী আছে, তাদেবই মেযে হ'ল জিল্‌বেৰ্ত সোযান্। গল্পের নাযক ও লেখক তাকে শিশুকালেই ভালোবেসেছিল—প্রায় জন্মেব পব থেকে বল্লেই হয়। এখানে সে জিল্‌বেৰ্ত-প্রেম শেষ হ'ল।]

সে বছব জানুযাবিব পযলা আমাব ভাবি কষ্টে কেটেছিল। অবশ্য দুঃখেব সময়ে বিশেষ স্মবণীয় তাবিখমাত্রেই আমাদেব পক্ষে কষ্টকব লাগে। যখন বন্ধু বিচ্ছেদ আমাদেব দুঃখেব কাবণ হয, তখন সে কষ্ট বৰ্ত্তমান অবস্থাব সঙ্গে অতীতের তফাৎটা বিশেষ স্পষ্ট কবেই ক্ষান্ত হয। আমাব বেলায়, কিন্তু, এ-বেদনাব সঙ্গে গোপন একটা আশাও ছিল। আমি ভেবেছিলুম জিল্‌বেৰ্ত বোধহয ভেবেছে আমাদেব মনোমালিন্যেব পবে পুনর্সন্ধিব চেষ্টাটা আমাব তবফ থেকেই হবে ও আমি সে-চেষ্টা কবলুম না দেখে নিজেই নব বৎসবেব সুযোগ পেয়ে চিঠি লিখবে। লিখবে: "কি হ'ল বলো ত? উন্মাদেব মতো প্রেমে পডে বযেছি, জানো? শীগ্‌গীব এসো। সব বোঝাপডা কবা যাবে। তোমায না দেখে কষ্ট পাচ্ছি।" গত বৎসবেব শেষ দিনগুলো যখন কেটে যেতে লাগ্‌ল, তখন এ-বকম একটা চিঠি পাওযা আমাব সম্ভব মনে হ'যেছিল। সম্ভাবনা হযত কিছুই ছিল না, কিন্তু কোনো কিছু সম্ভব মনে কবতে ত আমাদেব যুক্তিব দবকাব হয় না, আমাদেব ইচ্ছায়, আমাদেব প্রযোজনেই আমবা তা' মনে কবি। তাই ত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক মনে কবে যে শত্রুব গুলি তাব উপব এসে পড়তে অনির্দ্দিষ্ট কাল বিলম্ব আছে, ধবা পডবাব আগে চোবও দেবি আছে মনে কবে, মৃত্যুকালে মানুষও সেই বকম ভাবে। এই মনে কবাব বক্ষাকবচই লোককে বাঁচিযে বাখে,—অনেক সময়ে একটা জাতিকেও,—এবং বিপদ থেকে যে বাঁচায, তা' নয, বিপদেব ভয় থেকে বাঁচায, বিপদ যে আছে, সে-ধাবণা থেকেই বাঁচায। এই বকম মনে কবতে পাবে ব'লেই মানুষেব সাহস আসে, এবং বীবত্ব বিনাও সে বিপদটা জয় কবতে পাবে। এই রকম ভিত্তিহীন বিশ্বাসেই ঝগডাব পবে প্রেমিক চিঠিব আশা কবে। আমি যদি চিঠি পাবাব ইচ্ছা না কবতুম ত নিশ্চয়ই চিঠি পাব ভাবতুম না। যাকে ভালোবাসি তাব কাছে আমাব কী সামান্য মূল্য জানলেও আমবা এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, সে ত আমাব কথাই ভাব্‌ছে (যদিচ তাব ফল হয়ত ঔদাসীন্যই), আব সে এই ভাব্‌নাগুলো ত প্রকাশ কববে। মনে

করি যে, তাব চিন্তায আমাব প্রতি প্রেম না থাকুক্, তাব চিন্তাধাবা ত আমাকে নিযেই ; আমাকে নিযেই ত তাব জীবনেব পাঁক জটিল হ'ল। কিন্তু জিল্‌বের্তেব মনে কি হচ্ছিল, তা' ঠিক জান্‌তে হ'লে, কিছুকাল পবে যখন জিল্‌বের্তেব মনোযোগ বা ঔদাসীন্য, স্নিগ্ধতা বা কঠিনতা কিছু লক্ষ্যই কবব না, সেই ভবিষ্যতেব ঔদাসীন্য আমাব থাকা দবকাব ছিল। কিন্তু সে ঔদাসীন্য থাকলে নববর্ষেব এ-সব সমস্যা আমাব মনে উঠত না ও তাব সমাধান কববাব চেষ্টাও কবতুম না, কববাব কথা ভাবতুমই না। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে থাকে, তখন তাব প্রেমেব বিপুলতা তাকে ছাপিযে যায। তাব প্রেম বশ্মিব মতো প্রেম-পাত্রের দিকে ধায় এবং সেখানে লেগে যেখান থেকে বেবিযেছিল, সেখানেই আবাব ফিবে আসে। আমাদেব আবেগেব এই ফিবে আসাব ঢেউ আমাদেব মনে এসে লাগে এবং একেই আমবা প্রিয়াব দবদ ব'লে ভেবে থাকি। আব নির্গমেব অবস্থাটীব চেযে—অর্থাৎ আমাদেব প্রেমেব প্রসাবেব চেয়ে তাব প্রত্যাগমনই আমাদেব বেশি ভালো লাগে, কাবণ তাব সূত্রপাত যে আমাদেব মধ্যে থেকে, সে-কথা ইতিমধ্যে আমরা ভুলে যাই। নববর্ষেব প্রথমদিন জিল্‌বের্তেব চিঠি না পেয়ে কেটে গেল। সেবাব আবাব ডাকঘবেব কাজ বেশি হওয়াতেই হোক্ বা লেখাব দেবিতেই হোক্, শুভেচ্ছাবহ অন্যান্য চিঠি জানুযাবিব ৩বা ৪ঠা অবধি আমি পেযেছিলুম। সেই জন্যে পয়লাব পবেও আমাব আশা ছিল, যদিও সে-আশা প্রতি ঘণ্টায শুকিয়ে যাচ্ছিল। পবেব কদিন আমাব কান্নাব কুযাসায কাট্‌ল। স্পষ্টই বুঝলুম যে, জিল্‌বের্তকে আমি ছেড়েছি বলে আমাব যে-ধাবণা হ'য়েছিল, তাতে আন্তবিকতা কমই ছিল। আব তাই এ-চিঠিব আশা। সে আশা যখন আমি অন্য কোনো আশাব আশ্রয় নেবাব আগেই চলে গেল, তখন আমাব অবস্থা হ'ল মর্ফিয়াব একমাত্র শিশিটী ফুবিয়ে যাওয়াব পবে বোগীব মতো। কিন্তু আমাব ক্ষেত্রে বোধহয এব উপব (এবং এ-দুই ব্যাখাব মধ্যে যোগ আছে—একটী মনোভাবও বিরুদ্ধ বসেব সমন্বয়ে ঘটে) এই চিঠিব আশা আমাব মনে জিল্‌বের্তেব মূর্ত্তি আবাব তুলে ধবছিল ও আগে যে-বস তাব সাম্‌নে গেলে, তাকে দেখলে, তাব ব্যবহারে মনে উচ্ছ্বলিত হ'ত, সেই সব রস আবাব আমাব মনে কষ্টকবভাবে জেগে উঠছিল। পুনর্মিলনেব আপাত সম্ভাবনায একটী অত্যন্ত মূল্যবান শক্তি আমাব মধ্যে ফুটতে পায নি—সে হচ্ছে যা' আসে তা' মেনে নেওয়াব, স্বীকাব কবে নেওয়াব শক্তি। স্নাযুবিক বোগীদেব যখন আত্মীয-বন্ধুবা আশ্বাস দেয় যে, সর্ব্বদাই বিছানায় শুযে থাকলে ও চিঠিপত্র বা বই পড়া বন্ধ বাখলে তাবা সহজেই সেবে যাবে, তখন তাদের সে-কথা বিশ্বাস হয় না। তাদেব সত্যিই মনে হয যে, ওবকম সম্পূর্ণ বিশ্রামে তাদেব স্নাযু আবো অস্থিব হযে উঠবে। প্রেমিকবাও তেম্‌নি আসক্তির গণ্ডি

থেকে প্রেমের কথা ভাব্‌তে গিয়ে ত্যাগের শুভঙ্করতায় বিশ্বাস করতে পারে না।

সেই সময়ে আমার হৃদ্‌স্পন্দনরোগ বেড়ে উঠ্‌ল, ক্যাফিনের মাত্রা কমাতে বুক ধড়ফড়ও থাম্‌ল। এই দেখে আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, জিল্‌বের্তের সঙ্গে ঝগড়ার সময় থেকে যে-বেদনা বোধ করছিলুম, এই ওষুধই হয়ত তা'র আসল কারণ। তখন অবশ্য সে-বেদনা আমি যখনই বোধ করেছি, সব সময়েই মনে করেছি যে, এ-দুঃখ বোধ করছি তাকে আর দেখতে পাব না ব'লেই বা দেখতে পেলে সেই ঝগ্‌ড়াটে মেজাজেই দেখতে পাব ব'লেই। কিন্তু যদি এই ওষুধই সে-দুঃখভোগের কারণ হ'য়ে থাকে, তবে সে-দুঃখ আমি ভুল বুঝেছিলুম বল্‌তে হবে (আর তাতে আশ্চর্য্য কি ? প্রায়ই ত দেখা যায়, প্রেমিকের সব চেয়ে কষ্টকর দুঃখযন্ত্রণা, যে নারীর সঙ্গে সে বাস করছে, তার মূর্ত্তি ধরে আসে।) এবং এ-হিসাবে বল্‌তে হবে যে, আমার ওষুধ সেই কামৌষধের মতো, যা খেয়ে ট্রেষ্টান্‌ ইসোল্‌ডের কাছে বাঁধা পড়ে গেল। কারণ ক্যাফিন কমিয়ে আমার শারীরিক কষ্টের যতটুকু লাঘব হ'ল, তাতে আমার দুঃখ শেষ হ'ল না—সে-দুঃখ, আমার শরীরের টক্‌সিন্‌ সৃষ্টি না করুক্‌, অন্তত তীব্রতর করে তুলেছিল।

ক্রমে জানুয়ারির মাঝামাঝি এল, নববর্ষের চিঠি পাবার আশা গেছে, তার ব্যথাও শান্ত হয়েছে। কিন্তু আমার সে পুরানো বেদনা—সেই "ছুটীর" আগের বেদনা আবার সুরু হ'ল। আর নিষ্ঠুরতা তাতে এই ছিল যে, আমিই এ-বেদনা গড়ে তুলছিলুম—অজ্ঞাতসারে অবশ্য, কিন্তু গড়ে তুলছিলুম—আপন খেয়ালে, একাগ্র ধৈর্য্যে। আসল ব্যাপার ছিল জিল্‌বের্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আর আমিই সে-সম্বন্ধ বজায় রাখা অসম্ভব করে তুলছিলুম—এই দীর্ঘকালের বিচ্ছেদে—জিলবের্তের ঔদাসীন্য জাগিয়ে নয়, আমারই ঔদাসীন্য জাগিয়ে। এবং ঔদাসীন্য, তা সে তারই হোক্‌ বা আমারই হোক্‌, শেষে গিয়ে দাঁড়ায় একই জায়গায়। আমার মধ্যে জিলবের্তের যে প্রেমিকটী ছিল, তাকে অক্লান্তভাবে মন্থর ও কষ্টকর আত্মহত্যার পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলুম—কি করছি এবং কি পরিণাম তা' ভালো করে বুঝেও। কিছুকাল পরে আমি যে জিল্‌বের্তকে আর ভালোবাস্‌ব না তা' ত জানতুমই, এও জানতুম যে, জিলবের্ত নিজেও পরে অনুতাপ করবে এবং তখন সে আমার সঙ্গে দেখা করবার যে চেষ্টা করবে, তা' এখনকার মতোই ব্যর্থ হবে। তার কারণ, তখন আর তার প্রতি আমার এ-ভালোবাসা থাক্‌বে না। তার কারণ, তখন আমার প্রেম হ'বে অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে—যার জন্য আমার বাসনা হ'বে গভীর, যার জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করব। তখন এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশও আমি

জিল্‌বের্তকে দিতে পারব না। তার কারণ, জিল্‌বের্ত তখন আমার কেহই নয়। সে-সময়ে কিন্তু (যে-সময়ে জিল্‌বের্ত একটা বোঝাপড়ার অনুরোধ বা তার প্রেমস্বীকার করে না লিখ্‌লে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব না ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলুম, ও তারও লেখবার কোনো সম্ভাবনা নেই জেনে তাকে হারিয়েছি বলেই ধরে নিয়েছি ও তাই আগের চেয়ে ভালোবেসেছি এবং তার মূল্য যে আমার কাছে কত, সে কথা, আগের বছরের চেয়ে—যখন প্রায় প্রতিটি বিকাল, অন্তত যে-বিকাল আমার খুসি, তার সঙ্গে কাটাতুম ও যখন আমাদের বন্ধুত্বের যে কখনো শেষ হ'বে, তা' জানতুম না—সে আগের বছরের চেয়ে ঢের বেশি বুঝ্‌তে পেরেছি) সে-সময়ে কিন্তু জিল্‌বের্তের প্রতি আমার যে হৃদয়ভার ছিল, সে-হৃদ্যতা পরে অন্যের প্রতি সম্ভব হবে, এ-কথা ভাবতেও বিশ্রী লেগেছিল। কারণ, এ কথা ভাব্‌তে গেলে আমায় জিল্‌-বের্তের পরিধির বাইরে, তার প্রতি আমার প্রেম ও তৎঘটিত দুঃখবেদনার বাইরে চলে যেতে হচ্ছিল। আমার এ-প্রেম ও বেদনার মধ্যে জিল্‌বের্তের স্থানটী ঠিক কোথায়, চোখের জলের ভিতর তা' বিচার করতে লাগলুম এবং মানতেই হ'ল যে, এ-দুই বস্তু বিশেষ করে তারই জন্য নয়, কিছুকাল পরে এ-দুটি অন্য কোনো নারীর হাতেই যাবে। সেই জন্যই ত—অন্তত তখন আমি তাই ভেবেছি—আমরা মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একতা বোধ করতে পারি না। কাউকে যখন মানুষ ভালোবাসে, তখন মনে হয় যে, এ-প্রেম তাদের দুটীকে নিয়েই শেষ নয়, এ-প্রেম আবার ভবিষ্যতে ফুটতে পারে, কিম্বা হয়ত আগেই ফুটেছিল—এই মেয়েটীর জন্য নয়, আরেকটির জন্য। যে-সময়টীতে মানুষ প্রেম থেকে মুক্ত থাকে, সে-সময়ে যদি সে দার্শনিকের মতো বিচার করতে যায়—কি সে বস্তু যার জন্য প্রেমে এ বিরুদ্ধতা এসে পড়ে, তবে সে দেখতে পাবে যে, দার্শনিকের ধীরতায় যে প্রেমের কথা সে বিচার করছে, সে-প্রেম বিচারকালে সে বোধ করছে না এবং তাই সে প্রেমের তত্ত্বটী ধরতেও পারছে না। কারণ হৃদয়ব্যাপারের জ্ঞান ক্ষণে ক্ষণে আসে এবং বিচার্য্য বসটী বিচারকের মনে না থাক্‌লে সে-বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকাও অসম্ভব। যে ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতে আমি জিল্‌বের্তকে আর ভালোবাসব না, যে ভবিষ্যৎ আমি তখনও কল্পনায় সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু আমার বেদনা দিয়ে আন্দাজ করছিলুম, সেই ভবিষ্যৎ যে আস্তে আস্তে মূর্ত্তি নিচ্ছে, জিল্‌বের্তকে সে-কথা জানাবার সময় তখনও ছিল। তাকে জানাতে পারতুম যে, সে ভবিষ্যৎ আসন্ন না হোক্‌, অবশ্যম্ভাবী—যদি জিল্‌বের্ত আমাকে উদ্ধার করতে না আসে ও জায়মান আমার ঔদাসিন্যকে বীজাবস্থাতেই নষ্ট না করে। কতবারই না জিল্‌বের্তকে লিখ্‌তে বসলুম, তার কাছে যেতেও উঠ্‌ছিলুম—তাকে বলতে—"তোমার

জানা উচিত। আমাব ত মন স্থিব হযে গেছে। এই আমাব শেষ চেষ্টা—তোমাব সঙ্গে শেষবাব দেখা। অল্পদিনেই আমাব প্রেমে ছেদ পড়বে।” কিন্তু কি লাভ? জিল্‌বের্তে ছাড়া আব সকলেব প্রতিও যখন আমাব ঔদাসীন্য গভীব, তখন আমাব প্রতি তাব এ ঔদাসীন্য-সম্বন্ধে—আমাব মনোভাব অন্যবকম হ’লেও—তাকে আঘাত দেবাব আমাব অধিকাবই বা কি? শেষবাব! জেল্‌বের্তে'ব প্রেমে পড়ে আছি ব’লে আমাব কাছে কথাটাব মানে খুব গভীব অবশ্য। কিন্তু তাব কাছে এ-কথা নিশ্চযই আত্মীয়-বন্ধুবা বিদেশ যাবাব আগে দেখা কবতে আসবে ব’লে যে-চিঠি লেখে, সেই চিঠিব মতো, প্রেমেপড়া মেযেদেব এবং আমাদেব তবফ থেকে সমযাভাবে প্রত্যাখ্যাত বিবক্তিকব আহ্বানেব মতো কাজে লাগবে। সময় জিনিষটা আমাদেব হাতে ত কমে বাড়ে; আমবা নিজেবা যখন হৃদয-ব্যাপাবে বিচলিত হই, তখন সময খুবই বেশি থাকে, আমাদেব জন্য অন্যেব মনে আন্দোলনেব বেলায় সময কমে যায এবং বাকিটুকু ত অভ্যাস ভবিযে দেয়।

তা’ ছাড়া, জিল্‌বের্তে'ব সঙ্গে এ-কথা আলাপ কবে কিছু লাভ হ’ত না—সে আমায বুঝ্‌ত না। আমবা যখন অন্যেব সঙ্গে কথা বলি, তখনও মনে মনে ভাবি শ্রোতাটীব কান ও মন আমাদেবই কান ও মনেব মতো। আমাব কথা জিল্‌বের্তে'ব কাছে বিকৃত হয়ে পৌঁছাত যেন জলপ্রপাতেব শব্দেব সচল পর্দ্দাব ভিতব দিয়ে—এতটা বদলে গিয়ে যে চেনাই যেত না, অদ্ভুত অর্থহীন একটা শব্দেব মতো। যে-সত্যটী কথায় আমবা বল্‌তে যাই, সেই সত্যেব অনিবার্য্য শক্তি সে-কথায় আপনাআপনি ত আসে না। সে-কথাতে সত্যটীব রূপ সম্পূর্ণ হ’তে সময় লাগে। বাজনীতিব ক্ষেত্রে দেখা যায, একপক্ষেব মুখপাত্র বিপক্ষদলকে দেশেব শত্রুপ্রমাণ কবতে গিযে নিজেবই শত চেষ্টা সত্বেও কিছু কাল পবে সেই বিপক্ষেব মতটীকেই বিশ্বাস কবে বসে, যদিচ সেই বিরুদ্ধ মতটী তখন বিপক্ষ দলেব নেতা ত্যাগ কবেছে। সাহিত্যেব কোনো উৎকৃষ্ট সৃষ্টি যখন অনুবাগী পাঠকেবা চেঁচিয়ে পড়ে যায এবং তাব স্বতঃসিদ্ধ উৎকর্ষেব প্রমাণ পেতে পেতে মুগ্ধ হয়ে যায়, তখন যে-শ্রোতাবা বচনাটী ব্যর্থ ও বাজে মনে কবে, তাবাও কালে বচনাটী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব’লে মানে—যদিচ তখন লেখকেব এ স্বীকাবোক্তি শোনবাব উপায় থাকে না। সেই বকম, প্রেমের ব্যাপাবে বেড়াজালেব বাইবে যে আছে, সে বাইবে থেকে প্রাণপণ কবেও সে জাল ভাঙ্‌তে পাবে না। তাবপবে যখন আব এ-জালেব বাধায তা’ব কিছুই আসে যায় না, তখন হঠাৎ অন্য জায়গা থেকে চাপ এসে বেড়া ভেঙে দেয়। যে-মেযেটীব মনেব বেড়া আগে অত চেষ্টা সত্বেও ভাঙ্‌ল না, এখন সে বাধা বৃথাই চলে গেল। আমি যদি জিল্‌বের্তেব কাছে আমাব আগামী ঔদাসীন্য ও তাব প্রতিবোধকেব

কথা বল্‌তে যেতুম, ত সে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত কবে বস্‌ত যে, আমি তাকে যতটা ভালোবাসি আমাব বিশ্বাস, আসলে তা'ব চেয়ে বেশিই ভালোবাসি এবং এই মনে কবে তাব বিবাগ বেড়েই যেত। আব এ-কথাও বল্‌তে হ'বে যে আমার এই প্রেমেব জন্য আমাব মনে ক্ষণে ক্ষণে যে নব নব অসম্বন্ধ ভাবান্তব চল্‌ছিল, তাব দ্বাবা আমি আমাব প্রেমেব শেষ জিল্‌বের্তব চেয়ে স্পষ্ট কবে দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম। অবশ্য তবুও আমি জিল্‌বের্তকে চিঠি লিখে বা নিজেব মুখে এই পূর্ব্বাভাস জানাতে পাবতুম—যা হোক্‌, বিবহকাল ত যথেষ্ট দীর্ঘ হ'য়েছিল এবং জানালে বা জানাতে গিযে তাব বিবহসুখবোধ থেকে আমি বঞ্চিত হ'লেও, জিল্‌বের্ত্‌ যে সত্যিই অতটা অপবিহার্য্য নয়, কথাটা সেও ত জান্‌তে পেত। দুর্ভাগ্যবশত কয়েকটী লোক সে-সময়ে—ভালো কবতে বা মন্দ কবতে, যে উদ্দেশ্যেই হোক্‌, এমন ভাবে তাব কাছে আমাব কথা বল্‌তেন যে, সে নিশ্চযই মনে করছিল তাঁবা আমাব অনুবোধেই সে-সব কথা বল্‌ছেন। তাই যখন জান্‌তে পাবলুম যে, কোতার্‌, আমাব মা, এমন কি মঁসিয় দ-নোর্‌পোয়াও কয়েকটা অযথা অপ্রযোজনীয় কথায় আমার এত আত্মত্যাগ ব্যর্থ কবে দিলেন, তখন আমাব সংযমে যা' লাভ হ'ত তা' নষ্ট করে' দিলেন—যেন আমি সে আত্মসংযমেব গণ্ডি থেকে বেবিযে এসেছি, জিল্‌বের্তেব মনে এ-বকম একটা ভুল ধারণা কবে দিয়ে,—তখন আমার মেজাজ বেজায় খাবাপ হযে উঠ্‌ল। প্রথমত, আমাব কষ্টকব কিন্তু কার্য্যকব এই প্রেম কবা থেকে বিবতিব উদ্দেশ্য ব্যর্থ কবে দেওযায়, কবে থেকে যে সত্যিই আমি জিল্‌বের্ত সম্বন্ধে নিবৃত্তিমার্গ ধবেছি (জিল্‌বের্তেব কাছে তাঁবা আমাব সম্বন্ধে উপবোক্তভাবে কথা বলায) আমাব সে-হিসেব গুলিয়ে গেল।

শুধু তাই নয। এব পবে জিল্‌বের্তেব কাছে যাওযাব সে-আনন্দও আমাব পক্ষে কমে গেল। এব পরে গেলে, সে স্বভাবতই ভাবতে পাবে যে, আমি ভদ্রলোকেব মতো যা' গেল, তাব দাবী ছেড়ে দিয়ে থাক্‌তে না পেবে আড়ালে পাঁচজনেব সঙ্গে মন্ত্রণা কবে এই সাক্ষাৎকাব ঘটালুম—যে সাক্ষাৎকাবেব জন্য জিল্‌বের্তেব কোনোই আগ্রহ নেই। রাগে আমি এই সব লোকেব অকাবণে কথা বলাব অভ্যাসকে গাল দিতে লাগলুম। অবশ্য এ-কথা সবাই জানে যে, ক্ষতি কববাব জন্য বা কোনো উপকাবে আস্‌বাব জন্য এবা কথা বলে না, কথা বলা স্বভাব ব'লেই বলে,—অনেক সময়ে তাদেব সামনে আমবা সে-প্রসঙ্গ তুলেছি ব'লেও বটে। কিন্তু তাদেব (আমাদেবই মতো) এই বিবেচনাব অভাব ঠিক চবম সময়টীতে প্রকাশ পেয়ে আমাদেব কী ক্ষতিই না কবে! অবশ্য এ-কথা সত্য যে, আমাদেব প্রেমেব মৃত্যু নিযে যে নিরানন্দ নাটক অভিনীত হয়, তা'তে যে দুটী মানুষ—একজন বেজায়

ভালোমানুষ ও আবেকজন মোটেই তা' নয় ব'লে—ঠিক শেষ বোঝাপড়াব সময়টাতে সব গোলমাল কবে দেয়, সে-ছুটি মানুষেব মতো এ-সব লোকদেব ভূমিকা বিশিষ্ট নয়। আমাদেব বাগটা তবুও ছুজনেব উপবে না প'ড়ে পড়ে বেশি এই সব স্থানকালজ্ঞানহীন সংসাবেব যত কোতাব্‌দেব উপবেই—ও-ছুজনেব উপব যে পড়ে না, তাব কাবণ আব কিছুই না—তাব কাবণ ও-ছুটীব দ্বিতীয়টী আমবা যাকে ভালোবাসি সে এবং প্রথমটী আমবা নিজেবাই

অনুবাদক—শ্রীবিষ্ণু দে

———

পুস্তক-পরিচয়

শেষ প্রশ্ন—শ্রীশবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্‌স্)

'শেষ প্রশ্ন' শেষ কবিবাব সঙ্গে সঙ্গেই একটী প্রশ্নেব কথা মনে পডিযা গেল। প্রশ্নটী কষিয়াছিলেন শবৎচন্দ্র দিলীপকুমাবকে। কোন এক ওস্তাদেব গান শুনিতে অনুরুদ্ধ হইযা, গুডগুডিব নল ছাডিযা উঠিতে একান্ত নাবাজ শবৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"গায ত ভালো, কিন্তু থামে ত ?" শবৎচন্দ্র যে কত বড শিল্পী, তা' এই একটী ছোট্ট টিপ্পনী হইতে বোঝা যায। প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি কবিতে হইলে—শিল্পকলাব যে কোন প্রকাবেই হোক্ না কেন—শুধু ভাল গাহিলেই চলে না, থামিতে জানা চাই। শিল্পীমাত্রেই জানেন, বলাব চেযে, এমন-কি ভাল বলাব চেয়েও, না-বলা কত বেশী কঠিন। বলাব একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে, একবাব বলিতে আবম্ভ কবিলে থামিতে ইচ্ছা কবে না। ক্রমাগতই বলিযা যাইতে লোভ হয়, যে-সূক্ষ্ম সীমা বেখায আসিযা কলমকে নির্ম্মমভাবে চাপিযা ধবিতে হয, তাহা কখন পাব হইযা যায, খেয়াল থাকে না, ফলে এত সাধেব রূপসৃষ্টি শ্রীহীন বিকাবে পবিণত হয়। একমাত্র শিল্পীই জানেন, কত প্রলোভন জয, কত অবান্তব আকর্ষণকে জোব কবিযা প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে কবিতে হয়—এ-বিষযে তাঁহাব সংযম সংসাবত্যাগী সন্ন্যাসীব সংযমেব চেযে কম নয়। শবৎচন্দ্রেব লেখায এই সাধন-সুকঠিন সংযমেব যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায। পদেব সুমিতপ্রয়োগে, বাক্যেব সুবিন্যস্ত গতিতে, বক্তব্যেব সুসীম নিশ্চযতায, চিত্রিত চবিত্রেব সুনির্দ্দিষ্ট স্পষ্টতায তাঁব বচনা বাংলা কথাসাহিত্যেব একদিক আলোকিত কবিযা বাখিয়াছে।

কিন্তু চাবিশত পৃষ্ঠাব এই সুবৃহৎ গল্পটী পডিতে পডিতে সন্দেহ হইল—শবৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন ? তিনি কি ভুলিয়া গেলেন শিল্পসৃষ্টি হয শুধু সৃজনেবই তাডনায়, অন্য যে-কোন উদ্দেশ্য সৃজনেব পক্ষে শুধু অবান্তব নয়, অন্তবায ? কাবণ, 'শেষ প্রশ্নে' তাঁহাব সৃজনী-প্রতিভাব পবিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি কবা হয না। পডিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহাব মধ্যে এমন একটি চবিত্র বা ঘটনা নাই, যাহা তাঁহাব শিল্পী-মনকে উদ্বোধিত কবিযাছে। ঘটনা ত সংক্ষেপে এই যে, আশুবাবুর কন্যা মনোবমাকে কমলেব তথাকথিত স্বামী শিবনাথ ভুলাইয়া লইলেন, আব মনোবমাব দয়িত অজিতকে শিবনাথেব "শিবানী" ছিনাইয়া লইলেন—একান্ত বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সুপবিচিত অদল-বদলেব কাহিনী। আশুবাবু, অবিনাশ, অক্ষয, হবেন, অজিত, সতীশ, বাজেন, মনোবমা, নীলিমা, বেলা ইত্যাদি আব যে-সকল চবিত্র এই গল্পে স্থান পাইযাছে, তাহাদেব অনুরূপ চবিত্র আমবা শবৎচন্দ্রেব অন্যান্য গ্রন্থে বহুবাব পাইযাছি। কমলকে 'চবিত্র' বলা কোনক্রমেই চলে না—সে কতকগুলা কথাব সমষ্টি মাত্র, যে কথাগুলিব মধ্যে পূর্ব্বাপব চবিত্রগত সুসঙ্গতি খুঁজিযা পাওযা অসম্ভব। এই কমলই হইতেছে 'শেষ-প্রশ্নেব' মুকুটিত কীর্ত্তি—অথবা অপকীর্ত্তি। সমস্ত আখ্যাযিকাটী তাহাবই চাবিপাশে ঘুবিতেছে,—আগ্রাব প্রবাসী-বাঙ্গালী-পতঙ্গেব দল তাহাব বিজাতীয রূপবহ্নিব চাবিপাশে যেমন ঘুবিযা বেডাইত। ঘটনাগুলি ঘটান হইতেছে এমনভাবে যাহাতে কমলেব সুযোগ হয, হয কডাকড়া কথা কহিবাব, না-হয় অভাবিত চমকপ্রদ কোনকিছু কবিবাব। অধিকাংশ

ঘটনাই আকস্মিক, অসুস্থ আকস্মিকতার অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত গল্পটীকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে। গল্পটী প্রথমতঃ মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্যভাবে বাহির হইয়াছিল। মনে হয় যেন লোকপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতি সংখ্যায় কিছু কিছু 'শক্' দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। একই দেহে বিভিন্ন অবয়বের মত, একই গল্পে বিভিন্ন ঘটনা, প্রত্যেকে, বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে- ইহাই হইল কথাশিল্পীর আদর্শ। সে-আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এক কদাকার monstrosity-র জননী হইয়া বসিয়াছে।

কথা উঠিবে, গল্প-রচনার এই কি একমাত্র আদর্শ? অন্য আদর্শ কি নাই? বোর্জা কি বলেন নাই, মানুষের জীবন নদীর মত, নিজের পথ কাটিয়া চলে, আর গল্প-সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ, তাহাও কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় আবদ্ধ নয়, তাহাও পথ কাটিয়া চলে? জয়স্, প্রুস্ত্, এঁরা কি কোন প্লট্ মানিয়া চলেন? আকস্মিকতার ছড়াছড়ি কি তাঁহাদের রচনায় পাওয়া যায় না?

কথাগুলি নিছক সত্য—কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। চেতনার ধারা বাহিয়া যে-নূতন ধরণের উপন্যাস ইউরোপে লিখিত হইতেছে, শরৎচন্দ্র সে-পথের পথিক নন্। 'শ্রীকান্ত'কে অবশ্য বোঁলাবর্ণিত নদীর সহিত তুলনা করা যায়—এবং কোন রসিকপাঠকই তাহাতে প্লটের বাঁধুনি খোঁজে না। কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' ত সে-শ্রেণীর উপন্যাস নয়। সনাতন আরিষ্টোট্‌ল্-এর সূত্র-অনুযায়ী এ-গল্পের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ আছে। কাজেই ইহাতে ঘটনা-গ্রন্থন সুসংবদ্ধ ও চরিত্র-চিত্রন সুসঙ্গত হওয়া দরকার। বাঁদর গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ হয় না কিন্তু শিব গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ না দিয়া চলে কি?

শোনা যায়, শরৎচন্দ্র নাকি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ষাটবার—অথবা একশ ষাটবার?—পড়িয়াছেন। শুনিবার প্রয়োজন হয় না, 'শেষ প্রশ্নের' প্রতি পৃষ্ঠায়—শুধু কমলের জন্মবৃত্তান্তে নয়—'গোরা'র প্রভাব ধরা যায়। দুটী বইতেই দেশের ও জাতির —তথা মানবজাতির—নানা সমস্যাকে নানা দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে। দু'জনেই শক্তিমান লেখক—অথচ কী বিরাট পার্থক্য। 'গোরা'য় বিতর্কগুলি কাঁটার মত উচাইয়া নাই, লতা-পাতা-ফুলের সহিত মিশিয়া একটী অখণ্ড সম্পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। তর্কের জন্য গল্পের স্রোত কোথাও ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না— তাহার প্রধান কারণ তাহার তর্কের পাত্রগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কাজেই তাহাদের বক্তব্য শুধু তর্ককেই জটিল করিয়া তোলে না, তাহাদের চরিত্রকেও স্ফুট করিয়া দেয়। আমাদের মস্তিষ্কও যেমন তুষ্ট হয়, রসবোধও তেমনই তৃপ্ত হয়। কিন্তু 'শেষ প্রশ্নে' কমলের সহিত যাহারা তর্ক করে তাহাদের যেন কোন আন্তরিক স্বকীয় বিশ্বাস নাই, তাহারা কথা কয় শুধু কমলকে কথা কহাইবার জন্য—কমলের বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশীলতার প্রাখর্য্যকে জাহির করিবার জন্য। সাহিত্যেই হৌক্ বা জীবনেই হৌক্, জাহির করিবার প্রয়াস সর্ব্বদাই অশোভন—আর এই অশোভনতাই 'শেষ প্রশ্নের' প্রধান কলঙ্ক।

অনেকের মতে, আধুনিক উপন্যাসে এ-দোষ দোষই নয়। আধুনিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য লঘু নয়, গুরু; চিত্তরঞ্জন নয়, সত্যানুসন্ধান। কাজেই কোন গভীর তথ্য বা জটিল সমস্যার অনুধাবনে গল্পের গতি নিরুদ্ধ হইলেও আপত্তি করা ছেলেমানুষি

গল্প-প্রিয়তাব পবিচায়ক। হয়ত কথাটা সত্য, হযত আমাদেব মর্ম্মেব নিভৃত কন্দবে যে-শিশুমন নিবন্তব গল্প শুনিবাব জন্য বাযনা কবে, তাহাকে তর্কেব চড মাবিযা শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। তবু মনে হয ইহাকে কি বলা চলে না—রুটিব বদলে পাথব দেওয়া? একথা নিশ্চিত যে, গভীব সত্যেব মধ্যে যে-বস আছে, গল্পপ্রিয় শিশুমন সে-বস উপভোগেব উপযুক্ত অধিকাবী নয। কিন্তু 'শেষ প্রশ্নে' যে-সকল তথ্যকে বড গলায প্রচাব কবা হইয়াছে তাহা ত ইউবোপীয সাহিত্যেব হাটে বাসি মাল, প্রায বস্তাপচা হইতে চলিল। এই ভাবেব হাটেব দলাদলিই কি তবে শবৎচন্দ্রেব কৃতিত্ব? পাঠকেব মনে চিন্তাব উদ্রেক, উপন্যাসকাবেব প্রধান উদ্দেশ্য বলিযা ধবিযা লইলেও জিজ্ঞাসা কবা যায, দীর্ঘায়িত তর্কালোচনাই কি তাহাব শ্রেষ্ঠ পন্থা? সংযত মিতভাষী 'অভয়া'ব পাঁচটী কথায যে-তেজ, যে-দীপ্তি, যে-শক্তি আছে বক্তৃতাময় কমলেব বাগাডম্ববে তাহাব সন্ধান পাওয়া যায কি? 'চতুবঙ্গে'ব মধ্যে তর্কেব অংশ কতটুকু, অথচ বিশ্বসাহিত্যে কটা বই আছে যা' তাব চেয়ে বেশী কবিয়া মানুষকে ভাবিতে শেখায?

আসল কথা, আমাদেব দেশেব বর্ত্তমান সামাজিক ও বাজনৈতিক দুববস্থা শবৎচন্দ্রেব ভাবপ্রবণ অন্তবকে পীডিত কবিযাছে—'শেষ প্রশ্ন' এই পীডনেব তীব্র প্রতিঘাত; শিল্পসৃষ্টিব প্রেবণায় ইহা বচিত নহে। তাই শবৎচন্দ্রেব দেশপ্রীতিকে শ্রদ্ধা কবিয়াও বলা যায়, যে-সাহিত্যেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্রষ্টা না হইয়া সংস্কাবক হইযা ওঠেন, সৃজনেব অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে বড কবিযা দেখেন, রূপকাবেব বৃত্তিকে উপেক্ষা কবিয়া উপকাবে প্রবৃত্ত হন, হে ভগবান, সে-সাহিত্যেব ভবিষ্যতেব প্রতি তুমি দৃষ্টি বাখিয়ো!

শ্রীনীবেন্দ্রনাথ বায়

অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প—শ্রীবুদ্ধদেব বসু (চতুবঙ্গ)

বন্দীর বন্দনা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু (ডি, এম্, লাইব্রেবী)

"অভিনয়, অভিনয নয ও অন্যান্য গল্প" বুদ্ধদেব বসুব প্রথম প্রকাশিত গল্পেব বই। গল্পগুলি আগে নানা মাসিক পত্রিকায প্রকাশিত হ'যেছিল, সুতবাং বাঙালী পাঠক পূর্ব্ব হ'তেই এগুলিব সঙ্গে স্বল্পাধিক পবিচিত। এখন আবাব গল্পগুলিকে এক সঙ্গে পেযে, ভাল ক'বে তাদেব বসাস্বাদনেব সুযোগ উপস্থিত হ'যেছে। বুদ্ধদেবেব গল্প যে বাঙলা সাহিত্যে নূতন মালেব আমদানী কবেছে একথা বলাই বাহুল্য। আমাব কাছে এঁব গল্পগুলি বিশেষ ক'বে মূল্যবান, কেননা এবা আমাব অনেকদিনেব বাঙলা গল্প পডাব অতৃপ্তি দূব কবেছে। কিন্তু এ সকল কথা আলোচনাব আগেই প্রসঙ্গান্তবে এসে পডতে বাধ্য হচ্ছি। বইখানিব মলাট-পবিচযে এই দাবী উপস্থিত কবা হ'যেছে যে, বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমি বোমান্টিসিজ্‌ম্-এব জোয়াব এতদিনে মন্দীভূত

হ'বার পর যে-নবীন রিয়্যালিজ্‌ম্‌-এর স্রোত গ্রন্থকার—ও আর কয়েকজন—আনয়ন করেছেন, তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হ'ল এই বইখানি। আর এও বলা হ'য়েছে,—যে-রবীন্দ্র প্রভাবে সাহিত্যে এতদিন রঙিন স্বপ্নের বেসাতি চলছিল, গ্রন্থকার আপনাকে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত করেছেন। কথা দু'টি ঘুরে ফিরে একই, কিন্তু ঠিক যেন এর জাজ্বল্য মান প্রতিবাদ-স্বরূপই দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রথম গল্পটি "প্রথম ও শেষ"। এ গল্পটি অন্ততঃ রবীন্দ্র-প্রভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন। দু'টি বাল্য সখীর পত্র বিনিময় সূত্রে গল্পটি গাঁথা। উভয়েই বাল্যকাল থেকে পণবদ্ধা যে, যতদিন না প্রকৃত-প্রণয়ী এসে হৃদয়দুয়ারে আঘাত করছেন, ততদিন প্রত্যেকে আপনার কুমারী জীবন অক্ষুণ্ণ রাখবেন। একজন কিন্তু পণ ভঙ্গ ক'রে মামুলি প্রথায় বিবাহ করলেন, অপরটি তাকে ধিক্কার দিয়ে আপনার প্রেম-প্রতীক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্পা রইলেন—এই থেকে গল্পের সুরু। তাঁর প্রেম-প্রতীক্ষা সার্থক হ'ল,—কিন্তু ট্রাজিক্ সমাপ্তিতে। প্রণয়ী তাঁর কাছে এসে ধরা দিলেন কিন্তু প্রণয়জ্ঞাপন হ'ল এক গভীর রাত্রে ঘোর ঝঞ্ঝা ও বর্ষা মাথায় ক'রে। ফলে প্রণয়ীর হ'ল নিউমোনিয়া ও তাতেই মৃত্যু। এই প্রেম-প্রতীক্ষারতার বেদনা ঝঙ্কৃত হ'য়েছে গল্পটির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। সে-বেদনাকে নিবিড় করেছে লেখকের অনন্য-সাধারণ লিপি-দক্ষতা। গল্পটি প'ড়ে একেবারে মুগ্ধ হ'তে হয়, কিন্তু এর ওপর রবীন্দ্র-প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর ভাষার বিন্যাসে, এর জল, নদী, বর্ষার বর্ণনায়, এর পরিত্যক্ত পুরাতন বাড়ীর রহস্যগভীর চিত্রাঙ্কনে, সর্ব্বত্র রবীন্দ্র-প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের কলম তুলে নিয়ে লেখক রচনা করেছেন এই গল্পটি। এটা কোন অগৌরবের কথা নয় বরং গৌরবেরই, কেননা লেখক রবীন্দ্র-প্রভাবকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ক'রে আপন বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা সমুজ্জ্বল করেছেন। অন্যের হাতে এটা হয়ত হ'ত শুধু অনুকরণ কিন্তু এক্ষেত্রে হ'য়েছে লেখকের স্বকীয়তার পরিচায়ক।

মিছে এ কথা বলা যে, এ গল্প রিয়ালিষ্টিক্। তা' যদি হয় তবে বঙ্কিমকে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌-এর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, অন্ততঃ তাঁর "বিষবৃক্ষ"কে নয়। কেননা সুন্দরী যুবতী প্রেমপরায়ণা স্ত্রী থাকতে বিধবা পরস্ত্রীর প্রতি ধাবমান হওয়ার চেয়ে সেরা রিয়ালিজ্‌ম্‌ আর কি আছে? গল্পটির শেষে উপসংহার ক'রে লেখক বলেছেন, যে নায়কের মৃত্যুর পর নায়িকা তাঁর সখীর মত বাল্যপণ ত্যাগ ক'রে অত্যন্ত সাংসারিকভাবে একজন রোজকারী ব্যক্তিকে বিবাহ করলেন। এতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়েছে, গল্পটি রিয়ালিষ্টিক্ ত হয়ই নি বরং খুব বিসদৃশ হ'য়েছে। বেশীদিন আগের কথা নয়, আমাদের সাহিত্য-রসিক বন্ধু-মহলে শরৎবাবুকে নিয়ে ঠিক এই তর্কই উঠত, একপক্ষ বলতেন শরৎবাবু বাঙলা সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর প্রবর্ত্তক, প্রতিপক্ষ বলতেন কখনই না। এখন সে তর্ক আর ওঠে না, এখন সকলেই স্বীকার করেন, শরৎবাবু রবীন্দ্রযুগেরই অন্তর্গত। বুদ্ধদেবও এই যুগেরই অন্তর্গত, নূতন যুগকার বাঙলা সাহিত্যে এখনও আবির্ভূত হন নি।

পূর্ব্বোক্ত গল্পটি সম্বন্ধে আমার এই আপত্তি যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'লেও এতে একটা শরচ্চন্দ্র-সুলভ সস্তামার্কা রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ আছে যার লক্ষণ হচ্ছে নায়ক বিদ্যায় সাগরপার হ'য়েও বুদ্ধিতে হবে হনুমান, এবং নায়িকা অতি কোমলপ্রাণা হ'য়েও বুদ্ধিতে হবে হিমাদ্রির মত কঠিন, অভ্রভেদী। আর নায়ক-নায়িকার মিলন হবে অনুকম্পা,

কৃতজ্ঞতা বা মাতৃত্বেব আশ্রয় নিয়ে—তাতে অসঙ্গতি বা অপ্রাসঙ্গিকতা থাকলেও। তাই শবৎবাবুব লেখায় নায়িকাব কাছে বাঁধা বাখাব জন্য নাযকেব হাতে হঠাৎ এসে জোটে এক উৎকৃষ্ট দামী মাইক্রস্কোপ। বুদ্ধদেবের লেখায় এসে জুটেছে অতি অপ্রত্যাশিত একগাছা ছিপ—ভদ্রতাবিরুদ্ধ বিনানুমতিতে নায়িকাবই পিতাব পুকুবে মাছ ধববাব জন্য; সে মাছ আবাব নিজেব খাবাব জন্য নয়! যিনি সাহিত্যে যুগ পবিবর্ত্তন সংঘটনেব যশঃপ্রার্থী তাঁব পক্ষে এ ছেলেমানুষি অশোভন।

এর পরেব গল্পগুলিতেই গ্রন্থকাবেব লেখাব বৈশিষ্ট্য বিশেষ ক'বে ফুটেছে। তাঁব হাতে গল্পেব বাঙলা এক অভিনব রূপলাভ কবেছে। ভাষায় ও গল্প লেখবার বীতিতে তাঁব দখল অসামান্য। তিনি জানেন, কি নিয়ে গল্প তৈবী কবতে হয়, কোথায় তাব সুরু, কোথায় বা শেষ, কোথায় কতখানি প্রত্যাহাব কবতে হয় কোন ওজনে, কোন ছন্দে, কোন তালে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হয়। তবু এ-সকল গল্পেব বসোপলব্ধিতে একটা বাধা লাগে, বোধ হয়, ববীন্দ্রনাথকে বা বোমান্টিসিজ্ম্-এব পথকে পবিহাব কববাব সযত্ন চেষ্টায়, অধিকাংশ স্থলেই মূল প্লট হ'যে পড়েছে বেজায় সৌখিনি বকমেব। একটি গল্পেব নায়িকা তাঁব বাল্য প্রণয়ীকে অনেকদিন পবে হঠাৎ দেখতে পেয়ে একেবাবে ৪৪০ ভোল্টেব বৈদ্যুতিক শক খেয়ে ব'লে উঠলেন—যাও যাও সামনে থেকে, স'বে গিয়ে ধুয়ে-মুছে চিবদিনেব জন্য একেবাবে বিলুপ্ত হ'যে যাও। অতঃপব তিনি বাড়ীতে স্বামীপুত্রকে ভুলিয়ে বাখবাব বেশ সুব্যবস্থা ক'বে সেই প্রণয়ীকে ডেকে তাঁব সাধ মেটাতে দ্বিপ্রহবে স্বৈববিহাবে বা'ব হ'য়ে গেলেন। আব একটি গল্পে একজন সুশিক্ষিত কাব্যসাহিত্যবসিক নায়ক কিছুদিন দাবিদ্র্য ও অগ্রজেব স্বেচ্ছাচাবেব সঙ্গে যুদ্ধ ক'বে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে বণে ভঙ্গ দিয়ে উচ্ছন্নেব পথে ছুটে বেবিয়ে গেলেন। স্বীকাব কবি, লেখাব গুণে এ সমস্ত গল্পই হ'য়েছে বম্য, উপভোগ্য। কিন্তু শুধু মানুষেব দুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলিব উপব কটাক্ষ ক'বেই সাহিত্য সৃষ্টি হবে না, চাই বহুদর্শিতা, চাই বিচিত্র পবিবেষ্টনে মানুষেব বিচিত্র ভাবোন্মেষেব চিত্রাঙ্কণ। আব একটি জিনিষ এই গল্পগুলিতে বড়ই কর্কশ হ'যে উঠেছে, সে হচ্ছে লেখকেব বিষম নাবীবিদ্বেষ। বুদ্ধদেবেব নাবী কামেব কাছে মূঢ, শক্তিহীন। বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে পতঙ্গেব মত এবা পোড়ে না, কামেব সামান্য স্পর্শেই এবা হয ধবাশাযী। স্পর্শও নয়, এদেব দ্বিধা-সঙ্কোচ জয কবতে প্রয়োজন মাত্র সামান্য একটু ইঙ্গিত, সামান্য একটু "অভিনয"। নাবীব এ-দশা দেখে লেখক যে মর্ম্মাহত হ'য়েছেন তা' নয ববং তাঁব শ্লেষ ভীষণ নির্ম্মম হ'যে উঠেছে। আমাব মনে হয়, এ-নাবীবিদ্বেষ লেখকেব ক্ষণিকেব ঠমকমাত্র, যাকে তিনি তাঁব পবিণত সাহিত্য-জীবনে অতিক্রম ক'বে যাবেন। নতুবা তাঁব লেখা-সম্বন্ধে আশঙ্কাব কাবণ থাকবে।

শেষেব গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এটি এক নূতন বীতিতে লেখা। বিষয "কাব্যেব উপেক্ষিতা" ঊর্ম্মিলাব কাহিনী, স্থান কাল কিন্তু আধুনিক। এ-বীতিতে লেখবাব জন্য লেখক নিজেই বইটিব মুখবন্ধে বহু ভূমিকা কবেছেন, সুতবাং পুনবালোচনা নিষ্প্রয়োজন। গল্পেব ঊর্ম্মিলা আধুনিক জগতে বিচবণ ক'বে যে নিববচ্ছিন্ন ও নৈবাশ্যময উপেক্ষাব ভাব প্রতিনিযত বহন কবেছেন তা' লেখায অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক হ'যে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পড়লাম বুদ্ধদেবেব নব প্রকাশিত কবিতাব বই "বন্দীব বন্দনা"। এতে তাঁব দশটি কবিতা একসঙ্গে গাঁথা, কিন্তু প্রত্যেকটিই কাব্য-গৌববে দীপ্যমান।

তাঁর গল্পের বই-প্রসঙ্গে আমি তাঁর যে-ক্ষমতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি সেই ক্ষমতার প্রকৃষ্টতর পরিচয় পাই এই কবিতা-দশকে। লেখক বয়সে নবীন ও কবিতা লেখায় নব প্রয়াসী কিন্তু কে বলবে তাঁর রচনা নবীনের বা প্রথম প্রয়াসের? তাঁর গল্পে কোন কোন ত্রুটী বা দুর্ব্বলতা থাকলেও তাঁর কবিতাগুলি সুপরিণতি লাভ করেছে। বাংলায় প্রকাশিত কবিতার কোনটিকেই এদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, এরা স্বকীয়তায় এমন এক শ্রেণী গড়ে তুলেছে। এরা কল্পনায় দৃঢ়, ভাষায় পরিস্ফুট প্রকাশ ভঙ্গীতে স্বাবলম্বিত। এদের ছন্দটি "অমিল ছন্দ", এক রকম নূতন বল্লেই চলে, কেননা এ-ছন্দ পূর্ব্বে বেশী ব্যবহৃত হয় নি। শুধু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দু'একটি কবিতায় এ-ছন্দের ব্যবহার করেছেন আর গিরীশ ঘোষ তাঁর নাটকের জন্য এ-ছন্দটিকে বরণ করেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছন্দেও নাটকীয় উক্তির একটা ঝোঁক আছে। যা' হ'ক এঁর লেখনীতে ছন্দটি রূপলাভ করেছে।

কবিতাগুলিতে দুটি প্রধান সুর বেজেছে। একটি হচ্ছে সন্ধানের, কবির কাব্যলোকের, অমৃতলোকের সন্ধানের। সন্ধানে বাহির হয়েই কবি প্রথমেই চেয়েছেন মুক্তি। সমস্ত বন্ধন হ'তে মুক্তি, রূপের বন্ধন, যৌবনের বন্ধন, বাসনার বন্ধন, ক্ষোভের বন্ধন ও প্রেমের বন্ধন। তাই তিনি "বন্দীর বন্দনা" গেয়েছেন। এক দিব্যালোকে, যৌবনের সিন্ধুতটে বসে, তিনি নিজের আত্মপরিচয় পেয়েছেন, দেখেছেন যে, এ-ধরণীর তিনি সন্তান ন'ন, তিনি শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। তখন তাঁর কি আনন্দ, কি অভয়, কি মুক্তি! কে এনে দিল সেই বাণী? গগনের স্নিগ্ধ সোনার কমল ওই ঊষার আলোখানি, রাত্রির রাজ্ঞী ওই পূর্ণচন্দ্র, প্রেমগুঞ্জনতুল্য বনের ওই মর্ম্মরধ্বনি, প্রণয়িণীর নেত্র-মুকুরে প্রতিবিম্বিত কবির আপনারই ওই নিষ্কলঙ্ক ভাস্বরকান্তি রূপ। তখন সামান্য ক্ষোভ ঘুচে গিয়ে কবির মনে হ'য়েছে সার্থক "সুন্দর তনু" এই দিনগুলি, ক্লান্ত উদার উদাস এই অপরাহ্ণ, স্নিগ্ধ শান্ত এই রাত্রি, যাদের সকলকে কবি একটি একটি ক'রে কালের বিশাল স্রোতে প্রতিনিয়ত ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মুক্তি চাই এ-সকলের প্রিয় বন্ধন থেকে, কারণ এদের মোহ তাঁর কল্পলোকে পৌঁছবার পথ যে রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষুধিত যৌবন, তার দুর্দ্দম বাসনা, তার কুৎসিৎ কামনা আর অতৃপ্ত প্রেম নিয়ে সর্ব্বদা সম্মুখাসীন। কবির সুন্দর এতে অসম্মানিত। মুক্তি চাই এ-সব থেকে। কোথায় ধরণীর সে অপরিমিত সৌন্দর্য্য, কোথায় সে সুচরিতা সুন্দরী নারী—সে বিম্বাধরা কৃশকটি করভোরু পীনজঘনা নারী—যারা কবির তপস্যা ভঙ্গ করতে সমর্থ? কোথায় সে সম্ভোগ যা' কবিকে বিচলিত করবার শক্তি রাখে? না, না, মধুরাত্রে রতিক্রীড়া-পারগ সুন্দরী ললনা নয়, কবির প্রিয়তমা "অশরীরিণী প্রাণ উদ্বোধিনী অগ্নিকল্পা কবিতা-কল্পনা"। ধরণী কবির কাছে মৃতা, কবি তার জন্য চিতা সাজিয়েছেন। যে-ধরণীর প্রেমে কত শত কবি আকুল ও ধন্য হ'য়েছেন, আমাদের কবি তার প্রেম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তিনি বিধাতার কাছে বর চেয়েছেন "সবিতার দীপ্তিসম" তাঁর "কবিতার স্বপ্ন" যেন অক্ষয় হয়। প্রচণ্ড তীব্র সুরে বেজেছে ধরণীর প্রতি এই উপেক্ষাগীতি, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, ধরণীকে উপেক্ষা ক'রে কবি কোন কল্পলোকে উত্তীর্ণ হ'তে চান? আমার মনে হয়, এ-প্রত্যাখ্যান কবির ধরণী-প্রেমেরই নামান্তর।

কবিতার দ্বিতীয় সুর বেজেছে নারীর প্রতি তীক্ষ্ণ নির্ম্মমতায়। গল্পগুলিতে আগেই এই নারীবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কবির কাছে নারী শুধু চর্ম্মের

আববণে ঢাকা বক্তমাংসময় মদনানলেব ইন্ধন মাত্র। তাঁব আপন চোখে আছে স্বর্গেব দীপ্তি, হৃদয়ে আছে অনন্তেব ক্ষুধা কিন্তু তাঁব নাবীব হৃদযে নেই "অমৃত পবশ", নয়নে নেই "দিব্য বিভা।" তাঁব নাবী তাঁকে "উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধালোকে আবও উর্দ্ধালোকে" নিযে যায় না। তাই কঙ্কাবতীকে তিনি চেয়েছেন শুধু তাব ননীব মত তনুব স্পর্শেব বিলাসে। তাঁব "অমিতাব" কাছে চেযেছেন ভালবাসা নয়, ভালবাসাব ভানমাত্র। "অপর্ণা"কে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে তিনি বলেছেন এইবাব থেকে তিনি হ'বেন তাব স্বামীশয্যায চিবকণ্টক।.. আশা কবি, কবিব লেখায়, এই নাবী-বিদ্বেষেব পালা একদিন কেটে যাবে, ধবণী ও তাঁব কবিতাব বিষযগুলিব প্রতি কঠিন তীব্র স্বব নম্র হ'বে, বহু ও বিচিত্রতব বিষযে তাঁব কবিতাব দ্যুতি ন্যস্ত হ'বে, সে দিন কবিমণ্ডলীব মধ্যে আপনা হ'তেই তাঁব জন্য একখানি অতিসম্মানেব আসন বিবচিত হ'বে।

শ্রীগিবিজাপতি ভট্টাচার্য্য

অদ্বৈতসিদ্ধি—প্রথম ভাগ। অনুবাদক—পণ্ডিতপ্রবব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ। সম্পাদক—শ্রীবাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ—৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

অদ্বৈতবেদান্ত-সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে তিন বিভিন্ন যুগ ও দেশেব তিন জন লোকোত্তব প্রতিভাবান্ মহাপুরুষেব নাম মনে পড়ে। প্রাচীন যুগে—দাক্ষিণাত্যে বেদান্তজ্ঞানেব পূর্ণাবতাব ভগবৎ পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশঙ্কব। মধ্যযুগে—মধ্যভাবতে শস্ত্র ও শাস্ত্রে তুল্যরূপ অধিকাবী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীবিদ্যাবণ্য স্বামী (মাধবাচার্য্য)। আব নব্যযুগে—বাঙলায নব্য বেদান্তেব প্রধান পবিপোষক বাগ্‌দেবীব ববপুত্র শ্রীমধুসূদন সবস্বতী। যাঁহাব দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া সমগ্র ভাবতেব পণ্ডিতমণ্ডলী প্রশস্তিপত্র প্রদান কবিয়াছিলেন—

> "বেত্তি পারং সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী।
> মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী" ॥

বাঙালী মধুসূদনের জন্ম ফবিদপুব জেলাব অন্তর্গত কোটালিপাড়াব উনসিযা গ্রামে। গ্রন্থপ্রকাশক বাজেন্দ্রবাবু বহু পবিশ্রম স্বীকাব কবিযা নানাবিধ প্রমাণ দেখাইয়া সিদ্ধান্ত কবিযাছেন যে, মধুসূদনেব জন্মকাল খৃঃ ১৫২৫ হইতে ১৫৩০ অব্দেব মধ্যে। এ-সম্বন্ধে আমাদেব বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই। মধুসূদন বাল্যেই সংসাব বিবাগী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেব পবম অনুবাগী হইয়া তিনি গৃহত্যাগ কবেন; কিন্তু মহাপ্রভুব দর্শন মিলিল না বলিয়া নবদ্বীপে ন্যাযশাস্ত্র অধ্যযনে বত হইলেন। গৌড়ীয মতানুযাযী একখানি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবাব ইচ্ছায, তাঁহাব অন্যান্য দর্শন আলোচনা কবিবাব কৌতূহল জন্মে। তদনুসাবে তিনি বাবাণসীধামে অদ্বৈতবেদান্ত ও মীমাংসা প্রভৃতি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষাব সময়ে তাঁহাব গৌড়ীয় মতেব প্রতি অনুবাগ অন্তর্হিত হয়। সেজন্য তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক অদ্বৈত সম্প্রদাযভুক্ত

হন্। সেই সময়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য ব্যাসতীর্থ অদ্বৈতবাদখণ্ডনমানসে 'ন্যায়ামৃত'-নামক কূটতর্কময় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মধুসূদনও স্বমতরক্ষার্থ তাঁহার সহিত মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন্। তাহার ফলেই 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র আবির্ভাব। ইহা ন্যায়ামৃতের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ। শ্রদ্ধাস্পদ রাজেন্দ্রবাবু গ্রন্থকার-পরিচয়ে ইহাই সবিস্তারে দেখাইয়াছেন। তবে প্রায় একশত-কুড়ি-পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনী না লিখিলেও চলিত বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে গ্রন্থপরিচয়ে রাজেন্দ্রবাবু অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের যে ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্যই নূতন। গবেষণার বিষয়ও ইহাতে যথেষ্ট আছে। অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তাধারায় অদ্বৈতসিদ্ধির প্রকৃত স্থান কোথায়, তাহা রাজেন্দ্রবাবু আমাদিগকে অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। এজন্য বাঙালীমাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। রাজেন্দ্রবাবু ভূমিকামধ্যে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী "ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়" দিয়াছেন। ইহা সুচিন্তিত, সুলিখিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সম্পূর্ণ অবান্তর বিষয়রূপেই গ্রন্থকলেবরে স্থান পাইয়াছে। রাজেন্দ্রবাবু এই অংশটি পৃথক্ গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করিলে গ্রন্থের ভার কিছু লাঘব হইতে পারিত। অথচ গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না। আর সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র বাঙালীকে মূল্যও কিছু কম দিতে হইত। রাজেন্দ্রবাবুর নিকট আরও একটি অনুযোগ আমাদের আছে। যে মাধ্বমতের সহিত অদ্বৈতসিদ্ধির এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই মাধ্বমতের আরও একটু বিস্তৃত পরিচয়—বিশেষতঃ মাধ্ব-চিন্তাধারার একটি ইতিহাস ভূমিকা-মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে রাজেন্দ্রবাবু আমাদের অনুরোধগুলির বিষয় একটু বিবেচনা করিবেন।

অদ্বৈতসিদ্ধির উপর তিনটি প্রাচীন টীকা আছে—বলভদ্রের সিদ্ধিব্যাখ্যা ও ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকা বা গৌড়ব্রহ্মানন্দী এবং বৃহচ্চন্দ্রিকা। ইহার মধ্যে লঘুচন্দ্রিকাখানিই সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। এই লঘুচন্দ্রিকার উপর আবার একটি টীকা আছে। উহার নাম "বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী"। এই সকল টীকাকারগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরমত খণ্ডন। সেইজন্য ইঁহাদের টীকা হইতে মূল গ্রন্থের আশয় ভালরূপ বুঝা যাইত না। সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তমীমাংসাদি শাস্ত্রের অধ্যাপক ঋষিকল্প পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় "বাল্যবোধিনী" নামে অদ্বৈতসিদ্ধির একটি নূতন টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মূলের আশয় অতি সহজেই বুঝা যায়। অথচ পক্ষ-প্রতিপক্ষের যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও ইহাতে বিশ্লেষিত করিয়া দেখান হইয়াছে। এজন্য এ টীকাটিকে একরূপ অমূল্য বলা চলে। বোধ হয়, বাঙালী মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির উপর ইহাই প্রথম বাঙালীরচিত টীকা।* বাঙালীর রচিত অদ্বৈতসিদ্ধি যেমন একদিন বেদান্তবিদ্যায় বাঙালীকে ভারতের পণ্ডিত সমাজে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল, আজ বাঙালী রচিত টীকাও তেমনি বাঙালীর সে পূর্ব্ব গৌরব অটুট রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থের মূল ও টীকাটি নাগর অক্ষরে প্রকাশ করিলে, গ্রন্থখানি সমগ্র ভারতে প্রচার লাভ করিত। তাহা যখন ঘটিয়া উঠে নাই, তখন

---

* কেহ কেহ বলভদ্রকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

গ্রন্থের মূল ও টীকাটি মাত্র নাগরাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিদ্যার্থিবৃন্দ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মূল গ্রন্থের অনুবাদ ও তাৎপর্য্য অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে। দুরূহ সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় না। অনুবাদ-সাহিত্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এ পর্য্যন্ত বাঙ্লার এরূপ অনুবাদগ্রন্থ সর্ব্বশুদ্ধ তিন-চারিখানির অধিক প্রকাশিত হইয়াছে কি-না সন্দেহ।

রাজেন্দ্রবাবুর এ অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

শ্রীঅশোকনাথ বেদান্ততীর্থ

Impressions of Soviet Russia and the Revolutionary World—DEWEY.
Dreiser looks at Russia—DREISER.
One looks at Russia—BARBUSSE
রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ।

রাশিয়া সম্বন্ধে লম্বা লম্বা সংখ্যার তালিকা প'ড়ে মন যখন বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে, তখন খানকয়েক ভদ্রলোকের পাঠোপযোগী বইএর সন্ধান পাওয়া গেল। প্রত্যেক বইখানি প্রতিভাশালী ব্যক্তির লেখা। বিখ্যাত দার্শনিক Dewey দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি শিখতে ও শেখাতে। চীন, মেক্‌সিকো, নব্যতুর্ক ও রাশিয়াতে শিক্ষা নিয়ে প্রধানত যে-সব পরীক্ষা চলছে তারই আলোচনা ক'রে তিনি নিজের দেশের সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলি সস্তা-দামে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। রাশিয়া-সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বেশ বড। Dewey-র লেখা অনেকেই পড়েছেন, দর্শন-সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্ব্বজনবিদিত। তার মূল্য যাই হোক না কেন, ভাষার প্রাঞ্জলতা, forthrightness এবং মতামতে একটা সাধারণ-বুদ্ধির পরিচয় থাকার দরুণ তার সব লেখাই ভারী উপভোগ্য হ'যে উঠে। কোন উপজীবিকার সাহায্যে দেহ ও মনের গঠনকেই তিনি শিক্ষা বলেন; তাঁর মত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে জীবজগতের নিয়মানুসারে ব্যক্তিকে খাপ খাওয়ানই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজকে যখন উন্নত করতে হবে, তখন জীবনের সাফল্যকে বাদ দিলে চলবেই না। আজকালকার সমাজ গণতন্ত্রমূলক হয়েছে, অতএব ভাববিলাসী সাহিত্যিক কিম্বা দার্শনিকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা দুষ্কর; বিজ্ঞান-শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, এবং এই বিজ্ঞান-শিক্ষার দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে মিলিত করা যাবে। Naturalistic মনোভাবই শিক্ষিতের একমাত্র উপযুক্ত মনোভাব। প্রত্যেক ভাবকে ব্যবহৃত করলে যতদূর টেঁকে ততদূর পর্য্যন্ত তার মূল্য দেওয়াই প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র মানসিক কর্ত্তব্য। ব্যবহারিক জগতের বাধাবিপত্তিকে স্বীকার ক'রে জয় করাই চিন্তার ধর্ম্ম। এই ধরণের গোটাকয়েক মূলকথা সোজা ভাষায় বলার জন্যই Dewey-র এত প্রতিপত্তি। পলিটিক্সে তাঁর মতগুলি আমেরিকাবাসীরই উপযুক্ত—তিনি voluntary

association-এব ভক্ত, সবজান্তা, সর্ব্বময কর্ত্তা একটা State-কে বিশ্বাস কবেন না, কেননা তাব সাহায্যে কোন মানুষ যথার্থভাবে শিক্ষিত হ'তে পাবে না, তাব নিজেব ধর্ম্ম-অনুসাবে ফুটে উঠতে পাবে না। এক ওষুধে সব বোগ সাবতে পাবে, তিনি বিশ্বাস কবেন না—প্রত্যেক সমস্যাব ভিন্ন নিবাকবণ হওযা উচিত, কেননা প্রত্যেকটিব social milieu আলাদা আলাদা। এ হেন মন ও মত নিযে Dewey সাহেব বাশিযা গিয়েছিলেন। তাঁব অভিজ্ঞতাব ঘাতপ্রতিঘাতে এবং আদান-প্রদানে যে মতগুলি বইএতে ফুটেছে সেগুলিব সঙ্গে অন্য একটি ভিন্ন প্রকৃতিব মানুষেব—আমাদেব কবিব মতেবও মিল বযেছে। দুজনেই শিক্ষক, দুজনেবই অনুবাগ এক, দুজনেবই সিদ্ধান্ত এক।

অন্য দুজন নভেলিষ্ট বাশিযা বেডাতে যান। একজন আমেবিকান Theodore Dreiser যিনি আজ নয় কাল নোবেল প্রাইজ পাবেন, অন্যজন Henri Barbusse, ফ্রান্সেব নামজাদা লেখক, ও Communist, একটু ভদ্র হ'লে ইতিপূর্ব্বেই তিনি নোবেল প্রাইজ পেতেন। বই দুখানার নামেই লেখকদেব চবিত্রগত পার্থক্য ধবা পড়ে—Dreiser looks at Russia এবং One looks at Russia। একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা কবেছেন, অন্য ব্যক্তি সাধাবণেবই একজন হ'যেই দেখেছেন। দুজনেই সাহিত্যিক ব'লে বাশিযাব সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেব ছবিগুলি চমৎকাব হ'যেছে। গ্রামেব লোকে কি কবছে, মজুবেব দল কাবখানাব ভেতবে ও বাইবে কি ভাবছে, কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ কবছে, তাদেব দৈনন্দিন জীবনেব ছোট-খাট ঘটনাব মধ্য দিয়ে একটা বড আদর্শ কি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, এই সবেব খুঁটি-নাটি বর্ণনা বই দু'খানিকে সাহিত্যেব কোটায তুলে ধ'বেছে। Barbusse আগে থেকেই Communist, অতএব হযত অনেকে তাঁব মন্তব্যগুলি গ্রহণ কববেন না। কিন্তু তাঁব লেখা এত convincing যে, অবিশ্বাস কবতে ইচ্ছা কবে না। কোন স্থানেই তাঁব পূর্ব্বমতকে প্রতিষ্ঠিত কববাব প্রযাস নেই। বাশিযা তাঁব কাছে earthly paradise হ'লেও, সে স্বর্গেব বর্ণনা একজন ফবাসী সাহিত্যিকেব। ড্রাইসাবেব চোখে বঙ্গীন চস্মা ছিল না, সাদা চোখেই তিনি দেখেছেন—এবং যা প্রত্যক্ষ দেখেছেন তাই লিখেছেন। তাঁব নভেলেব যা গুণ ও দোষ সবই এই বইখানিতে বর্ত্তেছে—তিনি সবই একটু epically দেখেন—তাঁব পটটি প্রকাণ্ড, দৃষ্টি সূক্ষ্ম নয, প্রসাবিত, ভাষা অমার্জ্জিত বল্লেও হয়। কি ক'বে মানুষেব ভাগ্যচক্র ধীবেঅথচ নিষ্ঠুবভাবে ওঠে পডে তিনি ভাল ক'বেই জানেন। একজনেব বুদ্ধি ক্ষুবধাব, অন্যেব প্রাণ মস্ত বড, একজনেব কলম ভোঁতা, অন্যেব কলমে ইস্পাতেব নিব্—একজন Latin, অন্যজন American,—একজনেব চিত্রে অবকাশ বেশী, অন্যেব পটভূমি খুঁটিনাটি দিয়ে ভর্ত্তি, একজনেব বর্ণে আছে উজ্জ্বলতা, অন্যেব বর্ণে আছে জ্বালা, দাহকতা, তবু তাঁদেব সিদ্ধান্ত এক।

শেষে গেলেন কবি। তিনি আবাব সত্তব বৎসব পূর্ব্বে আমাদেব দেশে জন্মেছিলেন। পবাধীন দেশে, দুঃখী দেশে জন্মালে যে আশা নিয়ে বিদেশ-ভ্রমণে, বিশেষ ক'বে, বিশ্বেব তীর্থভূমি বাশিযায লোকে যায, তাঁবও সেই আশা ছিল। তাব ওপব কবিব চোখ হিন্দু দার্শনিকেব, তাঁব অন্তবে প্রবেশ কববাব ক্ষমতা বাইবেব আববণ ভেদ কববাব ক্ষমতাব চেয়ে বেশী। স্বভাবত তিনি অবসবেব মহিমা উপলব্ধি কবেছেন, কীর্ত্তনও কবেছেন। তিনি আবাব বড জমিদাব, পবশ্রমজীবিব একজন। কিন্তু

অন্য জমিদারের মতন তিনি জমিকে শোষণ না ক'রে জমিতেই জমির টাকা বপন করেছেন। আমাদের চাষীর কল্যাণ কিসে হবে, কিসে তাদের অভাব মোচন হবে, কিসে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হবে, তাদের ঋণের মাত্রা কিসে কমবে, দেহের ওজন, মনের ফুর্ত্তি কিসে বাড়বে তিনি যত ভেবেছেন আমাদের দেশে আর কেউ অত ভেবেছেন কি না জানি না। শুধু ভাবা নয়, কাজও করা, প্রজাদের দিয়েই কাজ করান, সমবায়-পদ্ধতির দ্বারা, স্কুল-পাঠশালা, হাঁসপাতাল, ব্যাঙ্ক-স্থাপনের দ্বারা। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ, ক্ষমতা ছিল অল্প, সাহায্য করবার লোক ছিল কম, বাধা-বিপত্তিও ছিল বিস্তর। কবি আবার শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মার্কা শিক্ষার দোষ কোথায় বুঝেই তিনি শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন— সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে, বিদ্যালয়কে ভৌগলিক পরিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থানীয় ক'রে, ব্যবহারিকজীবনের কার্য্যকুশলতাকে আশ্রয় ক'রে, প্রত্যেক মানুষের সৌন্দর্য্যলিপ্সা স্বাভাবিক উপায়ে জাগিয়ে দিয়ে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আশার অনুরূপ ফললাভ হয় নি। তিনি জীবনে কেবল অন্যের মুখে 'ডিফিকাল্-টিসে'র দোহাই শুনেই এলেন। শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে পারছেনা, রাজত্ব চালাতে হবে, অতএব "ল ও অর্ডারে"র জন্য, পুলিশ ও সৈন্য-বিভাগের জন্য সব টাকা চাই, বড় সাহেবদের জন্য মোটা টাকা চাই, দেশের লোকে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, তবু শোষণ-কার্য্যের বিরাম নেই, দেশের লোকের আত্মশ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, পেটে অন্ন নেই, মগজে শিক্ষা নেই, লোকের হাত পা বাঁধা, তার পর লাঠি চার্জ্জ, আবার তার চেয়েও কঠিন অসহ্য অপমান, সাইমন সাহেব ও পাদ্রীদের হাত থেকে—এই সব দেখে শুনে কবির প্রাণে, দেশের সত্যকারের দায়িত্বজ্ঞানী জমিদারের প্রাণে, দেশের প্রকৃত শিক্ষকের প্রাণে বড় বেজেছে। তারই সুর এই চিঠিগুলিতে বাজছে। আর একবার এই রকমই বেজেছিল—জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর পেয়ে। অন্য লোক হ'লে চিঠিগুলো নেহাৎ পেট্রিয়টিক্ হ'ত, কিন্তু তিনি ব'লে তাঁর চিঠির মধ্যে অন্য জিনিষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধান আছে, স্থিরসন্ধান আছে, এই চিঠির মধ্যে রাশিয়ার পাঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের, একত্রিক কৃষিপদ্ধতির, তার ললিতকলার, তার শিক্ষা-পদ্ধতির, তার কল্যাণ-সমিতির, শিশু-সমিতির, স্বাস্থ্য-সমিতির, তার যন্ত্রশালার, তার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, কম্যুনিষ্টদলের একাধিপত্যের দোষ-গুণের, তার ধর্ম্মের, তার কর্ম্মকুশলতার, তার প্রচণ্ড সমবেত চেষ্টার, পিছিয়ে পড়া জাতের জন্য সমবেদনার, এক কথায় সন্ধান আছে, আমাদেরই মত ধর্ম্মান্ধ অশিক্ষিত বন্ধন-জর্জ্জর জাতিকে মুক্তি দেবার ইতিহাসের। রাশিয়ায় যে ঘটনাটি ঘটেছে তার মর্ম্ম কথাটি এত স্পষ্ট ক'রে আর বোধহয় কেউ বলেনি। হয়ত Dewey, Dreiser, Barbusse-এর মর্ম্মগ্রহণ করবার প্রয়োজন ও তাগিদ কবির চেয়ে কম ছিল, তাঁরা স্ববশ-জাতির লোক, আমাদের মতন অপমানজর্জ্জরিত দীন-হীন জাতের লোক নন্। হয়ত তাঁদের ফিলসফি নেহাতই এই জগতের। তাঁদের সমাজ জীবিত, তাঁরা সাহস ক'রে আশা-ভরসা ক'রতে পারেন, দাবী ক'রতে পারেন, ভারতবাসী কিছুই পারে না, সেই জন্যে হয়ত কবির প্রাণে বেশী বেজেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য সাহস এই ব্যক্তির! সত্তর বৎসর বয়সে কী শেখবার ক্ষমতা! কী বিনয়! কোথায় গেল তাঁর Philosophy of Leisure? কোথায় গেল তাঁর সেই Green-এর idealistic notions

of property ? কোথায় গেল তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ? কোথায় গেল তাঁর স্বর্গীয় তুলনা—সমাজটা প্রদীপের মতন, ওপরে আলো, নীচে অন্ধকার ? কোথায় গেল তাঁর aristocratic isolation ? তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে কি সব দিয়ে আসতে হয় ? সত্য কথা তা নয় কিন্তু। তীর্থস্থানে কাউকে কিছু দিতে হয় না—শুধু বাইরের আবরণ ছাড়তে হয়, তবেই মানুষের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। দেশের প্রতি এত টান, শিক্ষার জন্য এত ব্যাকুলতা, যারা জমি চাষ ক'রে সেই জনসাধারণের প্রতি এত সমবেদনা, দেশের কল্যাণের জন্য এত ব্যগ্রতা তাঁর অন্য কোন লেখায় আছে কি-না স্মরণ হচ্ছে না। রাশিয়ার সোভিয়েট-তন্ত্র জানতে গিয়ে কবির সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'ল, এইটাই প্রধান লাভ।

অন্য লাভ যথেষ্টই হয়েছে। যে লেখকদের নাম করেছি তাঁদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কবির সিদ্ধান্তের যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রধান মিল হ'ল এই যে, মানুষের মন ব'লে কোন একটা অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু নেই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মন ত বদলে যায়ই। কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাতের হাতে মানুষের সুখ-দুঃখকে ছেড়ে দেওয়া মূর্খতা, সময়ের ও শক্তির অপব্যবহার। অতএব rational control-এর প্রয়োজন রয়েছে। এতদিন যে চালনা-পদ্ধতি চল্‌ছিল তার প্রধান দোষ এই যে, তার মূলে ছিল একটি কোন শ্রেণীর স্বার্থ, সমগ্র সমাজের কল্যাণ তার পিছনে কাজ ক'রত না। অথচ বিপদ এই যে, সাধারণের হাতে কল্যাণের ভার দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নিজেদের কল্যাণ কি তাই তারা জানে না ব'লে কার্য্যত তারা সেই শক্তিশালী শ্রেণীর হাতে গিয়েই পড়ত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কল্যাণ-সাধনের এক উপায় সাধারণের শিক্ষা। সে শিক্ষা কেরাণীতৈরী করবার যন্ত্র নয়। তার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ নিবিড়, সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, সে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন এবং মনকে জাগিয়ে দেয়, ভাবতে শেখায়, কাজ করতে বলে; তার দ্বারা মূঢ়তা লোপ পায়, ধর্ম্মান্ধতা ঘুচে যায়, মনে বল আসে, মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ব্যক্তির মন যুক্ত হয়। সে শিক্ষা concrete বটে, কিন্তু শুধুই practical নয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তৃত ক'রবে কে ? জার নয়, পুরোহিত-পাণ্ডার দল নয়, পরশ্রমজীবি মধ্যস্থ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নয়, ক'রবে এমন একটি রাষ্ট্র যেটি সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বসাধারণের প্রতিভূ। কারা সর্ব্বসাধারণ ? যারা হাত দিয়েই হোক, আর মাথা দিয়েই হোক জগন্নাথের ভাঁড়ারে কিছু এনে হাজির ক'রেছে। যারা কিছু না এনে ভোগের প্রত্যাশা করে, তাদের সাধারণের মধ্যে স্থান নেই। সমাজের উদ্দেশ্য ঠিক হ'ল, উপায় পাওয়া গেল, বাধা-বিপত্তি সুরান হ'ল, যন্ত্র এল, বাকি রইল শিক্ষা বিস্তারের পন্থা, এবং শেখবার জন্য উদ্যম। পন্থা অনেক রকমের হ'তে পারে এই বিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানের দৌলতে আছে, সিনেমা, ভ্রমণ, ল্যাবরেটরী, ম্যুজিয়ম, খবরের কাগজ, রেডিও। সবগুলিকে কাজে খাটান হ'ল। এখন, লোকের মধ্যে উদ্যম আনা যায় কিসে ? উদ্যম আসে না কিসে ? মানুষ ত স্বার্থপর হ'য়েই জন্মায় সকলে বলেন, তবু মানুষ শিক্ষিত হ'তে চায় না কেন ? এক কারণ মানুষ স্বার্থ-সম্বন্ধে সচেতন নয়। অতএব স্বার্থ-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রতে হবে। তার স্বার্থ ভোলাতে হবে স্বার্থের দ্বারা। ছোট জমি চাষ ক'রে লাভ হয় না দেখাতে হবে, একত্রিক সমবেত চাষই লাভের ব্যবসা দেখাতে হবে—তবেই তারা ছোট জমি ছাড়বে। কার্ল মার্কস্ বলেছিলেন যে মজুররাই, চাষীরাই, জিনিষের দাম তৈরী করে, অতএব জিনিষের ওপর অধিকার একমাত্র তাদেরই। তৈরী মত

পাওয়া গেল, তারই সাহায্যে হতাশ মনকে আশান্বিত করা হ'ল। ইতিহাসই, তাদের দিন আগত ঐ, ব'লে দিলে। প্রোপাগাণ্ডা চল্‌ল খুব জোরেই। হয়ত সব লোকে একটি মতের ছাঁচে ঢালাই হ'ল, তাতে হয়ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল না, কিন্তু সাধারণের উপকারে সে অপকারটুকু ঢাকা পড়ল। আশা করা যায়, যখন সমগ্র দেশটা আত্মস্থ হবে, তখন যে শিক্ষা স্বাধীন-চিন্তা শিখিয়েছে তারই দ্বারা মনের বৈচিত্র্য পুনরভিষিক্ত হবে। যতদিন না হয়, ততদিন প্রোপাগাণ্ডার, একটি দলের একাধিপত্যের ও অধিনায়কত্বের প্রয়োজন রয়েছে, এবং ততদিন সে প্রয়োজনের মূল্য স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মতবৈচিত্র্যের প্রয়োজনের মূল্য অপেক্ষা বেশী। অতএব নিঃসহায়তার, দৈন্যের, দুঃখের অবসান হয় শিক্ষায়। কিন্তু আবার স্বজাতির সমস্যা সমগ্র মানবজাতির সমস্যার অন্তর্গত। বিশ্ব-ইতিহাসের ভৌগলিক পর্দা উঠে গিয়েছে। "দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট ক'রে দেখতে পাচ্ছে, এইটেই মস্ত কথা"। তাই রাশিয়া জগতের তীর্থভূমি। তাই কবির "রাশিয়ার চিঠি" একটা মস্ত কীর্ত্তি।

আর একটি কথা মনে ওঠে। ভারতবর্ষে কম্যুনিজম সম্ভব কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষী দিতে পারেন, অন্যে পারে না। তবে রাশিয়া-সম্বন্ধে কোন ভাল বই পড়লে মনে হয়, 'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ'?

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পথে-প্রবাসে—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত। কলিকাতা ১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে এম, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত। দুগ্ধশুভ্র এণ্টিক কাগজে ডবল-ক্রাউন ষোলপেজী ১৫ ফর্ম্মার বই, পরিচ্ছন্ন ছাপা, বাঁধাই ভালো, কিন্তু অন্যান্য প্রায় সমস্ত বাংলা বইয়েরই মতো বাঁধা ভালো নয়। কয়েকটি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি আছে, সেগুলি ছাপা সুন্দর হয় নাই, এবং একাধিক প্রকারের কালি ব্যবহার করায় সেগুলির শিল্পোৎকর্ষ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করেরই একটি কবিতায় পড়িয়াছিলাম মনে আছে,
"দিনে থাকি আনমনা, রাত্রে অচেতন"

কিন্তু আলোচ্য বইটি পড়িতে পড়িতে বারম্বার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, এই তরুণ লেখকের মনটি আশ্চর্য্যরকমের সজাগ। ইঁহার বুদ্ধির উপর জড়তা বা সংস্কারের আবরণ অল্প। নিজের পরিপূর্ণ চেতনার আলোয় সবকিছুকে আলোকিত করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, এবং যতখানিকে দেখিয়াছেন, তরুণ-মনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশভঙ্গীতেও কোনো জড়তা নাই।—এইটুকু বলিলে বইটির দোষগুণ দুইই প্রায় একসঙ্গে বলা হইয়া যায়।

কিন্তু আগেই বলিয়া রাখি, যে-জিনিষ প্রাণবান্ তাহার দোষ-গুণ সত্যসত্যই আলাদা করিয়া দেখিতে যাওয়া ভুল। প্রাণধর্ম্মের আনুষঙ্গিক যে-বৈচিত্র্য, তাহার কোনও অংশটিকে বাদ দিয়া কোনও অংশের অস্তিত্ব কল্পনা করা সুকঠিন। অন্নদাশঙ্করের লেখার যে-দিক্‌টাকে দোষ মনে হইতেছে, সেটাকে ছাড়িয়া শুদ্ধমাত্র তাহার

গুণের দিক্‌টাকে পাইতে চাহিলেই পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। এই বইটির আদ্যোপান্ত সমস্তটিতে সমস্ত দোষগুণাতিরিক্ত সেই প্রাণ-লক্ষণ বিদ্যমান আছে। ইহাই বইটির প্রথম এবং প্রধান পরিচয়।

প্রথমেই তাই দেখিতেছি, বইটি Plan করিয়া, কাঠামো বাঁধিয়া, প্রতিপদে, একজন প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া, সাজাইয়া গোছাইয়া লেখা নহে। উন্মুক্ত দুইটি চোখের এবং উন্মুখ একটি মানব দৃষ্টিতে দুই বৎসরের প্রবাস-পরিক্রমায় ইউরোপীয় পৃথিবীকে তাঁহার যখন যেমন লাগিয়াছে এবং তাহা হইতে যখন যেভাব মনে জাগিয়াছে শুদ্ধমাত্র প্রকাশের প্রেরণায় তাহা তখন প্রকাশ করিয়াছেন। সেই-হেতু বইটির গোত্র নির্দ্দেশ করাও সহজ নয়। ইংরেজীতে impressions বলিলে যাহা বোঝায়, কতকটা তাহার আদল আসে। কিন্তু তাহা বলিয়াও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, প্রশ্ন হইবে, কিসের impressions? যদি বলি, ইউরোপের, ভুল বলা হইবে। প্রথমতঃ সমগ্র ইউরোপ তাঁহার মনে রেখাপাত করে নাই। Teuton ইউরোপ তাঁহাকে যেভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, যেভাবে তাহার মনকে নাড়া দিয়াছে, Latin ইউরোপ সে-তুলনায় কিছুই করে নাই। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয় impressions লইয়াই তাঁহার মন কারবার করে নাই। তাঁহার আশ্চর্য্য গতিশীল মনকে ইউরোপ কেবল দোলা দিয়া সজাগ করিয়া দিয়াছে, তারপর তাঁহার চিত্তবৃত্তি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবলীলায় বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পৌর্ব্বাপর্য্যের কোনও হিসাব নাই। বইটির যেখানে সুরু সেখানে যে কেন সুরু এবং যেখানে শেষ সেখানে যে কেন শেষ, তাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ সেই কারণেই প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠার বইটি পড়িয়া শেষ করিতে একবারও ক্লান্তি বোধ হয় না। লেখক ত জমাখরচের হিসাব লেখেন নাই, তিনি সাহিত্য-রচনা করিয়াছেন। যখন যেকথা মনে জাগিয়াছে, সুন্দর করিয়া তাহা বলিয়াছেন।—জোরের সঙ্গে অনুভব করিয়াছেন বলিয়া বলা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহার কিছুই গোপন করেন নাই, যাহা অনুভব করেন নাই, কেবলমাত্র effect-এর খাতিরে তাহা বলিতে যাওয়ার মিথ্যাচারও কোথাও করেন নাই। এই সাহিত্যিক sincerity বা সত্যনিষ্ঠা বইটির দ্বিতীয় প্রধান পরিচয়।

তরুণ মনের যাহা যাহা লক্ষণ তাহার সাক্ষাৎকার এই বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই প্রায় পাওয়া যায়। মানব-জীবন-সম্পর্কিত এমন কোনও বিষয় প্রায় নাই, যাহাতে লেখকের মনের রুচি নাই, বা যাহা লইয়া তিনি চিন্তা করেন নাই। পথঘাট, বাড়ীঘর, শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, নাগরিক জীবন, পারিবারিক জীবন-যাত্রা, অতীতের ইতিহাস, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, সব কিছুর মধ্যেই তাঁহার চিত্ত রসের সন্ধান জানিয়াছে এবং সবকিছু লইয়াই তিনি সাহিত্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনো একটি জিনিষ লইয়া ধ্যান করিতে বসিয়া যাওয়া তরুণ-মনের স্বভাব নয়, তাই অন্নদা-শঙ্করের লেখাতেও কোনও গভীর উপলব্ধির কথা নাই। গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, এমন কথা বলিব না, বুঝিতে পারি সে অবসর তাঁহার ছিল না। যদি থাকিত, হয়ত, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণবস্তু কোথায়, তাহার আসল স্বরূপটি কি, সে-পরিচয় তাঁহার লেখায় পাওয়া যাইত। হয়ত তাঁহার মুখে এমন কথা শুনিতে

হইত না, "সাত্বিকতাব চর্চ্চা ইউবোপে নেই, কোনোকালে ছিল না।" শুদ্ধমাত্র বাজসিকতাব ভিত্তিব উপবে এতবড় একটা সভ্যতা এত দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পাবে না, ইহা অনুভব কবি বলিযাই সন্দেহ হয, ইউবোপকে তেমনভাবে তলাইযা বুঝিবাব মতো সময এবং মনোবৃত্তি লইয়া অন্নদাশঙ্কব ইউবোপে যান নাই। ইউবোপকে তিনি চোখ দিযা দেখিযাছেন, সে দেখা সত্য দেখা, বুদ্ধি দিযা বুঝিযাছেন, সে বোঝা সত্য বোঝা ; হৃদয দিযা ভালোবাসিযাছেন, সে ভালোবাসা সত্য ভালোবাসা। কিন্তু সব-কটাই দিশাহাবা ভাবে কবিযাছেন। ইউবোপেব কোনও বিশেষ একটি রূপকে তিনি দেখেন নাই, ইউবোপীয সভ্যতাব কোনও বিশেষ একটি প্রকাশকে তিনি বোঝেন নাই, ইউবোপেব কোনও বিশেষ একটি ইউবোপীযত্বকে তিনি ভালোবাসেন নাই। সব কিছুব উপবে ছাড়াছাডা ভাবে তাঁহাব দেহমনবুদ্ধি বিচবণ কবিযা বেডাইযাছে, সেখানেও পৌর্ব্বাপর্য্যেব হিসাব থাকে নাই।

ইহা স্বাভাবিকই হইযাছে এবং ভালোই হইয়াছে, তাহাই বলিতে চাই। "গভীব ভাবে গভীব কথা" অনেকেব মুখে অনেক বকম কবিযাই ত শোনা যায। কিন্তু এই যে বাহিব হইতে সমগ্রতায় ভাসা ভাসা কবিয়া কিন্তু আন্তবিকতাব সঙ্গে দেখা, ইহাব মূল্য বোঝে ক'জন? কোনও দেশেব গভীবতাব রূপটাই ত তাহাব একমাত্র রূপ নয়। অন্নদাশঙ্কবেব বই পডিযা যে ইউবোপকে দেখিতেছি, তাহাব মর্ম্মস্থানটিব পবিচয় না পাইয়াও তাহাকে পবমাত্মীযেব মতো লাগিতেছে, তাহাকে ভালোবাসিতেছি। যাহা কিছু এই লেখকেব দৃষ্টিকে মুগ্ধ কবিযাছে, তাঁহাব চিন্তাকে নাডা দিয়াছে, তাঁহাব হৃদয় জয় করিযাছে ; তাহা সামান্য নয।

বইটিকে লেখক বাইশটি পবিচ্ছেদে ভাগ কবিয়াছেন। পাঠকেব কাছে এই পবিচ্ছেদ-বিভাগেব বিশেষ-কিছু মূল্য নাই, লেখকেব কাছে নিশ্চয কিছু ছিল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি পবিচ্ছেদ ইউবোপীয কোনও একটি বিশেষ নিসর্গ-রূপ লইযা সুরু হইযাছে, দেখিতে পাই। ইহা হইতে বুঝিতে পাবি, লেখকেব বচনাব আসল inspiration-এব মূলটি কোন্‌খানে। অন্নদাশঙ্কর কবি, সৌন্দর্য্য যেমন কবিযা তাঁহাব মনোমুগ্ধ কবে, এমন আব কিছুতে কবে না। সৌন্দর্য্যবসে মনকে অভিষিক্ত কবিযা লইযা তাব পব তিনি লিখিতে বসেন, তখন তাহাব মন দেখিতে, বুঝিতে, ভাবিতে উৎসাহ পায, এইটুকু মনে বাখিলে তাঁহাব রচনাবীতিকে বোঝা সহজ হইবে। বর্ষাব নদীব মতো মনও একবাব পবিপুর্ণ হইলে, বিষয হইতে বিষযান্তবে তাহাব গতি হয, সাবলীল সুন্দব, অব্যাহত। অন্নদাশঙ্কবেব প্রকাশভঙ্গী সাবলীল, সুন্দব, অব্যাহত। এমন সুন্দব গদ্য-রচনা খুব বেশী পডিযাছি বলিযা মনে পড়ে না।

কিন্তু দোষগুণ নির্দ্দেশ না কবিয়াও একথা বলা যায় যে, অন্নদাশঙ্কবের গদ্য-বচনা কবিব গদ্য-বচনা। কবিত্বময়, উপমা-বহুল। কিন্তু উপমাগুলি সুসঙ্গতিতে সুন্দব, কষ্ট-কল্পিত নয। ববীন্দ্র-যুগে যেমনটি হওযা উচিত তাহাই। কিছু কিছু তুলিয়া দিবাব লোভ হইযাছিল, কিন্তু সে-লোভ সম্ববণ কবিতেছি। অমন সুন্দব জিনিষকে কাটা-ছেঁডা কবা বর্ব্ববতা হইবে।

দুটি-তিনটি কথায় একটি সমগ্র ভাবকে প্রকাশ কবিবাব ক্ষমতাও তাঁহাব অসাধাবণ। ভাষাকে অনাবশ্যক ফেনাইয়া তোলা, অনুপ্রাস-অলঙ্কাবেব বাহুল্য, বক্তব্য বিষয়কে অনাবশ্যক ঘোবালো বা অনাবশ্যক জোঁবালো কবিয়া বলা, এসব কিছুই

তাঁহার লেখাতে নাই। প্রকাশভঙ্গীতেও তাঁহার সাহিত্যিক sincerity লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধিমান মানুষ কবিতা লিখিতে বসিলেও নিজের মতামত সকলকে শোনাইয়া দিতে চেষ্টা করে, সুতরাং ইউরোপ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া অন্নদাশঙ্কর যে নানাবিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ বইটির বিষয়-বস্তু হইতে তাঁহার মতামতগুলিকে বাদ দিলে, বিশেষ কিছু আর অবশিষ্টও থাকে না। বিচার-বিতর্কের দিক দিয়া, মতামতগুলির মূল্য সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার ক্ষেত্র এ নয়, এবং না বলিলেও আসে যায় না কিছু। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বইটির ভূমিকাতে ঠিকই বলিয়াছেন, "মতামতের বিশেষ কোনও মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।" অন্নদাশঙ্করের মতামতের সবগুলিই সুপরিণত নয়, কোথাও কোথাও আত্মবিরোধ-দোষ ঘটিয়াছে, এমনকি একই পৃষ্ঠাতেও ঘটিয়াছে; অন্ততঃ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি অসার হইয়াছে, এবং ফ্রান্সের এশিয়া-মহাদেশস্থিত উপনিবেশগুলির শাসনরীতি-সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মারাত্মক অভাব তাঁহার ফ্রান্স সম্বন্ধীয় একটি উক্তিতে সূচিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও তাঁহার মতামতের পশ্চাতে যে-একটি সুন্দর সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুসন্ধিৎসু, জীবন্ত এবং জাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাই এগুলিকে মূল্যবান্ করিয়াছে।

বিশেষ করিয়া আমাদের ভাল লাগিয়াছে, নারীজাতি-সম্বন্ধে লেখকের সহজ প্রাণবান্ সহানুভূতি।—ইহা নিতান্তই সহজ-সংস্কারের-ব্যাপার, বিচার-নিরপেক্ষ; মতামতের বিষয় হইয়াও বাহিরের জিনিষ। এই একটা জায়গাতে লেখক কতবার যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই, অথচ একবারও ভুল করেন নাই। নারীজাতি-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার একেবারে মর্ম্মস্থানটিতে তাঁহার দৃষ্টির আলোক সহজে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা নারীদের sexless করিয়া তুলিতেছে কি-না, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন ঃ

"নারীর নারীত্ব যে সাগরতলের চেয়েও অতল; পরিবর্ত্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদ্‌বুদ, কোনকালেই তা' অতলস্পর্শী হ'তে পারে না; বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মন্থন ক'রেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়তে পারা যায় তার সুধা আর তার বিষ।"

ইউরোপীয় জীবন-যাত্রার মধ্যে নব-নারীর সম্পর্কটিই যে বিশেষ করিয়া তাঁহার মনোহরণ করিয়াছে, এ-স্বীকারোক্তি বইটির প্রায় প্রারম্ভেই অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি করিয়াছেন ঃ

"সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতিকাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা। নারী-সম্বন্ধে এদেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপ সক্রিয় ক'রে তোলে। কেবল চোখে দেখবারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা' ঐশ্বর্য্যান্বিত ক'রে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিভিয়েছেন।"

স্ত্রীপুরুষের মিলিত নাচের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছে ঃ

"আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন। নিজের নিকট আত্মীয়-আত্মীয়া ছাড়া এত বড় সমাজের যত পুরুষ, যত নারী সকলেই পরস্পরের

কাছে অলক্ষ্য অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক্ থেকে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক্ থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের একদেশদর্শিতা, স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বুভুক্ষা আমাদের সমাজকে ত ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যিকেও খণ্ডিত (repressed) বিবংসার ব্যবচ্ছেদাগার ক'রে তুলেছে। ·· ····· বল্‌রুমের নাচ উঁচুদরের কেন, কোন দরেরই আর্ট নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ। সমাজের দশজন পুরুষের সঙ্গে দশজন নারীকে পরিচিত ক'রে দেবার একটা উপায়। যে-সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজেকে অর্জ্জন কর্‌তে হয়, সে-সমাজে এইপ্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের উপর সর্ব্বনারীর নারীত্বের দাবী যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান্, প্রিয়দর্শন ও সুগঠিত দেহ হ'তে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের উপর সর্ব্বপুরুষের পৌরুষের দাবী তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী, স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হ'তে প্রেরণা দেয়। সর্ব্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি পুরুষের দাবী এবং সর্ব্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি নারীর দাবী বলবান্‌কে করে প্রেমবান্ ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী।"

সর্ব্বপুরুষের দাবী প্রতি নারীর এবং সর্ব্বনারীর দাবী প্রতি পুরুষের কেবলমাত্র দৈহিক সৌষ্ঠব এবং স্বাস্থ্যের উপরেই, লেখক তাহা বলিতে চান না ধরিয়া নিলে, স্ত্রীপুরুষের অবাধ সামাজিক মিলনের স্বপক্ষে উপরোক্ত যুক্তিগুলি অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

ইউরোপের পারিবারিক জীবনের simplicity বা গ্রন্থিস্বল্পতার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

"আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে স্নেহময়ী, এমন মনে কর্‌লে দেশকালনিরপেক্ষ নারীপ্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহান্ধ, তারা আমাদের রেখেছে 'বাঙালী ক'রে, মানুষ করেনি।' কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হতভাগিনীদের আমরা 'পথি বিবর্জ্জিতা' ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাওয়াটাকেই মনে করি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সন্ন্যাসী হ'য়ে যাই, তখন কুলবনিতার বারবনিতার ভেদ রাখিনে।"

এমনই করিয়া নারীজাতির কথা নানাপ্রসঙ্গে বারম্বার উঠিয়া পড়িয়াছে, এবং যখনই উঠিয়াছে, লেখকের সহজবুদ্ধি তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো সমস্ত সংশয়-সমস্যা এবং মিথ্যাসংস্কারের জাল অনায়াসে ছেদন করিয়াছে। সহজ-সাবলীল ভাষা সাবলীলতর হইয়াছে, তেজোময় প্রকাশভঙ্গীতে দ্বিগুণ তেজ সঞ্চারিত হইয়াছে, বিচারবুদ্ধি একবার ভুলিয়াও তাঁহাকে ভুল পথে লইয়া যায় নাই।

বাংলা দেশে আজিকার দিনে এমন মানুষের অভাব নাই, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষকে ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,—নারীত্বের একটি নূতন আদর্শ, এবং সেই আদর্শে তৈরী নূতন এক type-এর নারী। অন্নদাশঙ্করের বইটির সেই-দিক্‌টিকে লইয়া আলোচনা করিয়াই, এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও মনে হইতেছে যে, যদি তিনি ইউরোপে গিয়া আর কিছুই না দেখিতেন, আর কিছুই তাঁহার মনে মুগ্ধতা না জাগাইত, এবং ফিরিয়া আসিয়া আর কিছুরই

কথা আমাদিগকে না বলিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাব এই গ্রন্থবচনা সার্থক হইত।

ইউবোপকে চাক্ষুষ কবিবাব সৌভাগ্য যাঁহাদেব হয নাই অথচ ইউবোপকে অন্তবে অন্তবে যাঁহাবা ভালোবাসেন, তাঁহাদিগেব মধ্যে এই বইটিব বহুল প্রচাব কামনা কবি।

শ্রীসুধীবকুমাব চৌধুবী।

GRAND HOTEL—VICKI BAUM (GEOFFREY BLES).

জার্ম্মাণ লেখক Vicki Baum-এব লেখা Menschen Im Hotel নামক বিখ্যাত গল্পেব ইংবাজী অনুবাদ Grand Hotel। মানুষেব জীবনে যখন সুখেব অভাব হয়, তখন সে সুখেব খোঁজে নিজেব গণ্ডিব বাইবে চলে যেতে চায,—মনে কবে যে, বাইবে কোথাও বাস্তব সুখ আছে যা' চেষ্টা কবলে আযত্তেব মধ্যে আসতে পাবে। ভাবে যে, আমাব জীবনটাই বৃথায গেল, কিন্তু অন্যান্য লোক কি সুখেই না আছে। আমাব অবস্থা যদি অমুকেব মতন হ'তো তা' হ'লে হযতো আমাব জীবন সার্থক হ'তো। কিন্তু এ-সব চিন্তা মানুষেব মনে মনেই থাকে, কাবো এমন সাধ্য নেই যে, নিজেব পাবিপার্শ্বিকেব গণ্ডি কাটিযে বাইবে যায়। এমন কোনো সুযোগ মেলে না, যাতে তাব অবস্থাব পবিবর্ত্তন ক'বে যেমনটি চায় তেমনটি ঘটিযে তুলতে পাবে। কিন্তু দৈবাৎ যদি কেউ সুযোগ পেয়ে যায এবং সুখ পেতেই চাই ব'লে দড়ি-দড়া ছিঁড়ে মবিয়া হ'যে বেবিযে পড়ে, তা' হ'লে তাব কি অবস্থা দাঁড়ায়, তাব উদ্দাম বাসনা কোন পথ দিয়ে তাকে ছুটিযে নিযে চলে, কোথায় তাব তৃপ্তি মেলে, সেই বিষয নিয়েই গল্পটিব অবতাবণা।

জার্ম্মাণিব এক ছোট সহবে সূতাব কলে এক মধ্যবিত্ত কেবাণী, নাম ক্রিঙ্গলাইন, সপবিবাবে বাস কবতো। তাব শবীব চিবরুগ্ন, আব সংসাবেও তাব সুখ ছিল না। কাবণ যাকে নিযে সংসাব, সেই স্ত্রীব সঙ্গে তাব মতে মিলতো না। স্বামী বোগা, কবে আছে কবে নেই, তাই স্ত্রীব একটু হাতটান ছিল, ভবিষ্যতেব জন্য কিছু পয়সা সঞ্চয়েব চেষ্টা কবতো। লোকটাব একটু সৌখিন হবাব ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীব জন্য তা' হ'তে পাবতো না। তাব গান-বাজনাব সখ, একটি পিয়ানো কেনাব বড ইচ্ছা, কিন্তু তাব সুযোগ পায় না। একটি কুকুব পুষেছিল, ট্যাক্স দিতে হ'বে ব'লে স্ত্রী তাকে বিদায ক'বে দিলে। সমস্ত দিন খাটুনিব পব সন্ধ্যাব সময হযতো একটু বই পডবে, স্ত্রী ডাকলে তাব বান্নাব কাঠগুলো কেটে দিতে। লোকটা সাধাবণেব চেযে একটু অন্য বকমেব ছিল, কিন্তু তাব স্ত্রী তাকে তেমন ভাবে বুঝতো না, কাজেই তাকে সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকতে হ'তো। তবু খুঁটি-নাটিব মধ্য দিযে একবকম ক'বে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তাব তাকে জানিযে দিলে যে, তাব পবমাযু ফুবিযে এসেছে। তাব যে অসুখটা থেকে থেকে দেখা দেয সেটা শীঘ্রই একদিন এমন বেড়ে উঠবে যে, তাব থেকে সে আব বক্ষা পাবে না। ডাক্তাবেব কাছে এই নোটিস পাবাব পব সে ভেবে দেখলে যে, তাব একঘেয়ে কেবাণী-জীবন ঘবে এবং বাইবে কেবল বকুনি খেযে খেযে বৃথাই কেটে যায়, জীবনেব সুখ কিছুই ভোগ কবা হয না। তাব কলেব মনিব তাবই মত মানুষ হ'য়ে জন্মেছে,

অথচ পৃথিবীর কত আনন্দই ভোগ করছে, আর সে তার কোনোই আস্বাদ পাবে না, এমনি এমনিই মরে যাবে? সে স্থির করলে যে, মরবার আগে জীবনের যত কিছু সুখ আছে সব একবার ভাল ক'রে ভোগ ক'রে নেবে। এই ভেবে তার যা' কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, সব বেচে কিছু মোটা টাকা হাতে নিয়ে চিকিৎসা করাবার ভান ক'রে ছিয়াচল্লিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে বার্লিন সহরে পালিয়ে গেল। সেখানে যে-হোটেলে তার মনিব গিয়ে ওঠে, সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্র্যাণ্ড হোটেল, সেখানে গিয়ে সব চেয়ে ভাল একখানা কামরা ভাড়া নিলে। এই গ্র্যাণ্ড হোটেল গল্পের প্রধান ক্ষেত্র। গল্পের যা' কিছু ঘটনা তা' এই হোটেলের মধ্যেই এবং নায়ক-নায়িকা সকলেই এই হোটেলের আগন্তুক ও অধিবাসী। কেউই এখানে চিরকাল থাকে না; দুদিনের জন্য আসে, আবার দুদিন বাদে কে কোথায় চলে যায়। হোটেলের প্রবেশ-পথে কাঁচের ঘূর্ণি-দরজা ক্রমাগতই ঘুরছে, আর কত রকমের কত লোক কখন আসছে, কখন যাচ্ছে তার কোনো ঠিকানাই নেই। দরজাটা অবিরাম ঘুরে ঘুরেই চলেছে, গতিবিধির বিরাম নেই। হোটেলটি যেন এই বড় পৃথিবীর একটি খাটো সংস্করণ, যেখানে নিত্যই নানারকম লীলাখেলা চলছে, কিন্তু কেউই এবং কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এই হোটেল-সম্বন্ধে লেখক গল্পটির মাঝে মাঝে অনেকবার এক-একটি চমৎকার দার্শনিক ইঙ্গিত করেছেন।

হোটেলে এসে অনেক লোকের সঙ্গে এবং অনেক কিছুর সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটলো। কিন্তু সে খুঁজে বেড়াচ্ছে আসল আনন্দ কোথায়,—Where is real life? মনে হচ্ছে আসল প্রাণ-প্রবাহ কোথায় যেন বেয়ে চলেছে,—কিন্তু সে কই? একজন pessimist বন্ধু বল্লেন,—"Does life exist at all as you imagine it? The real thing is always going on somewhere else!" সুখ-সম্বন্ধে চিরকাল এমনিই মনে হবে,—এখানে তা' নেই, যেন আর কোথাও আছে। কিন্তু ক্রিঙ্গলাইন কেবলই মনে ভাবছে যে, শীঘ্র তাকে মরতে হবে, সে মরিয়া হ'য়ে একধার থেকে সব সুখের বস্তুর আস্বাদ নিতে লাগলো। ভাল পোষাক পরলে, ভাল খাবার খেলে, মোটর-এরোপ্লেনে সখ মিটিয়ে চড়লে, নাচলে, গাইলে, জুয়া খেল্‌লে, মদ খেলে এবং বিলাসের যা' কিছু চরম তা' সমস্তই ভোগ ক'রে নিলে। এমন কি, তার পুরানো মনিবের উপস্থিতিতে গায়ে প'ড়ে তাকে তার পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য মনের ঝাল মিটিয়ে দুকথা শুনিয়ে দিলে। যথেষ্ট আমোদ পেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু তৃপ্তি তবুও মিল্‌লো না। একদিন ঘটনাচক্রে হঠাৎ এক সুন্দরী যুবতী অত্যন্ত ভয় পেয়ে নগ্ন অবস্থাতেই আশ্রয় নিতে তার ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো। তাকে সে আশ্রয়ও দিলে, যথেষ্ট শুশ্রূষাও কর্‌লে, কিন্তু সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য আর নগ্ন দেহের গঠন দেখতে দেখতে তার প্রাণে কি এক অনুভূতি, কি বিস্ময় ও পুলক জেগে উঠলো,—"this buoyancy and moltenness and transparency and release was known to him only in dreams!" সে ভাবলে,—এতটা সৌন্দর্য্য তবে পৃথিবীতে সত্যই তো আছে,—আর সত্যই আমি তা' দেখলুম। "It can really happen that a girl is so wonderfully beautiful, so utterly beautiful!" এবং অবশেষে এখন সে জীবনের স্বাদ প্রথম অনুভব কর্‌লে,—এখন সে সত্য সত্য বাঁচার মতন বেঁচে উঠ্‌লো,—at this moment he

truly, actually and utterly lived। সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন সার্থক হ'য়ে উঠলো। মরতে আর তার দুঃখ রইলো না।

বইখানির আসল আখ্যান-বস্তু এইটুকু,—কিন্তু এতে আরো অনেক জিনিষ আছে। এক হিসাবে একে sensational বলা যায়। এতে চুরী আছে, খুন জখম আছে, লুকোচুরী আছে, তা' ছাড়া কুস্তির লড়াই, জুয়ার আড্ডা, থিয়েটারের ষ্টেজ, বিলাস গৃহের ছবি প্রভৃতি অনেক কিছুই আছে। কিন্তু এই সব পার্থিব উপকরণের মধ্য দিয়ে এমন একটি কবিত্বের মিষ্ট-ধারা, এমন একটি দরদের সুর বেয়ে চলে গেছে যা' সচরাচর এই জাতীয় গল্পের মধ্যে দেখা যায় না। বইখানি পড়া হ'য়ে গেলে এই সব ঘটনার কথা শীঘ্রই মন থেকে মুছে যায় কিন্তু সেই মিষ্ট সুরটি গানের রেশের মত অনেক দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে বাজতে থাকে আর স্থানে স্থানে যে চমৎকার কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা' টুক্‌রা টুক্‌রা আকারে মনে প'ড়ে যায়। এর বলবার ভঙ্গী ভালো, ভাষাও খুব ভালো, তাই ঘটনা-বহুল হ'লেও বইখানি এত ভালো।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য।

KARL UND ANNA—LEONARD FRANCK.

ইয়োরোপের শেষে এসিয়ার সীমান্তে রুসিয়ার এক steppe-তে গল্পটির সুরু। দিগন্তপ্রসারিত সুবিস্তীর্ণ শূন্য প্রান্তর মাইলের পর মাইল চ'লে গেছে—দিগন্ত যেন মরীচিকা, যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই সে দূরে আরও দূরে সরে শ্রান্ত পথিককে ভুলিয়ে নিয়ে চলে—বন্ধ্যা ভূমির ওপর অসীম আকাশ করুণ, উদাস; চারিদিকে কোথাও দিশা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অসীম শূন্য প্রান্তরের একধারে রুসদের কাছে বন্দী দু'টি জার্ম্মাণ সৈনিক মাটি খুঁড়ে লম্বা ট্রেঞ্চ তৈরী ক'রে চলেছে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তারা মাটির তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে—যুদ্ধ-লাইন হ'তে এত দূরে শত্রু আসার সম্ভাবনা খুবই কম, ট্রেঞ্চ খোঁড়ার বিশেষ দরকার নেই, তবু হাতে কাজ চাই ত।

কার্ল ও রিচার্ড দুজনেই শ্রমজীবি, জার্ম্মাণীতে কলে কাজ করত; রিচার্ড বিবাহিত, নতুন ঘরকন্না পেতেছিল, কার্ল কিন্তু গৃহ-হারা, নারীর প্রেম সে জীবনে কখনও জানেনি। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মাঝে মাঝে রিচার্ডের মন উদাস হয়, একটি নারীমূর্ত্তি তার চোখে দিগন্ত ভরে ভেসে ওঠে, কার্লকে সে তার প্রতীক্ষমানা স্ত্রীর কথা বলতে আরম্ভ করে। দিনের পর দিন কার্ল রিচার্ডের কাছে তার সহরের কথা, স্ত্রীর কথা, বিবাহিত জীবনের কথা শুনেছে,—তার স্ত্রী কেমন দেখতে, কেমন ভঙ্গীতে সে দাঁড়ায়, তার দেহে কোথায় কি দাগ আছে; তার ঘরের যে সব আসবাবপত্র কিনেছে তার কত কিস্তি দাম বাকী—এমনি রিচার্ডের সংসারের সব খুঁটিনাটি এ-গৃহহীন কার্লের জানা। রিচার্ড বলে ওঠে, "জানিস কার্ল, যখন সে ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে ওঠে, আমি শুই দেওয়ালের দিকে আর সে--" কার্ল বাধা দিয়ে বলে, "হাঁ, জানি, হাজারবার তোর কাছে শুনেছি।" তবু রিচার্ড ব'লে চলে। একজন তার গৃহের কথা এমনি ক'রে ব'লে একটু তৃপ্তি পায়, বিরহ ব্যথার লাঘব হয়; আর একজন তৃষিতের

মত এ-বর্ণনা শোনে—তাব অন্তবে অজানা বেদনা, অরূপ স্বপ্ন; তাদেব ঘিবে শূন্য প্রান্তরেব উদাস দিন, স্তব্ধতা-ভাবাক্রান্ত বাত্রি।

সহসা একদিন দু'জনেব মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। কর্তৃপক্ষদেব হুকুমে রিচার্ডকে আবও দূবে অন্য জায়গায় পাঠান হ'ল, কার্ল বইল একা। আব সে একা থাকতে পাবলে না। আনা, বিচার্ডেব স্ত্রী আনা, কোন্ সুদূব থেকে তাকে আকর্ষণ কবছে, তার মন চঞ্চল, গৃহের শান্তির জন্য, একটি নাবীব প্রেমেব জন্য তাব হৃদয় তৃষিত—প্রহবীদেব অলক্ষ্যে কার্ল একদিন বাহিব হ'য়ে পড়ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য—এক জার্ম্মাণ সহবেব শ্রমজীবিদেব পাড়া। সরু বাঁকা পথ, কালো বড় বাড়ী, চাপা আকাশ, রুসিয়াব প্রান্তবেব করুণতা হয়ত আছে কিন্তু অসীমতা নেই। চাবমাস পরে কার্ল বিচার্ডেব সহবে এসে পৌছাল। বিচার্ডেব বর্ণনা শুনে শুনে এ-সহবের ছবি তা'ব মনে আঁকা বযেছে, বিচার্ডের বাড়ীব পথ তা'ব জানা, বাড়ীব সামনে এসে তা'ব হৃদয দুলে উঠল,—দ্বিতীয় উঠানে বাঁ দিকে প্রবেশেব পথ, দু'সিড়ি উঠে বাঁ দিকে দ্বিতীয় দবজা—বিচার্ডের কথাগুলি তা'ব মনে লেখা।

দবজায এক টোকা দিয়ে ধীবে দবজা খুলে ঘবের মধ্যে সে প্রবেশ কবলে—কতদিন কল্পনায় এ-ঘবটিব কথা সে ভেবেছে, কত স্বপ্নছবি এঁকেছে, এ-ঘবেব কোথায় শোবাব খাট, কোথায টেবিল, কোথায় বাঁধবাব উনান, তাব সব জানা। কার্ল ডাকলে, "আনা!" জানালাব ধাবে আনা দাঁড়িয়ে, কার্লেব চোখে যেন সুখ-স্বপ্ন; আনা তাব প্রিযা, তাব দেহে কোথায কোন দাগ আছে তা' সে জানে। আবেগেব সঙ্গে কার্ল বল্লে "আনা—আনা—আমায চিনতে পাবছোনা?" আনা ঘরেব মাঝে এসে দাঁড়াল, আশ্চর্য্যি হ'যে বল্লে, "কে আপনি?" হাতেব বোঁচকাটা চেযাবেব উপর বেখে কার্ল বল্লে, "চেযাবটা আবাব রং কবতে হ'বে দেখছি, আমি ত তোমায বলেছিলুম, এ রং বেশীদিন থাকবেনা, ফ্যাকাসে হ'যে যাবে—জানলায় নতুন পর্দ্দা দেখছি—আমবা সেবার কি সস্তায সে হলদে পর্দ্দাগুলো কিনেছিলুম—" আনা যেন স্বপ্নে কথা শুনে ব'লে উঠলো, "কে আপনি?" কার্লেব মুখ সাদা হ'য়ে গেল, ধীবে বল্লে "আমি বিচার্ড।" হাতটা টেবিলে চেপে আনা বল্লে, "আমাব স্বামী? না, আপনি আমাব স্বামী নন।" "আনা—আনা—আমায় বিশ্বাস কবছোনা—আব আমি কেবল তোমাব কথা ভাবতে ভাবতে এসেছি—"

আনা একটি হলদে পোষ্টকার্ড কার্লেব হাতে দিলে। কার্ল পড়লে, তাতে লেখা, ১৯১৪র ৪ঠা সেপ্টেম্ববে বিচার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে মাবা গেছে। যুদ্ধ-আফিসেব চিঠিটা আবাব পড়ে বহস্যময হেসে কার্ল বল্লে, "এ ভুল।" আনাব দিকে হাত বাড়িয়ে সে এগিযে এল।

আনা বুঝলে, এ সত্যি তাব স্বামী নয। কিন্তু এ প্রেম-ভিখাবী অতিথির প্রতি তাব অন্তব মমতায ভবে গেল, এ যেন অসহায শিশু, মাতৃস্নেহেব জন্য কাঁদছে। আনা চেঁচালে না, পাড়াব লোক ডাকলে না, কার্লকে চলে যেতে বলতে পাবলে না। সে তবু ধীবে বল্লে, "আপনাব বোধ হয ক্ষিধে পেয়েছে।" তাব পব টেবিলে খাবাব সাজাতে লাগল। কার্ল বলে উঠল, "আচ্ছা পুবানো কাঁটাটা নেই বুঝি, সেই তিন দাঁতওযালা কাঁটাটা, তাব একটা দাঁত একটু ছোট ছিল—আচ্ছা আসবাবপত্তবেব দাম দেওযাব কত কিস্তি এখনও বাকী আছে?" আনা চমকে উঠল। এ তাব

স্বামী ? না, এ-তার স্বামী নয়, কিন্তু এ সব কথা সে জানলে কেমন ক'রে ! ধীরে আনা বল্লে, "আমি এ চার বছরে সব দাম দিয়েছি।"

কার্ল তার স্বামী নয়, তবু ধীরে ধীরে দিনে দিনে আনা কার্লকে তার অন্তরে স্বামী ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে, তাকে স্বামীর সব অধিকার দিলে, গৃহ-হারা প্রেমার্ত্ত অতিথিকে সে বলতে পারলে না, চলে যাও।

বাড়ীর লোকেরা, পাড়ার লোকেরা জানলে আনার স্বামী ফিরে এসেছে, যুদ্ধে মরে যাবার কথাটা ভুল ; সবাই আনাকে শুভকামনা জানালে, আনা ভাগ্যবতী, তার মৃত স্বামী বেঁচে ফিরে এসেছে। পাড়ার ছেলেরা কার্লকে ডাক্‌ত, রিচার্ড। কার্ল এখন হোর রিচার্ড। কলে সে এক কাজ খুঁজে নিলে। তার জীবন প্রেমে আনন্দে ভরে উঠ্‌ল।

কয়েকমাস কেটে গেল। জার্ম্মাণীর সঙ্গে রুসিয়ার যুদ্ধ থেমে গিয়ে সন্ধিসর্ত্ত-অনুসারে দু'পক্ষের সব বন্দীদের বিনিময় হ'ল। রুস কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে রিচার্ড আনার কথা ভাবতে ভাবতে ট্রেনে উঠ্‌ল ; কার্ল ও আনার দু'দিনের বাঁধা সুখের ঘরের মধ্যে মূর্ত্তিমান প্রলয়ের মত একদিন সে সহসা হাজির হ'ল।

শেষের দৃশ্যটি বড় করুণ। দরজা খুলে পুরাতন ঘরে ঢুকে রিচার্ড দেখে, কার্ল ঘরে বসে। সে অবাক হ'য়ে বল্লে, 'তুমি ? তুমি এখানে ? কি আশ্চর্য্য, আমি এই মাত্র আসছি, এসেই তোমার সঙ্গে দেখা।" সে-ঘরে যখন আনা প্রবেশ করলে, সে যেন ভূত দেখ্‌লে, দিশাহারা হ'য়ে অর্দ্ধঅচেতনভাবে মাতালের মত টলে পড়ে গেল, কার্ল তাকে ধরলে। রিচার্ড ব্যথিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "কি হয়েছে আনা ? তুমি কি অসুস্থ—আনা—কি হয়েছে তোমার ?" আনা কোন উত্তর দিলে না, রিচার্ড তার কাছে এগিয়ে এল, কার্ল বল্লে, "আনা আমার স্ত্রী, আমি সব বলছি।" কিছু বলবার দরকার হলনা, রিচার্ড সব বুঝলে, দেখলে, আনা গর্ভবতী। রিচার্ডের মাথায় খুন চাপ্‌ল, ঘরের যে কোণে কুড়োল থাক্‌ত সে পাগলের মত ছুটে গেল ; কিন্তু কুড়োল দিয়ে কার্লকে আঘাত করার আগেই অতি নিষ্ঠুর আঘাতে তার হৃদয় ভেঙ্গে গেল। আনা ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে বল্লে—"আমি ওর, আমি এখন ওর, আমাকে মেরে ফেল রিচার্ড—এই ছিল নিয়তি—আমাকে মেরে ফেল—" বেদনার সঙ্গে রিচার্ড বল্লে—"তুমি এখন আমার নও ? তুমি আমায় চাওনা ? আর আমায় চাও না ?" কান্নার সুরে আনা বল্লে—"না—না—আর পারি না—"

রিচার্ড চেয়ারে বসে পড়ল ; তার চারিদিকে অন্ধকার। সে যেন একটু আলোর জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করছে, চেয়ার থেকে উঠে সে বল্লে. "পার না ? কেন পার না আনা ? কেন ? তুমি এখন—আমি কিছু বুঝতে পারছি না—" আবার সে চেয়ারে বসে পড়ল।

কার্লের কণ্ঠ—"এখন আমাদের চলে যাবার সময় হ'ল—চলে যেতে হবে—চলো—আনা—" তার এক হাতে একটি ছোট ব্যাগ, আর এক হাত আনার হাতে।

কার্ল ও আনা হাতধরাধরি ক'রে বাহির হ'ল, ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠান পার হ'য়ে গেট ছাড়িয়ে সরু পথ দিয়ে চল্ল, তাদের দু'ধারে কালো বাড়ীর সারি। পাড়া ছাড়িয়ে সহরতলী পার হ'য়ে তারা সহরের প্রান্তে খোলা মাঠের পথে গিয়ে

পডল, তাদেব পেছনে অন্ধকার সহব, সামনে মলিন চাঁদেব আলোভবা তুষাবঢাকা বাত্রি, দু'ধাবে রহস্যঘন গাছেব ছাযা, ওপবে তারাগুলি নিষ্প্রভ, শীতল।

কার্ল ও আনা দু'জনে হাত ধবাধবি ক'বে চল্ল। কোন কথা বল্লে না, কিছু ভাবলে না, জীবনেব দুর্জ্ঞেয রহস্যময় পথে প্রেমে মিলিত দুই যাত্রী, একমাত্র মৃত্যু তাদেব বিচ্ছিন্ন কবতে পাববে।

•

লেওনার্ড ফ্রাঙ্কেব "কার্ল ও আনা" যখন পডি, গল্পটি আমাব হৃদযকে গভীবভাবে স্পর্শ কবে; গল্পেব ঘটনা করুণতায় ভবা, লিখনভঙ্গীব সবলতায বেদনা আবও সুতীব্র হ'য়ে ওঠে, গল্পবলাব স্বচ্ছতায় দুঃখেব বহস্যময সৌন্দর্য্য অশ্রুসমুজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়।

আনাব চবিত্র কি সুন্দব, করুণ। সে ত জানত তাব স্বামী বিচার্ড যুদ্ধেব আবম্ভেই মাবা গেছে; কিন্তু সেই মৃত স্বামীব স্মৃতি তাব কাছে পুণ্যময ছিল। শ্রমজীবিপাডার অনেক সৈনিকদেব স্ত্রীবা স্বামীব অবর্ত্তমানে অন্য পুরুষদেব সঙ্গে বাস কবছিল, কিন্তু আনা ছিল সত্যই সতী। তাবপব এল কার্ল তাব স্বামীব স্মৃতি বহন ক'বে, স্বামীব অধিকাব দাবী ক'বে। কার্লকে সে প্রত্যাখ্যান কবতে পাবলে না, তাব কাবণ, প্রতি নাবীব মধ্যে যে চিবন্তনী মমতাময়ী বযেছে তাবি চবণে কার্ল তাব প্রেমঅর্ঘ্য নিবেদন কবলে। যখন আনাব মনে স্বামীব স্মৃতি ম্লান হ'যে গেছে, কার্ল তাব হৃদয়েব সম্রাট্, তখন এল আবাব রিচার্ড। হায়! বিচার্ডকে সে তখন কেমন ক'বে গ্রহণ কববে, সে যে সত্যই কার্লকে ভালবাসে। এই দ্বন্দ্বে তাব অন্তব মথিত হ'য়ে উঠল, তাই বিচার্ড যখন কুড়োল হাতে কার্লকে মাবতে গেল, আনা এগিয়ে এসে বল্লে,—'আমায মেবে ফেল'। সত্যই সে মবতে চেয়েছিল, জীবনে যেন তাব আব সুখ নেই। কার্লকে সে সত্য ভালবাসে ব'লে সে কার্লেব হাত ধবে জীবন-পথে বাহিব হ'ল বটে, কিন্তু সে ত আনন্দেব যাত্রা নয়, বেদনায তাব অন্তব মূক।

লিওনার্ড ফ্রাঙ্ক বিশেষভাবে শ্রমজীবি-জীবনেব চিত্রকব। তিনি নিজে ছুতোবেব ছেলে, কুলিমজুবদেব সুখদুঃখেব ইতিহাস পবম সহানুভূতি ও মমতাব সঙ্গে লিখেছেন। তাঁব প্রথম বই The Robber Band (১৯১৪) পবিবাব হ'তে পলাতক বালকদেব নিযে এক ডাকাতেব দলেব গল্প—মজুব পাডা, মদেব দোকান, হাঁসপাতাল, বস্তি-জীবন মানবসভ্যতার অন্ধকাব দিকেব বাস্তব চিত্র। The Cause of the Crime (১৯১৫) উপন্যাসে ফ্রাঙ্কেব লেখাব বীতিব পবিবর্ত্তন হ'ল, তিনি ধীবে এক্সপ্রেসনিজমেব দিকে অগ্রসব হ'লেন,—কদর্য্য নগ্ন বাস্তবেব নিখুঁত চিত্র আঁকা নয়, অন্তবেব বেদনাকে ভাষা দেওয়াই শিল্পীব কাজ। A Middle Class Man (১৯২৪) উপন্যাসখানিতে ফ্রাঙ্কেব এক্সপ্রেসনিষ্ট বচনা-বীতিব পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। গল্পেব নাযক Jurgen যৌবনে শ্রমজীবিদেব অধিকাব লাভেব সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ কববে ব'লে ঠিক কবেছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে হ'ল কলেব মালিক, লক্ষপতি, যাব হওয়া উচিত ছিল সোসিয়ালিষ্ট সে হ'ল বুবজোযা; কিন্তু তাব আত্মা শান্তি পেলে না; প্রকৃতি তাকে যে শক্তি দিয়েছিল মানবসভ্যতাব উন্নতিব, কল্যাণেব জন্য সাধনা কবতে, সে-শক্তি সে ব্যবহাব কবলে স্বর্ণস্তূপ পুঞ্জীভূত কববাব জন্য, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিলে; জীবনে কোথাও

আনন্দ বইল না ; গল্পেব শেষভাগে বিকৃত-মস্তিষ্ক Jurgen-ব অভিশপ্ত আত্মাব অসহনীয় দুঃখভোগেব চিত্রগুলি গ্রীক্ ট্রাজেডিব মত অতুলনীয় শক্তিতে অঙ্কিত।

"কার্ল ও আনা" গল্পটিও দ্বন্দ্বময কিন্তু এ সমস্যা জীবনেব চিবন্তন সমস্যা। এই করুণ সুন্দব গল্পটি লেখকেব অন্তবেব গভীবতম দুঃখবোধেব বহস্যগুহা হতে অশ্রুনদীব মত প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

Henri Fauconnier—Malaısie (Stock), André Malraux—La Voıe Royal (Grasset), Maurice Bedel—Phılıppine (N R F), André Mauroıs—Le Peseur d'Ame (N R F) Roger Martın du Gard—Confidence Africaıne (Sans Pareıl), Marc Chadourne—Cecıle de la Folie (Plon), Georges Lımbour—L' Illustre Cheval Blanc (N R F), André Gıde—Oedıpe (La Pléiade).

এবাবকাব গঁকুব-পুরস্কাব দেওযা হযেছে, "মালেসি"-বচযিতা আঁবি ফোকো-নিয়েকে। উপন্যাসখানা যখন "নুভেল বেভু ফ্রাঁসেস"-পত্রে ধাবাবাহিক ভাবে পড়েছিলুম, তখন খুবই ভালো লেগেছিলো বটে, কিন্তু মনে হযনি সেখানাব অদৃষ্টে এই সম্মান আছে। যুদ্ধেব পব থেকে গঁকুব-পবিষদ এতই সাম্প্রতবিদ হ'য়ে উঠেছে যে, এই আড়ম্বরশূন্য, স্বল্পাঙ্গ, সংযত উপাখ্যানটি সে-সুধীসঙ্ঘেব চিত্তাকর্ষণ কবেছে শুনে প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিলুম। ভয হয়েছিলো লেখাটা বুঝি ঠিক ক'বে মনে নেই ; আলস্য ক'বে পড়েছিলুম ব'লেই হয়তো এই সদ্যোত্থিত প্রতিভাব চাকচিক্য চোখে পড়েনি। তাই বইখানাকে আবাব নেড়ে চেড়ে দেখলুম ; কিন্তু এই নবীন লেখনীব মুখে অভ্যস্ত বিষটুকু কোনো মতেই খুঁজে পেলুম না ; সূর্য্যেব কলঙ্ক আবিষ্কবণে এই তরুণ লেখকেব চমৎকাব নৈপুণ্য এক মুহূর্ত্তেব জন্যেও কোথাও থেকে আভাস দিলে না ; এমন-কি হাল ফেশানেব বিশ্বব্যাপী বিরতিব সাড়া পাওয়া সুদ্ধ শক্ত হলো। শুধু তাঁব ছলাকলাহীন সরলতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিব অনুকম্পা, বর্ণনাব বিনম্র অনুচ্চতা অবাক্ ক'বে দিলে। এব থেকে যদি কেউ ভাবেন যে, পুস্তকখানাব পটভূমিকা সাবেকি আমলেব স্থৈর্য্যে ধৈর্য্যে ভরা, তাহলে তিনি হতাশ হবেন। ফোকোনিযেব মন অত্যন্ত নতুন, এতই নতুন যে, দশ বৎসব আগে পশ্চিমে তাব নামগন্ধ ছিলো না। ইনি যে-যুগেব লোক, সে-যুগে উত্তব-সামবিক ধ্বংসোন্মাদনাব স্থান নেই ; সে-যুগ প্রলয়ে পবাঙ্মুখ না-হলেও, বিনাশেব চেয়ে সৃষ্টিকেই শ্রেয় ভাবে। কিন্তু সে জানে এই সৃজনব্যাপাবে পাবিপার্শ্বিক জগৎ তার সহায় হবে না। তাব সমাজ, তাব পবিবাব, তাব উত্তবাধিকাব য়ুবোপীয় যুদ্ধেব ঘূর্ণি হাওয়ায গুঁড়ো হ'য়ে উড়ে গেছে ; চাব দিকে যে-ধ্বংসেব ধূলি প'ড়ে আছে, তাব উপবে কোনো বকমেব ধ্রুবতার ভিত্তিস্থাপনা কবতে যাওয়া বাতুলতা। তাই তাব মন বেবিয়েছে ভদ্রাসন-নির্ম্মাণেব জমি খুঁজতে। কিন্তু এমেবিকা, দক্ষিণসাগবেব দ্বীপাবলী, চীন, শ্যামবাজ্য মালয-উপদ্বীপ, আবব, আফ্রিকা, রুশদেশ, কোনোটাই তার মনঃপূত হচ্ছে না। অবশেষে হযতো তাকে স্বদেশের সর্ব্বনাশেব মধ্যেই ফিরে যেতে হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই নিরুদ্দিষ্ট চক্রচবণ

একেবারে ব্যর্থ না-ও হতে পারে, অজানার অভিসারই হয়তো জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

একটা আখ্যায়িকার এই রকমের ব্যাখ্যাতে, জানি, অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু "মালেসি" উপন্যাস শুধু বাহ্যরূপে। মালয়ের আদিম বনের সাংঘাতিক সংঘাতে একজন শীঘ্রচেতন পাশ্চাত্য যাযাবরের মর্ম্মে মর্ম্মে যে-আশানিরাশার সুর বেজেছিলো, আসলে এটা হচ্ছে তারি প্রত্যক্ষ বিবরণ। কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন না-ধ'রে নেন যে, "মালেসি" বিংশ-শতাব্দীর প্রথম বর্গের সমস্যামূলক গল্প-নাটকের বংশধর। একটা বিশেষ মনোভাব প্রকাশ করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও, যে-পাত্রপাত্রীর মারফতে এই মনোভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তারা, যদিও সংখ্যায় অতি অল্প, তবু জীবন্ত, অতিশয় জীবন্ত। তবে এদের জীবনের ওজন বাস্তব জীবনের মতোই হালকা, ঘটনাবলী নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীর মতোই অবিচিত্র। সারা বইখানায় একটিমাত্র অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হলো নায়ক বোলেঁর দেশীয় চাকর স্মাইলের ভূতে পাওয়ার কাহিনীটা,—এ-ঘটনাও ভারতীয় পাঠকের কাছে অত্যাশ্চর্য্য ঠেকবেনা। তবে জায়গাটা বিশেষ ক'রে দ্রষ্টব্য। অলৌকিকের বর্ণনা করা সহজ নয়; একটা অনুপযোগী শব্দের আওয়াজে, একটা অতিরঞ্জিত লাইনের ফলে একশ' পাতার অক্লান্ত চেষ্টা লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাওয়া সাহিত্যে খুব বিরল নয়। কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষায় ফোকোনিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সম্ভবত তাঁর অকৃত্রিম লেখনীর গুণে। তাঁর অসাধারণ তুলীর টানে ব্যক্ত অব্যক্ত দুইই সমান পরিস্ফুট, গাছপালা-জন্তুজানোয়ারের পরম সত্তাটুকু নরনারীর পরমাত্মার চেয়ে কম স্পষ্ট নয়, বর্ব্বরতার ছবি সভ্যতার চিত্রের মতই সংযত ও সুবোধ্য। অল্প কথায় এই কাহিনীর ধারা বিরাট নদীর মতো মন্দ, মন্থর, কৌটিল্যহীন; তাতে নির্ঝরের আত্মজ্ঞ দীপ্তি বা কলকোলাহল নেই, আছে শুধু গভীরতা, অবাধ নিরপেক্ষ গভীরতা।

উপন্যাসটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রণয়-সম্বন্ধে চর্ব্বিত চর্ব্বণ নেই। পাত্রী দুটিরই ভূমিকা গৌণ, তারা কথা কয় যেন ভাববাচ্যে। প্রথমটিকে আনা হয়েছে কেবল দেশটার স্বকীয় রঙ ভালো ক'রে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়টির প্রয়োজনীয়তা হয়তো আর একটু বেশি, কিন্তু পুস্তকখানার শোকাবহ পরিণামের জন্যে অলক্ষ্য বনদেবতার দায়িত্ব তার চেয়ে অধিক কিনা, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া শক্ত। বইখানার সম্বন্ধে বস্তুত যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে সে হচ্ছে পদে পদে এই অলৌকিকের অবতারণা। কিন্তু মধ্যবৃত্তের দুর্দ্দান্ত অরণ্যে প্রবেশ করার সুযোগ যাঁর ঘটেছে, তিনিই মানবেন যে, লেখকের উপরে আধিভৌতিকের আধিপত্য অতিরিক্ত হলেও; অমার্জ্জনীয় নয়।

"মালেসি"-র নায়ক বোলেঁ মালয়-উপদ্বীপে বানপ্রস্থে গিয়েছিলো আধুনিক কুরুক্ষেত্রের শোকে; সভ্যতার লঙ্কাকাণ্ড তার বুকে নিষ্ঠুরভাবে বেজেছিলো ব'লেই, সে যবনিকা-পতনের আগে রঙ্গালয় ছেড়ে পালিয়েছিলো। কিন্তু "লা ভোওয়া রোইয়াল"-এর নায়ক পেরকাঁ অন্য ধাতুতে গঠিত। শ্যামরাজ্যের গহন বনে সে প্রবেশ করেছিলো গর্ব্বিতা সভ্যতাকে মারবার অস্ত্রসংগ্রহকল্পে। মালয়ে এসে বোলেঁ তপোবনের শান্তি খুঁজে পেলে, এবং অবশেষে যখন তার দারুণ দুর্দ্দিন এলো, তখন হয়তো সেই বনই তাকে মায়ের মতো নির্ব্বিঘ্ন অঙ্কে তুলে নিলে। কিন্তু পেরকাঁর

ধর্ষণে বন আহত পশুব মতো সংহাব মূর্ত্তি ধ'বে, সিদ্ধিব সমীপ লগ্নে তাকে গ্রাস ক'বে ফেল্‌লে। ফোকোনিয়ে আব মালবোব চিত্তবৃত্তিব মধ্যে আকাশ-পাতালেব তফাৎ; তবু সকল চবমপন্থীব মতো এঁদেব দুজনেব একটা ঐক্যও দেখা যায়। ফোকোনিযেব সাধনা হচ্ছে বর্ব্ববতাব সাহায্যে নির্বীর্য্য সভ্যতাব শক্তিবৃদ্ধি কবা; মালরোব চেষ্টা বর্ব্ববতাব পৃষ্ঠপোষণে মুমূর্ষু সভ্যতাকে জগৎ থেকে অব্যাহতি দেওযা। উভয়েবই যাত্রাস্থল এক,—জীবনকে স্বাস্থ্যবান ও সবল ক'বে তোলা, এবং দুজনেই স্থির কবেছেন যে সভ্যতাব বর্ত্তমান অবস্থা অসহ্য; বর্ব্ববতাই যে এ-বোগেব একমাত্র প্রতিকাব এ-সম্বন্ধেও দুজনেব মতদ্বৈধ নেই। তবে এক পক্ষ বলেন, কানা মামাব চেযে মামা না-থাকাই ভালো; অন্য পক্ষেব বিশ্বাস, মাতুলেব অন্ধতা স্বপ্নলব্ধ ঔষধেব কল্যাণে সাবলেও বা সাবতে পাবে। এ-দুদলেব ঝগডায় মধ্যস্থ হওয়া শক্ত, কাবণ কাবোরি যুক্তিব অভাব নেই। তবে আমাব নিজেব পক্ষপাত মালবোব দিকে। আজকে আমবা যেখানে পৌঁছেছি সেখানে জন্মই সহজ, মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন। কাজেই, বর্ষণেব পবে ব্যাঙেব ছাতাব মতো, সৃষ্টিব বীভৎস উর্ব্ববতা যখন নিবঙ্কুব মাটিকেও বাদ দিতে বাজি নয, তখন স্বাতন্ত্র্যবিলাসী মাত্রেই ধ্বংশেব কথা ভাবতে বাধ্য। বাঁচতে হলে এই অনাহূতদেবও স্থান চাই, ফাঁকা চাই, নিঃশ্বাস নেবাব অবকাশ চাই। আধুনিক জগতেব সঙ্কীর্ণতা ক্রমশ অসহ্য হ'যে আসছে।

কিন্তু কথাসাহিত্যেব দার্শনিক টীকা টিপ্পনী সব দিক দিযেই অসঙ্গত। উপবন্তু মালবো নিজেকে নিছক ঔপন্যাসিক ব'লে সম্প্রতি ঘোষণা কবেছেন। এই হিসেবে তাঁব বইখানা ফোকোনিয়েব বইটাব মতো তৃপ্তিদায়ক নয়। "লা ভোওযা বোইযাল"-এর আখ্যানবস্তু "মালেসি"-ব তুলনায় অনেক বেশী ঔৎসুক্যপূর্ণ; কিন্তু ঘটনাবৈচিত্র্যই এব দোষ দাঁডিযেছে। গল্পেব ধাবা যেন অনবচ্ছিন্ন নয। গাঁথুনিতে যে-ফাঁক ব'যে গেছে, পাঠকেব কল্পনা তাব ভিতব দিযে মাঝে মাঝে উধাও হ'য়ে যায। কথাপ্রসঙ্গে পেবকাঁব জীবনেব অনেকখানি অবান্তব অংশ ফুটে উঠেছে, কিন্তু তবু আমাদেব কৌতূহল মিটতে চায় না; মন শুধায়, তাব অব্যক্ত বিদ্রোহেব কাবণ কি? হঠাৎ গাববোকে টেনে আনাব সার্থকতাই বা কোথায? এব পাশে বোর্নেকে বসালেই আমাব কথাটা স্পষ্ট হবে। বোর্নেব অতীত ইতিবৃত্ত আমরা জানি না বল্‌লেও চলে, তবু তাব সম্বন্ধে আমাদেব কোনো জিজ্ঞাসাই অতৃপ্ত থাকে না। কিন্তু পেবকাঁব নাডি-নক্ষত্র জানাব পবে বহস্য যেন জটিলতব হ'য়ে ওঠে। তবে এমন হতে পাবে যে গ্রন্থকাব ঠিক এই পিপাসাটুকুই পাঠকেব মনে জাগিযে বাখতে চেযেছেন। "লা ভোওয়া, বোইয়াল" একটা বহুখণ্ডব্যাপী আখ্যাযিকাব প্রথম ভাগ; অন্য সর্গগুলি এখনো অপ্রকাশিত, সম্ভবত অলিখিত। কাজেই এখানাব যথার্থ বিচাব কবাব সময এখনো না-এসে থাকতে পাবে। এখানে যে-সূত্রগুলোয় গ্রন্থী পডলো না, হয়তো অন্যত্র সেগুলো বিনুনি পাকিয়ে উঠবে। তবে পেবকাঁ-চবিত্র বোধহয় হেঁয়ালী হ'য়েই থেকে গেলো, কাবণ "লা ভোওয়া বইয়ালে"-এব সমাপ্তি পেবকাঁব মৃত্যুতে।

মুস্কিল এই যে মালবো নাম-করা লেখক; "লে কঁকেবাঁ" বেরুনোব পরে তাঁব কাছ থেকে আমবা এত প্রত্যাশা করি যে, পান থেকে চুন খসলেই মনে হয় ঠক্‌ছি। আসলে তাঁর অসামান্য শক্তির হ্রাস হযনি; ক্লোদেব পিতামহেব চিত্র "লে

কঁকেবাঁ”-র কোনো চবিত্রেব কাছেই হ’র মানেনি, এবং ক্লেদেব মা যে-অল্প কটি কথায় বর্ণিত হয়েছে, তার জোড়া খুঁজে বাব কবা দুষ্কব। পেঁবকাঁও বহস্যময় মাত্র, কিন্তু কলের পুতুল নয়; অখ্যাত জনপদে চিকিৎসাবিহনে মৃত্যুমুখ পেবকাব বমনী-সম্ভোগেব ছবিতে যে-প্রচণ্ড প্রাণশক্তিব পবিচয় পাই, তাব কণামাত্র থাকলে অনেক উপন্যাসই দাঁড়িয়ে যেতো। এই স্থানটা পডবার পবে, পেবকাঁব মহত্ত্ব-সম্বন্ধে আব কোনো সন্দেহ থাকে না; মনে হয় আমবা বুঝি কোনো অসুবেব অনন্ত প্রয়াণের সাক্ষী। এই দৃশ্যটা ছাড়া “লা ভোওয়া বোইয়াল”-এব অন্য কোথাও নাবীব সংস্পর্শ নেই, যদিও তাদেব নাম এখানে ওখানে. নানা জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। “মালেসি”ব সঙ্গে “লা ভোওয়া বোইয়াল”-এব এইখানে আব একটি সাদৃশ্য; আবো একটি হচ্ছে পাত্র-পাত্রীব স্বল্পতায়; এই গুণে মালবো ফোকোনিয়েব উপবেও টেক্কা দিয়েছেন; এক বকম বলতে গেলে পেবকাঁ আব ক্লোদ এই দুটি মাত্র চবিত্র নিয়েই সমস্ত বইখানা বিবচিত।

উপবে বলেছি যে মালবো সম্প্রতি নিজেকে নিখাদ ঔপন্যাসিক ব’লে জাহিব কবেছেন। এই আত্মপবিচয় বেবিয়েছে এপ্রিল মাসেব “নুভেল বেভু ফ্রঁসেস”-পত্রে, ট্রট্‌স্কির লেখা “লে কঁকেবাঁ”-ব সমালোচনাব জবাবে। উক্ত সমালোচনায় ওই বইখানিব গুণকীর্ত্তন কবাব পবে ট্রট্‌স্কি দেখিয়েছেন, ইতিহাস-হিসেবে “লে কঁকেবাঁ” কেন অশ্রদ্ধেয়। প্রবন্ধটা অবশ্য-পাঠ্য; তাতে ট্রট্‌স্কিব বিখ্যাত ঝগড়াটে স্বভাব, বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত কবার অভ্যাস, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা দোষ থাকা সত্ত্বেও, মোটেব উপবে লেখাটা খুবই সাবগর্ভ। তাঁব মূল কথাটাব সমর্থন না-কবে থাকা দুঃসাধ্য। তিনি বলেছেন, বিপ্লব নিয়ে খেলা চলেনা; যে-বিদ্রোহ সময়গতিকে আপনাব আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা কবেনা, তাব অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মালবো এব বেশ চোখা চোখা জবাব দিয়েছেন, কিন্তু আমাব মনে হয় পাঠকেব দরদ ট্রট্‌স্কির দিকেই ঝুঁকবে। তবে একটা কথা ভুললে চলবেনা; স্থান-কাল-পাত্রেব ষড়যন্ত্রে স্বয়ং লেনিন সুদ্ধ সমষ্টিবাদেব মূলসূত্রকে অন্তত আংশিক ভাবে উপেক্ষা কবতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত অসাধাবণ বই দুখানার সঙ্গে “ফিলিপিন”-এব মতো মামুলি উপ-ন্যাসেব নাম নিতে সঙ্কোচ লাগছে। তবুও উল্লেখ কবছি দুটো কাবণে। প্রথমত, এই তিনখানা ছাড়া আব কোনো আধুনিক ফবাসী উপন্যাস সম্প্রতি পড়িনি, দ্বিতীয়ত “ফিলিপিন”-এব জ্যেষ্ঠ “জেবোম, উ সোওয়াসাঁৎ দেগ্রে লাতিতুদ নব” বছব চাবেক আগে “মালেসি”-ব মতোই সম্মানিত হয়েছিলো। মনে আছে সেবাবকাব গকুঁব-পাবিতোষিকেব উপযাচকদলে যোগ্য ব্যক্তিব অভাব ঘটেনি। কিন্তু “লেসম্ দ লা কৎ”-এব বচয়িতা অঁদ্রে শাঁসঁ, “ভাস্কো”-লেখক মাব্ক্ শাদুব্ণ, “মেবলঁ্য”-প্রণেতা জঁ। প্রেভো ইতাদিকে ডিঙিয়ে মোবিস্ বেদেল্ যখন “জেবোম”-এব জোবে পুবস্কৃত হলেন, তখন দু-এক জন সমালোচক অল্পবিস্তর বিস্ময় প্রকাশ কবলেও, হাততালিতে কম পড়েনি। সে-বছরেব অন্যান্য উপন্যাসেব সমকক্ষ না-হলেও “জেবোম’ বইখানা সুখপাঠ্য, অত্যন্ত আধুনিক এবং শ্লেষোক্তিব সন্নিপাতে সজারুব মতো কণ্টকিত। সে-গল্পেব নায়কও উদ্বাস্তু, তাবও সন্ধান বাসাবাঁধাব উপযুক্ত শাখা। সেই অন্বেষণেব তাড়নায় বেদেল্ সেবাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার অর্দ্ধসভ্য তরুণীদের উপভোগ্য স্বেচ্ছাচারেব দাপটে বেচারা জেবোম স্বদেশেব সুকোমল অঙ্কে আশ্রয় নিতে ইতস্তত কবেনি। জেবোমেব অনুজা ফিলিপিনেবও সেই দশা,

তবে এবারে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে, ফিলিপিনের পটভূমিকা মুসোলিনির পদানত রোম। কিন্তু আর সমস্তই যথাপূর্ব্বম্ ঃ নির্ব্বুদ্ধিতায় লাটিনেরাও নর্ডিক্‌দের সমতুল্য; ইতালীর বুড়োরা মেরুপ্রান্তের বুড়িদের মতোই বাক্‌সর্ব্বস্ব; এখানকার প্রেমার্ত্ত যুবকেরা, সেখানকার প্রেমার্ত্ত যুবতীদের চেয়ে কম কামপরায়ণ নয়। অল্প কথায় ফরাসীরা সভ্যতায় অদ্বিতীয়, সাধুতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, হৃদয়ব্যাপারে, একদিকে বর্ব্বর পাশবিকতা এবং অন্যদিকে প্রস্তরিত পবিত্রতা, এই উভয়-সঙ্কটের মাঝখান দিয়ে অক্লিষ্ট নৌচালনায় যূলিসিকেও হার মানিয়ে দেয়। বইখানার প্রত্যেক শব্দটি আত্মপ্রসাদের চর্ব্বিতে মসৃণ, প্রত্যেক পঙক্তিটি বুদ্ধিবিদ্যায় চকচকে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদটি শ্লীলতা-শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা। এখানাকে দশ বছর আগে পড়লে হয়তো উপাদেয় লাগতো, আজ কেবল হাই ওঠে। প্রথমটা মনে হয়েছিলো এর ঠাট্টা মস্করা স্বর্গীয় জেরোম, কে, জেরোমের রসিক মস্তিষ্কে আসন পাবার যোগ্য, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে অতটা বলা অন্যায় হবে, ফিলিপিন আপনার অগ্রজ জেরোমের কালহাস্যের প্রতিধ্বনি মাত্র, তাই সে নিষ্প্রাণ। হতে পারে একটু বাড়াবাড়ি করছি, সমালোচকদের প্রশংসা দেখেই বইখানা পড়তে বসেছিলুম, কিন্তু রেদেলের শেষ-উপন্যাস "মলিনফ্, এঁদ্‌র্ এ লোওয়ার"-এর প্রাণময় নবীনতায় গত বৎসর আমার রোগশয্যার বিরক্তি এমনই লাঘব হয়েছিলো যে, আজকে ফিলিপিনের রোমন্থনে বঞ্চনাবোধ জেগে ওঠা অনিবার্য্য।

মার্ক্ শাডুর্ণ্-এর "সিসিল্ দ লা ফোলি" বইখানা পড়ার অবকাশ এখনো ক'রে উঠতে পারিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না। উপন্যাসটির প্রশংসা সর্ব্বত্রই দেখতে পাই, উপরন্তু যে হাত দিয়ে "ভাস্‌কো" বেরিয়েছে, সে হাতের লেখা নগণ্য হওয়া অসম্ভব।

আঁদ্রে মেরোওয়ার "ল পেসর দাম" পুস্তকখানি আকারে উপন্যাসের সমান হলেও, তাকে কথাসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করাই বোধ হয় সঙ্গত। সে যাই হোক, এখানা পড়ার পরে মোরোওয়ার শতমুখী প্রতিভাকে অভিবাদন না-ক'রে থাকা যায় না। এই মেরোওয়া আর "এরিএল" ও "ডিসরেলি"-র স্রষ্টা যে একই লোক, তা বিশ্বাস করা কঠিন। এমন কি ভাষা এবং রচনারীতি সুদ্দু আলাদা। গল্পটি পো-হুউসম্যাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে রোমহর্ষণে মোরোওয়ার কলম ওই দুটি লেখনীর অনেক নীচে। তা হলেও কাহিনীটা অপ্রত্যাশিত এবং উপসংহারটি চমকপ্রদ। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও এর থেকে পরিচয় পাওয়া যায় শুধু মোরোওয়া-সাহেবের লিপিচাতুর্য্যের, তাঁর মনপ্রাণের ঠিকানা মিলে না।

এর পাশে রোজে মারতঁ দু গার-এর "কঁফিদ্যাঁস্ আফ্রিকেন্" গল্পটা বসালেই সাহিত্যে অকৃত্রিমতা কাকে বলে তার যথার্থ খবর পাওয়া যাবে। তবে রুচিবাগীশদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি, এই অগম্যগামী প্রেমকাহিনীটি নীতিপরায়ণ নয়। এমন জীবন্ত লেখা খুব কমই পড়েছি; পড়ছি ব'লেই মনে হয় না, বোধ হয় ছবি দেখ্‌ছি। রচনা পাকা হাতের, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক বাক্য ওজন ক'রে বসানো, তার একটির নড়চড় হলে গল্পটির স্বরূপ বদলে যাবে ব'লে ভয় হয়। অথচ কোথাও অতিরঞ্জনের লেশ মাত্র নেই, এই অসামান্য ছবির একটি রেখাও অবাস্তব নয়।

কাব্যজগতে জর্জ্ ল'্যবুরের "লিল্যুস্‌ত্র শভাল্ ব্ল্যাঁ" উল্লেখযোগ্য। এই বইখানাকে কাব্য বলছি, সমালোচকদের খাতিরে। তাঁরা যদি চোখে আঙুল দিয়ে

কাহিনী-তিনটের প্রচ্ছন্ন কাব্যাগ্নিটুকু দেখিয়ে না-দিতেন, তাহলে বইখানাকে কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতুম। এখনো, তাঁদের অনুদেশ সত্ত্বেও, নিঃসন্দেহ হতে পারিনি; তবে এটা মানছি, রচনাগুলি গদ্যপদ্যের সীমাসন্ধিতে অবস্থিত,—কোনোটার ঝোঁক গদ্যের দিকে বেশি, কোনোটার বা পদ্যের দিকে। এটাও স্বীকার্য্য যে, এগুলো যদি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হতো, তাহলে আলঙ্কারিক বইখানাকে কাব্য আখ্যাই দিতেন। কিন্তু তখন কাব্য বললে বোঝাতো, রসাত্মক লেখা মাত্র, সে-নামের সঙ্গে রচনা-পদ্ধতির বিশেষ কোনো সংস্রব ছিলোনা। আজ আমরা যে-ক্ষুধার তাড়নায় কাব্যের দ্বারস্থ হই, সেটা কেবল পেটের ক্ষুধা নয়, চোখেরও। অর্থাৎ আজকে আমরা শুধু রসেই তৃপ্ত থাকতে পারিনা, রূপকেও চেয়ে বসি। এর থেকে কেউ যেন না-ভাবেন যে আমার মতে গদ্য রূপহীন। তা মোটেই নয়, তবে আমার মনে হয় কাব্যের রূপ আর গদ্যের রূপ ভিন্ন প্রকৃতির, এবং এই বিভিন্নতা সংরক্ষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করা উচিত, আমাদের সাহিত্য স্বল্পাঙ্গ ব'লেই হয়তো আমি এই বহুলাঙ্গতার পক্ষপাতী; যেদেশে বাহুল্য আজ জটিলতায় গিয়ে ঠেকেছে, সেখানে কাব্যের মৌল সত্তার পুনরন্বেষণই স্বাভাবিক। দিন কতক আগে ফরাসী বিদগ্ধেরা আরে ব্রেমঁর প্রতিধ্বনি করে বলতে সুরু করেছিলেন, কবিতার মানে না থাকলেও চলে, কিন্তু তার অন্ধিসন্ধিতে ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান, মনোবিকলন, মন্ত্রসিদ্ধি, ধর্ম্মপ্রাণতা ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্লভ বিশেষজ্ঞানের চমক থাকা চাই। লঁ্যবুরের আকস্মিক প্রতিপত্তি হয়তো সেই হঠোক্তির পাল্টা জবাব।

"লিল্যুসত্র শভাল্ ব্ল্যাঁ"-র সঙ্গে আমার ঝগড়া শুধু পরিভাষা নিয়ে। গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, এই নবীন লেখনীর মুখে প্রতিভার ইসারা আছে। লঁ্যবুরের জাদুতে পশুপক্ষী মানুষের চেয়ে বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে, জলস্থলের কানাকানি শ্রুতিগম্য হয়ে আসে, শূন্য যেন মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দেয়। এই কাহিনীগুলোর মুখ্য ভূমিকায় মানুষ নেই, নায়কের স্থান অধিকার ক'রে রেখেছে দুটি ঘোড়া আর একটি পাখী। কিন্তু এই জন্তুগুলির সৃষ্টিব্যাপারে অতিমর্ত্ত্যের হাত খুবই স্পষ্ট। প্রথম গল্পের প্রধান পাত্র একটি বুড়ো ঘোড়া; তাঁর সারা জীবনটা কেটেছিলো এক খনির অন্ধকারে, কিন্তু একটি সারকাসদলের কল্যাণে ছাড়া পেয়ে সে যখন নিশুতি লণ্ডনের পথ দিয়ে সগর্ব্বে পা ফেলে চলে, তখন মনে হয় স্বয়ং উচ্চৈঃশ্রবা বুঝি অশ্বরার আকুতি প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার পরের গল্পটির কেন্দ্রেও দেখি একটি ঘোড়াকে। এটির জীবন আরো রহস্যময়। অশ্ববর্জ্জিত ভেনিসের ঘাটে সে একদিন কোন অজানার পার থেকে এসেছিলো, এবং এই পঙ্কিল সহরের বীভৎস আলোড়ন যেদিনে দুঃসহ হয়ে উঠলো, সেদিন তার মানবী প্রেয়সীকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলো, কেউ তার ঠিকানা পেলেনা; কিন্তু সকলেই বুঝলে এই প্রাচীন নগরীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, তারি অনুসরণ করেছে। শেষের কথাটির নায়ক একটি অলৌকিক পাখী। কোনো ব্রাত্যের ঔরসে সে জন্মেছিলো এক জাদুকরীর গর্ভে। বহুদিন পরে তার জন্মদাতা যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে এক অনাম মরুর মাঝে ফাঁসিকাঠে ঝুলছে, তখন সে এসেতার পিতাকে রক্ষা করলে। তার পর সে মৃত্যু বরণ করলে এবং তারই চিতায়জীবনের অবশিষ্ট মহত্ত্বটুকু সহমরণে গেলো।

গল্প জিনিষটাকে সংক্ষেপ করা বিপজ্জনক, উপরোক্ত বর্ণনা প'ড়ে মনে হতে পারে বইখানা আষাঢ়ে গল্পে ভরা। কিন্তু আসলে লেখকের বাস্তবিকতা অবাক্ ক'রে দেয়। অদ্ভুত অতিকথনের মাঝে মাঝে এমন এক-একটা নিষ্ঠুর স্পষ্টোক্তি আছে যার সংঘাতে দম বন্ধ হয়ে আসে। ফরাসী মনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে এই জাতি বারে বারে জন্তুজগতের অন্তরতম লোকে প্রবেশ করতে পেরেছে। কিন্তু ল্যঁবুরের লেখা পড়ে লা ফঁতেনকে মনে পড়েনা, এমন কি দমেসঁকেও মনে পড়ে না, স্মরণে আসে ডি, এইচ, লরেন্সের নাম। এই উচিত ক্রোধের উদ্দীপনা এই অহেতুক বিপ্লবের উচ্চণ্ডতা কেবল "সেণ্ট মর"-এর মধ্যেই দেখেছি। আবার মরুভূমির বর্ণনায় মিলটনের ছায়া আছে, এই বিরাট্ শূন্যের পরিকল্পনা, এই দুর্বোধ্য বিদ্রোহের ব্যর্থতা, মনে হয় শুধু তাঁরি শিষ্যের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু নাটিকাগুলোর দৃশ্যপট এঁকেছে ওব্রে বিয়ার্‌ড্‌সলির প্রেতাত্মা, এই ধরণের অবক্ষরপ্রীতি এক তারি ছবিতে দেখা গেছে। ল্যঁবুরকে একবার অনুবাদকরূপে দেখেছিলুম, অনূদিত কবিতাগুলির মূল ইংরেজি ভাষায় রচিত। এ-প্রমাণ যদি না-ও থাকতো, তবুও বুঝতুম ইংরেজী পরিশীলনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

নাটকের মধ্যে জীদের "ঈদিপ্" অবশ্য-পাঠ্য। কয়েক বছর থেকে অতীতকে বর্ত্তমানে টেনে আনার যে-হাওয়া উঠেছে, এই নাটকখানি হয়তো তারি পরিসমাপ্তি। কিন্তু অভ্যস্ত হ্যামলেটকে গল্‌ফ্ ক্লাব হাতে নিয়ে আসরে নামতে দেখে আমাদের যে-কৌতূহল মেটে, এই নাটকখানি পড়ে চরিতার্থ হয় ঠিক তার বিপরীত মনোভাবটি। প্রথম চেষ্টাটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দূরকে নিকটে আনার চেষ্টা, তার মূল কথা ব্যবধান-বিনাশ, কিন্তু জীদের পুস্তকখানি দূরবীনের উল্টো দিক্ দিয়ে প্রতিবেশকে দেখার মতো, আত্মীয়কে পর ক'রে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য, তার প্রয়াস ব্যবধান-সৃষ্টি। হ্যামলেট যেই কথা কইতে সুরু করে অমনি ভুলে যাই, তার পরনে কোন্ যুগের ছদ্মবেশ, কিন্তু এই নাটকখানির প্রথমাঙ্কের প্রথম কথা থেকে যবনিকা পতন পর্য্যন্ত আমরা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারিনা যে, বিগ্রহের প্রাবরণ যে-যুগেরই হোক, তার প্রাণ একেবারে সদ্যস্তন। প্রশ্ন উঠতে পারে জীদের ঈডীপাস আর সফোক্লিসের ঈডিপাস যদি অভেদাত্মাই নয়, তবে নামকরণের সার্থকতা কোথায়? আমার বিশ্বাস এর মূলে আছে তাঁর স্পর্দ্ধা, সফোক্লিসের প্রেতাত্মাকে ডাক দিয়ে, তিনি হয়তো এই কথাই বলতে চেয়েছেন,—মিলিয়ে দেখো, তোমার মতো মহানাটক লেখা আমার ক্ষমতায় কুলোয় কিনা। তবে জীদের মতো মনস্বী আর্টিষ্টের পক্ষে কেবল দম্ভের খাতিরে কোনো কিছু করা অসম্ভব। হয়তো বাঞ্ছিত অবচ্ছিন্নতার সন্ধানই তাঁকে এই প্রাক্‌পৌরাণিক জগতে টেনে এনেছে, হয়তো বর্ত্তমানের বিরাট্ ব্যাকুলতার ছবি-খানাকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রতীপগমন অনিবার্য্য। তবে এই ধরণের পিছু-হটার প্রবৃত্তি প্রায়ই জন্মায় ভয়ের থেকে। সৌভাগ্যক্রমে জীদের অসীম সাহসের নতুন প্রমাণ অনাবশ্যক, তাই বলতে হয়, এই অপসরণের মূলে আতঙ্ক নেই, আছে হয়তো অক্ষমতা। আমাদের খেয়ালী জগতে ঈডিপাসের ধ্রুপদী সমস্যার উত্তর খুঁজে পেতে হলে যে-পরম প্রজ্ঞার দরকার, তা হয়তো জীদেরও নেই। এ-যুগের ট্র্যাজিডি দেবতার কোপে ঘটেনা, ঘটে শুধু জ্ঞানের অভাবে; এমন-কি এখনকার শোকাবহ পরিণতির মধ্যে ট্র্যাজিডির মহত্ত্বটুকুও নেই, আছে কেবল দরদের উপলক্ষ

অশুচি সম্পর্কসঙ্কব অসহ্য ব'লে আমাদের ঈডিপাস কষ্টদৈবেব উদ্দেশে চক্ষুবলি দেয়না, সে চোখ উপড়ে ফেলে আত্মধিক্কাবেব তাড়নে, সে চোখ উপড়ে ফেলে, ভূত-ভবিষ্যতেব অনন্ত অন্ধকাবে তাব অহংকৃত দৃষ্টি নিতান্ত নিষ্ফল, তাই। গ্রীক্ ঈডিপাস আব ফবাসী ঈডিপাসেব মধ্যে তফাৎ এইখানে; একজনেব জীবন দৈবপ্রাবর্ত্তিম, অপবেব জীবন অবিদ্যাব অধীনে; একজন আত্মবিসর্জ্জন দিযে দেবতাব আশীর্ব্বাদ পায়, অপবে সর্ব্বস্ব হাবিযে শুধু বোঝে যে, তাব ঋদ্ধি, তাব সিদ্ধি, সে-সমস্তই বিধিবদ্ধ।

জানিনা, ঠিক এই কথাই জীদ বলতে চেয়েছেন কিনা। হযতো বইখানা লেখাব সময হিতোপদেশের নামমাত্র তাঁব মনে ছিলোনা; যে-যুগেব অনুপ্রাণনায় তিনি লেখা সুরু কবেন, তাব মূল মন্ত্র ছিলো; art for arts' sake। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকুক আব নাই থাকুক, বইখানাব ফাঁকে ফাঁকে যে-দুর্ব্বহ আত্মজ্ঞানেব, যে-অসহ্য নৈবাশ্যেব, যে-দাকণ বেদনার ইসাবা দেখেছি, উপবোক্ত উচ্ছ্বাস সেই সংবক্ত আঘাতেব প্রথম প্রতিক্রিয়া। নাটকখানা-সম্বন্ধে আবো অনেক দোষগুণেব কথা বলবাব বইলো, কিন্তু বাচালতাব ভয়ে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানছি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

Sunflower and Elm—By Gertude Woodthorpe,
60 pages, Sidgewick and Jackson Ltd
Poems (1926—1930)—By Robert Graves
90 pages, William Heinemann Ltd
Vale and other Poems—By A E 56 pages,
Macmillan & Co , Ltd.

মিস্ গাবট্রুড্ উড্থর্প ইংবাজী কাব্য-সংসাবে নূতন আগন্তুক, এতই নূতন যে, তাঁহাকে পবিচিত কবাইবাব ভাব লইযাছেন ওযাল্টাব ডি লা মেয়াব। মিস্ উড্থর্প-এব The Child's World—নামক কবিতাটী পড়িলেই বোঝা যায, কেন ডি লা মেযাব পবিচযেব ভাব লইতে অস্বীকাব কবেন নাই। কাবণ, কবিতাটী শুধু সুন্দব নয়, ইহাতে এই দুই কবিব প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব সুস্পষ্ট। তাই বলিযা মিস্ উড্থর্প-এর কবিতাকে ডি লা মেয়াব-এব কবিতাব প্রতিচ্ছায়া বলিযা ধবিলে অত্যন্ত অবিচাব কবা হইবে। তিনি আগন্তুক হইলেও অতিথি নন্, তাঁহাব বিশিষ্ট কবি-প্রতিভাই তাঁহাকে কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত কবিযা বাখিবে। পবিচিতিতে স্বল্প দু'চাবিটি কথায় ডি লা মেযাব বলিযা দিযাছেন, কোন্ বিশেষ পাদপীঠ হইতে এই কবিতাগুলিকে দেখা উচিত। ইহাদেব মধ্যে চমকপ্রদ এমন কিছুই নাই—ভাষায়, ভাবে বা ছন্দে—যা' সহজেই লোকেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে পাবে। এদিক্ হইতে দেখিলে কবিতাগুলিকে 'শক্ত' কবিতা বলা যায; এমন একটি কবিতাও নাই যাহাব বস একবাব চোখ বুলাইয়া গেলেই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কবা যায। কবিত্ব জাহিব কবিবার, ভাবেব অভাবে কাবদানি দিয়া ফাঁক ভক্সিা দিবাব প্রয়াস কোথাও চোখে পড়ে না। বর্ত্তমান চিত্ত-বিক্ষোভের দিনে এই নীবব অনাড়ম্বব প্রশান্তিব মূল্য উপলব্ধি

করা কঠিন। কিন্তু যাঁহারা নিছক কাব্য রসে তৃপ্তি পান, তাঁহারা মনোযোগ দিয়া পড়িলে যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবেন, আশা করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

AUSPICES

This early evening birds fly far and low,
Out of the West round to the South they go

And all the West is a clear sea of gold,
Where the gold Sun declines

And still behold!
Wheeling athwart the Sky, one after one,
The birds emerge from regions of the Sun

As though on some great errand they were sped
Over the curve of earth, where shadows spread
To night Winged and celestial they go
Into the twilight, far and swift and low

NOVEMBER.

The yellow chestnut fans are rarer, rare
As dreams that stay
They fall, they float down through the quiet air,
Naught they say
The sleepy tree can scarce be well aware
They go away

Over a milky sky thin tracery
The chestnut weaves
The low, late sun illumines pensively
A world it leaves,
All tranquil, half in Heaven already, free,
Nothing grieves

For this calm voyage than stillness doth no less
Satisfy
Falling, falling down through peacefulness
To die
Whilst Earth the thoughtful autumn sun doth bless,
And sky

মিস্ উড্থর্প-এর পর রবার্ট গ্রেভ্স্ পড়িতে বসিলে মনে হয় যেন শান্ত স্রোতস্বিনী বাহিয়া আমরা অকূল সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে পরিচিত কোন কিছুই নাই, ভাব, ভাষা, ছন্দ সবই অপরিচয়ের বিস্ময় জাগাইয়া তোলে। রবার্ট গ্রেভ্স্ তরুণ কবি হইলেও সুপরিচিত। তাঁহার আত্মজীবনচরিত—Good-bye to All That, যাহার উত্তরে পিতা লিখিলেন A Return to All That এবং পুত্র পুনরায় লিখিলেন, Still It Goes On—এবং তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তিকা Lars Porsena, তাঁহাকে গদ্য লেখক হিসাবেও যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি কবিতা

অনেক কাব্য-চয়নিকায় স্থান পাইয়াছে, দু'-একটির বাংলা অনুবাদও হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে। এই কবিটির মন অত্যন্ত সজাগ—ছেলেমানুষি ছড়া হইতে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-নরক, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সব কিছুতেই ইনি আকৃষ্ট হন। সেইজন্যই ইঁহার লেখার মধ্যে গঠনের অভাব, অপরিচ্ছন্ন এলোমেলো ভাব দেখা যায়। তাঁহার আগেকার কবিতাগুলি পড়িয়া একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছিলেন—

"To read Robert Graves' poetry is to feel that one is assisting him to wrestle with Chaos Chaos may in the end be too strong for him, yet every poem he writes will be well worth reading, since he creates confidence that he has the potential power to organise, out of his very interesting Chaos, a Universe of corresponding interest"

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, গ্রেভ্‌স্ এই "Confidence" বজায় রাখিতে পারেন নাই—তিনি বিশ্বাস-ভঙ্গ করিয়াছেন। Chaos তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, তাঁহার নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার কোনরূপ অর্থ সংগ্রহ করা সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। কবির উচ্ছৃঙ্খলতা যে কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচের কবিতাটিতে পাওয়া যাইবে।

ANAGRAMMAGIC

Anagrammatising
TRANSUBSTANTIATION,
Shyly deputising
For old Copopulation
SIN SAT ON A TIN TAR TUB
And did with joy his elbows rub

Art introseduced him
To females dull and bad,
Flapper flappings, limb—slim,
From his blonde writing-pad,
The river-girlgling drained of blood—
Post-Card flower of kodak mud

By such anagrammatic
And mansturbantiation
They father then his tragic
Lustalgia on the nation,
And after that, after that,
ON A TIN SIN TUB ART SAT

বুঝিলাম ইহা খেলাচ্ছলে লিখিত—Transubstantiation কথাটাকে লইয়া ভাঙাচোরা খেলা—তবুও বিশ্বাস করা যায় না ইহা কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক কবি লিখিতে পারেন। অবশ্য এ-পুস্তকের সকল কবিতাই এ-শ্রেণীর নহে। ইচ্ছা করিলে তিনি যে ভাল লিখিতে পারেন, তাহার প্রমাণ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাঁহার অন্তরের 'প্রেম'-কে সম্বোধন করিয়া তিনি কয়েকটী সুন্দর লাইন লিখিয়াছেন—

Take your delight in momentariness,
Walk between dark and dark, a shining space
With the grave's narrowness, though not its peace

কিন্তু Dismissal কবিতাটির অমন সুন্দর আরম্ভের পর কেন যে অমন অদ্ভুত শেষ হইল, বোঝা যায় না। আবার কয়েকটী কবিতায় তিনি স্বকীয় বিশেষত্ব বর্জ্জন করিয়া টী, এস্, এলিয়ট্-এর অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। উদাহরণতঃ, Lift Boy-এর নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার "ভাই"-সম্বন্ধে কবিতাটি ভাবে-ভঙ্গীতে খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।

BROTHER

It is odd enough to be alive with others,
But odder yet to have sisters and brothers,
To make one with a characteristic litter—
The sisters doubtful and vexed, the brothers vexed and bitter
That this one wears, through praise and through abuse
His family nose for individual use

এ,ই-র পরিচয় আমাদের দেশে নতুন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সুধু কবি বলিয়া নহে, আয়র্লণ্ডের জাতীয়তা-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত বলিয়া, ও সমবায়-তন্ত্রের প্রধান পুরোধা বলিয়া তিনি বহুপূর্ব্বেই আমাদের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শোনা যায়, তিনি নাকি যোগসাধনাও করেন। তাঁহার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি তাঁহার Candle of Vision-নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাও প্রধানতঃ এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সাহিত্যিক প্রকাশ। সেইজন্য পাঠক-সাধারণের নিকট তাঁহার কবিতা আদৃত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি চিরদিনই গুণী পাঠকের প্রিয় কবি হইয়া থাকিবেন। একথা সত্য, তিনি যে-জগতে বাস করেন, তাহার সহিত আমাদের সজ্ঞান পরিচয় নাই বলিলেই হয়, কিন্তু তাঁহার মার্জ্জিত ভাষার এমন যাদুকরী শক্তি আছে যে, সেই জগতের ব্যঞ্জনা স্ফুট করিয়া তুলিতে পারে। তিনি বলিতেছেন—

"For if our dreams
Be not immortal, the soul is not The soul
Is but a congregation of high dreams

FORGOTTEN

The hills have vanished in dark air,
And night, without an eye, is blind,
I too am starless Time has blurred
The aeons of my life behind

Oh, what in those dark aeons lay?
What tumult, beauty and desire?
I know not, all are lost beyond
Sunsets of anguish and of fire

এই ছোট কবিতাটিতে আমাদের মনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন দুর্জ্জ্ঞেয় বেদনাটীকে কবি একান্ত সুপ্রচলিত ছন্দের বাঁধনে বাঁধিয়া কী অপূর্ব্বভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন।

দেহের আকর্ষণ, পৃথিবীর আকর্ষণ যে কী দুর্নিবার, তিনি তাহা ভাল করিয়াই জানেন। তাঁহার Earth-Bound কবিতার শেষ স্তবকটী এই,—

When body lay in stillness
  The soul could not recall
The airy solemn being
  It had before its fall
It was tangled in old folly,
  The earth had it in thrall

কিন্তু মুক্তিকামী ইহাতে ভরসা হারান নাই। তাই Fugitive কবিতায় তিনি মুক্তি-পথের সন্ধান দিতেছেন।

Did it seem shuttlecock,
That soul, now here, now there,
That seemed to have no goal
In intellectual air?

To be itself, to elude
The Dark, the Light, that hold
By bitter or sweet rule
Mankind from of old,

That was its dream It found
In its own deeps a star,
And steered by that new pole,
No crazy mariner.

It passed those famous ports
To which all sails were set,
Passed heaven's gay towers, passed hell's
Last stormy parapet

Some wisdom in it guessed
They were not foes, these twain,
By what was pride for one
The other still had gain

মুক্তির সন্ধান মেলে অন্তরের অনির্ব্বাণ আলোকের দীপ্তিতে, স্বর্গমর্ত্ত্য উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারায়, একের বাহু-বন্ধনে ধরা না দিয়া বহুর অভিমুখে হৃদয়ের আলিঙ্গন প্রসারিত করিয়া দিতে পারায়। তাই Sybil কবিতায় কবি বলিতেছেন—

A myriad loves
Her heart would confess,
That thought but one
To be wantonness

এই বহু-পরিচর্য্যার ফলে

So thronged was her spirit
It seemed a pack
That carried the moon
And stars on her back

When the spirit wakens
It will not have less
Than the whole of life
For its tenderness

And that was why
She could not stay,
From the gilded fireside
Running away

She laughed in herself
On her seat of stone,
" It would be wanton
To love but one "

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

পাঠকগোষ্ঠি

"পবিচযে" প্রকাশিত প্রবন্ধাদি-সম্বন্ধে পাঠকগোষ্ঠির মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই এই পরিচ্ছেদের সূচনা। সমালোচনা পত্রাকাবে ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধিত হওযাই বাঞ্ছনীয।

প্রথম সংখ্যায কোনো প্রবন্ধের আলোচনা অসম্ভব। অতএব নূতন পত্রিকা প্রকাশেব প্রবৃত্তিকে আক্রমণ করিযা বীরবল যে-পত্র লিখিযাছেন, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বীরবলের পত্র

(১)

আপনি যখন আমাকে আপনাব কাগজে কিছু লিখ্‌তে অনুবোধ কবেন, তখন আপনাব অনুবোধ বক্ষা কবৃতে মুখে অস্বীকাব না কবলেও, মনে মনে বাজী হইনি। এরূপ ইতস্ততঃ কববাব কাবণ কি জানেন্? লেখা ব্যাপাবটা আমাব নিত্যকর্ম্ম নয। আব পাঁচ বকম অসাহিত্যিক নিত্য কর্ম্মেব দাবী মিটিযে ফুবসৎ পেলেই তবে কলম ধবা, তাও আবাব যদি আকাশ-বাতাসেব উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী না হয়।

আমবা হিন্দুবা এই বলে সূর্য্যেব স্তব স্তুক কবি যে সূর্য্য জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেযং মহাদ্যুতি। ওব অনুস্বব বাদ দিয়ে কথাটা দাঁড়ায এই যে হে তপনদেব, তুমি কাশ্যপগোত্রেব লাল টুকটুকে জবাফুল—আব তোমাব জলুস পেল্লায, অতএব তোমাকে নমস্কাব কবি, অবশ্য চোখ বুঁজে। কিন্তু এসব কথা শুধু আমাদেব মুখস্থ কথা। সত্য কথা এই যে, এই মহাদ্যুতিব তেজ সম্ববণ কবা আমাদেব মত ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীদেব পক্ষে অসাধ্য সাধন। জ্যৈষ্ঠ মাসেব বোদকে আমবা বলি আম-পাকানো বোদ আব ভাদ্র মাসেব বোদ নাকি তাল-পাকানো বোদ। আব এই কলকেতা সহবে গত একমাস ধবে গ্রীষ্ম যে বকম প্রকুপিত হযে উঠেছিল, তাতে আম ও তাল দুই এক সঙ্গে পেকে যেত, অবশ্য এ বৎসব গাছে যদি আম থাকৃত, আব তাড়ীহন্তাদেব তাড়ায তাল যদি তাড়াতাড়ি ফলত। বলা বাহুল্য সূর্য্য যখন এ হেন অগ্নিশর্ম্মা হযে ওঠেন তখন সমযটা ঠিক বাংলা লেখাব পক্ষে অনুকূল নয়—সংস্কৃত অথবা আববীব পক্ষে হতে পাবে। তা ছাড়া দেশব্যাপী money famine ত আছেই, তবে সে বিষয়ে বৃথা বাক্যব্যয় কবব না, কাবণ, আব কেউ তা কবছেন না। এমন কি অর্থশাস্ত্রীবাও নীবব। বোধহয এ ক্ষেত্রে famine relief-এর একমাত্র উপায় হচ্ছে মৌনব্রত অবলম্বন কবা। ধর্ম্মেব অবিবোধে আমাদেব পূর্ব্বপুরুষেবা যেমন অর্থ ও কামেব সেবা কবতেন, আমাদেব বোধ হয় তেমনি অর্থেব বিবোধে সাহিত্য-সেবা কবতে হবে। Genius ব্যতীত অপবেব পক্ষে ব্যাপাবটা একটু কষ্টকব। আব আমাকে genius বলে কেউ কখনো ভুল কবে নি। এমন কি আমাব স্ত্রীও কবেন নি।

(২)

সূর্য্যেব এই অগ্ন্যুৎপাতেব কথাটা উল্লেখ কবলুম এই কাবণে যে, এ জাতীয ভৌতিক উৎপাতেব ধাক্কায় দেহ ও মন এমন কাতব হযে পড়ে যে আমার মত অ-বীর লেখকেব পক্ষে সে অবস্থায কলম চালানো অসম্ভব, কাবণ কলমকে চালায় মন, হাত নয়।

আপনার কাগজের জন্য লেখবার প্রস্তাবে নিম-রাজী হবার আরও একটি কারণ ছিল। আমি দুটি একটি প্রকাশোন্মুখ কাগজের জন্য লিখ্‌তে প্রতিশ্রুত আছি। আর আমি কথা দিয়ে পারতপক্ষে সে কথাটা রাখ্‌তে চেষ্টা করি। তবে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে এ রকম কথা দিই কেন? উত্তর, না দিয়ে রক্ষা নেই, কারণ আমি পুরোনো লেখক। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নতুন কাগজ মানে হচ্ছে—সেই কাগজ যার লেখক সব পুরোনো। সুতরাং পুরোনো লেখকেরা যদি না লেখেন, তাহলে নতুন কাগজ আর চলে না। এর কারণ তরুণ পত্রের প্রধান লক্ষণই এই যে তার অন্তরে প্রেরণা নেই। তারুণ্য গুণটি কি, বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা ভরসা করে বলা যায় যে যার নিজের উপর ভরসা নেই, সে যুবক হ'তে পারে কিন্তু তরুণ নয়। অপর পক্ষে যার নিজের শক্তির উপর অগাধ অচলা ও অযথা ভক্তি আছে সেই হচ্ছে যথার্থ তরুণ। যতদিন কিছু না করা যায়, ততদিন সব করতে পারি, এ বিশ্বাস সহজেই হয়। নিজের শক্তির সীমা, আমরা কিছু করতে সুরু করলেই, টের পাই। অবশ্য টের পাওয়াটা যদি আমাদের ধাতে থাকে। লেখা-সম্বন্ধেও এ কথাটা খাটে। তবে অনেক কাল ধরে লিখ্‌লেই যে লেখক হওয়া যায়, তা অবশ্য নয়। এমন পুরোনো লেখকও আছেন যাঁরা লিখে লিখে পুরোনো হয়েছেন কিন্তু আজও লেখক হতে পারেন নি। অর্থাৎ যাঁদের লিখ্‌তে লিখ্‌তে চুল পেকেছে কিন্তু হাত পাকে নি। সুতরাং পুরোনো লেখকের উপর নতুন কাগজের ভরসা রাখাটা ভয়ের কথা।

(৩)

অতঃপর আমি যে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছি, তার প্রথম কারণ, এ বৎসর পয়লা আষাঢ় কালিদাসের মুখ রক্ষা করেছে—অর্থাৎ বৃষ্টি পড়েছে—যদিচ কালিদাস এ কথা কোথাও বলেন নি, এমন কি মেঘদূতেও নয়, যে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বৃষ্টি পড়্‌বেই পড়্‌বে। কিন্তু তাঁর বলা উচিত ছিল। কারণ, মেঘকে আগে কাঁদিয়ে, তার পর তাকে বিরহের কাঁদুনির দূত করাই ন্যায্য। কথামতই হোক্ আর যে কারণেই হোক্ আষাঢের সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি দেখা দিয়েছে।

আর তার দ্বিতীয় কারণ এই—আমি বাঙ্গালার একখানি উপ-পত্রিকায় আমার জনৈক সাহিত্যিক বন্ধুর "ব্যক্তিগত পত্র" পড়েছি। সে পত্রে অনেক কথা ও অনেকের কথা আছে। যথা একদিকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও Bergson, অপর দিকে শ্রীমান দিলীপ কুমার রায় ও Bertrand Russell প্রভৃতি। আর এই সব ভিন্নধর্ম্মী লেখকদের মধ্যে "হাইফেন"-স্বরূপ আমারও নাম বিরাজ করছে। এতেই আমি মহা খুসী হয়েছি। কেন জানেন? এই স্পষ্ট প্রমাণ যে বাঙ্গালা সাহিত্যিকদের মতে সাহিত্য-জগতে "আমিও আছি"। আর "আমি আছি" এই কথাটাই কি জীবনে ও সাহিত্যে সব চাইতে বড় কথা নয়? বেদের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু বেদান্তে যাকে বলে সোঽহং তা কি এই "আমি আছি"র সংস্কৃত তরজমা নয়? বেদান্ত-দর্শনের সার কথা কি এই নয় যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করলে, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হচ্ছে "আমি আছি"। আমি শুধু একা আছি তাই নয়, তুমিও অবশ্য আছ। নিজেকে "সোঽহং" বলতে হলে তোমাকে বলতে হবে "তত্ত্বমসি"। যেখানে স অহং হয়ে যায়,

সেখানে তৎ ত্বম হতে বাধ্য। যাক্ ও সব বাজে দার্শনিক কথা। বাঙলায় একটা প্রবাদ আছে যে 'যে মাছটা সুতো ছিঁড়ে পালায় সেইটেই বড়, যে ছেলেটা মবে সেইটেই ভাল"। উক্ত লৌকিক ন্যায়-অনুসাবে সাহিত্য-সম্বন্ধে অনেক সাহিত্যিককে সাহিত্য-লীলা সম্ববণ কববাব পবই lionise কবা হয়। স্বনামখ্যাত জার্ম্মান কবি Heine বলেছেন যে, I would rather be a live jackal than a dead lion। এই কথাটাই কি মানুষেব খাঁটি প্রাণেব কথা নয় ? সুতবাং বাঙলাব সাহিত্য-সমাজে "আমি আছি," যদিচ জানিনে কোথায়, এই কথা শুনে আবাব স্ফূর্ত্তিতে লিখ্‌তে বসেছি।

ভাল কথা, আমাব ইদানিং সন্দেহ হয়েছিল যে ইতিমধ্যে আমি হয়ত লেখক-হিসেবে লঙ্, লিট বা লুঙ্ হযে গিযেছি। সংক্ষেপে লিখছি বলে অতীতেব এই সব সংস্কৃত সঙ্কেত দিলুম। ও সবেব ইংবেজী নাম লিখ্‌তে গেলে অনেকটা জাযগা জোড়ে। আব বাঙলায যে অতীত ও বর্ত্তমানেব ভিতব বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই, তা কে না জানে ? অন্ততঃ আপনাবা ত নিশ্চয়ই জানেন। কাবণ বাঙালীব জীবনে ও মনে sequence of tenses আনবাব জন্যই ত আপনাবা নূতন পত্রিকা প্রকাশিত কবতে ব্রতী হয়েছেন।

(৪)

আমি আছি বটে কিন্তু কোথায আছি. সেই কথাটাতেই ফিবে আসা যাক্ ? আমি আছি এব ওব মধ্যে "হাইফেন"-স্বরূপে অর্থাৎ মধ্যস্থ-স্বরূপে। যে লেখক ডাইনে বাঁযে দুদিকেই হাত চালায সে যদি কোথায় থাকে, ত মধ্যে। এই কথাটাই আমাব বন্ধুবব অন্য কথায প্রকাশ কবেছেন। তাঁব বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কেউ Bergson-এব anti-intellectualism প্রচাব কবতে উদ্যত হলেই আমি তাব প্রতিবাদ কবি, আবাব কেউ, Russell-এব rationalism প্রচাব কবতে উদ্যত হলেই আমি তাব প্রতিবাদ কবি। এ কথা শুনে খুসী হবাব কাবণ—আমি নাকি অনুবাদী নই, ছেবেফ প্রতিবাদী। তথাস্তু। আমবা গত একশ বৎসব ধবে বিলেতি বুলিব যথাসাধ্য অনুবাদ কবে এসেছি, আব আপনাবা কি চান ভবিষ্যতেও আমবা সুধু তাই কবব ? ধরুন যদি তাই কাম্য হয়, তাহলেও কি আমবা ইউবোপেব নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিব অনুধাবন কবতে পাবব। মনোবাজ্যে দিবাবাত্র বিলেতেব পিছু পিছু ছোট্‌বাব মত আমাদেব দম নেই। আমাদেব প্রার্থনা হচ্ছে, ধীবে ধীবে যাও গোবাচাঁদ, আমি তোমাব সঙ্গে যাব। কিন্তু গোবাচাঁদ এখন ছুটে চলেছে প্রগতিব পথে। আব আমাব কথা হচ্ছে যে ওদেশে মনোজগতে এত দেবতা আছে যে কস্মৈ দেবায় হবিষাঃ বিধেমঃ, তা স্থিব কবিতে পাবি নে। কেন জানেন ? বিলেতেব এই Modern লেখকেবা প্রত্যেকেই এক একটি লালমুখো মাষ্টাব মহাশয। আব এঁদের সকলেব মুখেই আছে সুধু প্রভুসম্মিত বাণী। প্রভুবাক্য বেশীদিন ধবে প্রসন্নমনে অস্বীকাব কবা যায় না। Dogmatic বাণীব দোষই এই যে—তাতে অনেক শ্রোতাব মনে scepticismএব উদ্রেক কবে। আসল কথাটা কি জানেন ? "আমি যে আছি" এই কথাটাই প্রমাণ কববাব জন্য আমি গুরুশ্রেণীব লোকদেব কথাব পাশে প্রশ্ন-চিহ্ন বসিয়ে দিই।

আমার ব্যক্তিগত কথা ছেড়ে দিন। যখন এদেশে স্বরাজ হবে, আর তা হ'তে শুনছি আর বড় বেশী দেরী নেই, তখনও কি দেশের লোক, বিলেতের উক্তির শুধু পুনরুক্তিই করবে? এই কি আমাদের ideal অর্থাৎ কপালের লেখা? আমাদের নিজস্ব মন বলে কি কোন জিনিষ নেই অথবা থাকবে না? আমরা কি কস্মিন কালেও দুনিয়াটা নিজের চোখ দিয়ে দেখতে ও বিচার করতে সাহসী হব না? স্বরাট হওয়ার অর্থ কি, মনোজগতে অপরের ষোল-আনা দাসত্ব অস্বীকার করা—না পরমতের নির্ভুল নকল করা? মনোরাজ্যে "কিং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে"—ধমক ইউরোপ যেদিন ভারতবর্ষকে দেবে, সেইদিনই আমার মতে ভারতবর্ষের যথার্থ সুদিন হবে। যেমন আজ রাসিয়ায় হয়েছে।

(৫)

ভারতবর্ষের বড় কথা ছেড়ে, এখন নিজের ছোট কথায় ফিরে আসা যাক্। আমার বন্ধুবর আবিষ্কার করেছেন, যে আমি নাকি logicএর নাম শুনলেই magic-এর দোহাই দিই, আর magic এর নাম শুনলেই logic এর দোহাই দিই। অবশ্য বন্ধুবর ঠিক এ কথা বলেননি। তবে বিপিন বাবুর চোখা ভাষায় বন্ধুবরের মত ব্যক্ত করতে গেলে দাঁড়ায় এই।

এর কারণ সম্ভবতঃ আমি logic ও magic-এর কোনটিরই ধার ধারি নে। আর না হয়ত কোনও বিষয়ে একরোখা হবার আমার সাহস নেই। আমি extremist হতে ভয় পাই, কারণ ইংরেজেরা বলে extremes meet—অর্থাৎ যিনি না বেঁকেচুরে সোজা ডান দিকে ছোটেন আর যিনি একই ভাবে বাঁ দিকে ছোটেন, তাঁরা অবশেষে পরস্পর আলিঙ্গন করেন, কারণ পৃথিবী গোলাকার।

Logic-এর extremist হতে ভয় পাই এই জন্যে যে, শেষটা হয়ত দেখব যে magic-এর কোণে গিয়ে পড়েছি। এই কারণেই বোধ হয় আমি Bertrand Russell-র আঁচল ধরে ছুটতে পারি নি। Russell-এর অতি ভক্ত হলে শেষকালে হয়ত আর ভাবতে পারিনে বলে যোগের অতিভক্ত হয়ে পড়ব। সে ব্যাপারটা যে হবে ঘোর anti-intellectual সে বিষয়েও আর সন্দেহ নেই। যোগ মানে যে "চিত্তবৃত্তি নিরোধ" এ কথা ত স্বয়ং পতঞ্জলিই বলে গিয়েছেন। আর ঘোর logical হতে হলেও যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে হয়—সে কথা Russell সাহেব না বললেও, সত্য। কারণ logic হচ্ছে পদার্থের অর্থ বাদ দিয়ে তার পদ সাধা মাত্র। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার অর্থ কি সার্থকতঃ আমি কস্মিন কালেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। আমি স্বভাবতঃই নিরোধের চাইতে বিরোধের বেশী পক্ষপাতী। চিত্ত মানেই হচ্ছে চিত্ত-চাঞ্চল্য আর সে চাঞ্চল্যকে ঠাণ্ডা করার মানে চিত্তকে ঠাণ্ডা করা—অর্থাৎ জড় পদার্থে পরিণত করা। এখন বলি বন্ধুবর গোড়াতেই একটা ভুল করেছেন। Intellect বলতে যদি logic বুঝতে হয়, তাহলে Bergson anti-intellectual নন, মারাত্মক logician আর (rationalist মানে যদি হয় sceptic) Russell সাহেবও ralionalist নন্—মারমুখো dogmatist আর তাতেই তাঁর জোর। Dogma বলতে সুধু সেকেলে খ্রীষ্টধর্ম্মের dogma বোঝায় না—একেলে নব dogma-ও বোঝায়। আর dogmaর সঙ্গে লড়তে পারে সুধু

dogma। আজ আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক এই মত প্রকাশ করেছেন।

"Je regarde le rationalisme et l'anti-intellectualisme comme deux *vices contraires* egalement pernicieux a la vie de l'esprit"

এ-কথা পড়ে মহা আশ্বস্ত হয়েছি, কারণ ঐ কথাই প্রমাণ যে এই বিপুলা পৃথিবীতে আমার সমানধর্ম্মী সাহিত্যিক আজও আছে।

(৬)

তবে বন্ধুবর একটা কথা ঠিকই ধরেছেন। আমি মনোরাজ্যে modern নই মডারেট। Moderation জিনিষটে যে অতি সেকেলে, তা কে না জানে। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব ও গ্রীসে আরিষ্টটেল, উভয়েই সামাজিক লোককে মধ্যপথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর কোন কথা পুরোনো হলেই—যে অসত্য হয়ে যায় তা ত নয়। বরং অনেক সময়ে দেখা যায় যে লোকে যাকে নতুন কথা বলে, তা একটু বেশি পুরোনো—অর্থাৎ এত পুরোনো যে লোকে তা ভুলে যাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে। সুতরাং অতি modern রাসেল সাহেবও যে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি আশ্চর্য্য হই নি, অবশ্য তাঁর ভক্তরা রাগ করতে পারেন। তেলাকুচোর গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে—কে না রাগ করে। সে গাছের নাম modernismই হোক আর rationalismই হোক্।

এখন Russell তাঁর সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে কি লিখেছেন শুনুন।

"The ancients, as everyone knows, regarded moderation as one of the cardinal virtues The ancients, however, were clearly in the right In the good life there must be a balance between different activities and no one of them must be carried so as to make the other impossible"

(The Conquest of Happiness p 165)

অবশ্য intellectual activities-ও যাকে আমরা বলি activities তারই অন্তর্ভুক্ত। অতএব চিন্তারাজ্যেও মনের balance রাখবার চেষ্টাটা লজ্জাকর নয়। আর এই প্রচেষ্টার নাম হচ্ছে moderation।

এতক্ষণ ত বীরবলের বাচালতা শুনলেন। আপনার পত্রে কি এ-রকম বাজে বকুনির স্থান হবে? আর যদি না হয় ত প্রমথ চৌধুরীকে আপনাদের দলে ভর্ত্তি করে নেবেন। বড কথাকে ছোট করা আমার স্বভাব হবে কিন্তু ভদ্রলোক দেশীবিদেশী সব রকম বড় কথাকে আরও বড করতে সদাই ব্যগ্র, সদাই প্রস্তুত।

বীরবল

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।